রাগ আশাবরী

নিমাই ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

কল্যাণীয়া চন্দনা ও

শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত কে

লেখকের অন্যান্য বই

চীনাবাজার
স্বপ্নভঙ্গ
এক চক্কর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
ফুটবলার
কেয়ার অফ ইন্ডিয়ান এম্বাসী
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র
শেষ পারানির কড়ি
বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত
রাজধানী এক্সপ্রেস
রাজধানীর নেপথ্যে
অনেকদিনের মনের মানুষ
পিকাডিলি সার্কাস
ডিফেন্স কলোনী
পার্লামেন্ট স্ট্রিট
সাব-ইনস্পেক্টর
লাস্ট কাউন্টার
উইং কমান্ডার
প্রবেশ নিষেধ
শ্রেষ্ঠাংশে
সেলিম চিস্তি
ভি আই পি
মেমসাহেব
ভালোবাসা
ডিপ্লোম্যাট
রিপোর্টার
অ্যালবাম
এডিসি
গোধূলিয়া
রিটায়ার্ড
পেন ফ্রেন্ড এন্ড ক্লাস ফ্রেন্ড
আকাশভরা সূর্য তারা

পিয়াসা
অনুরাগিনী
গল্পসমগ্র — ১ম / ২য়
আগমনী
প্রতিবেশিনী
রুদ্রাণী
শ্রাবস্তী
ভরা থাক স্মৃতিসুধায়
ভবঘুরে
শ্রেষ্ঠ গল্প
ভদ্দরলোক
পূজাস্পেশাল
প্রবাসী
ডার্লিং
সদরঘাট
প্রথম নায়িকা
চেক পোস্ট
উর্বশী
বন্দিনী
বৌবাজারের বৌদি
তিন কন্যা

ওয়ান আপ টু ডাউন
এই আমি সেই আমি
মাতাল
জার্নালিস্টের জার্নাল
একান্ত নিজস্ব
মোগলসরাই জংশন
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান
হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার
ইওর অনার
চিড়িয়াখানা
ইমন কল্যাণ
ইনকিলাব
ব্যাচেলার
প্রিয়বরেষু
ককটেল
নিমন্ত্রণ
তোমাকে
সোনালী
ম্যাডাম
রবিবার
রত্না
কেরানী
নাচনী
বন্যা
অসমাপ্ত চিত্রনাট্য
নিউমার্কেট
নিউ এম্পায়ার ক্লাব
স্বার্থপর
কয়েদী
ফুটপাত

রাগ আশাবরী

এ সংসারের বৈষয়িক বুদ্ধিমানের দল কিছু কিছু মানুষকে দেখে অবাক হন। ওরা নাকি নিজের ভাল-মন্দটুকুও বুঝতে পারে না। বি.এ-এম.এ পাশ করেও অশিক্ষিত চাষাভুষাদের মত পরের জন্য খেটে মরে। এইসব লোকজনকে নিয়ে বুদ্ধিমানেরা হাসাহাসিও করেন। কোল্ড স্টোরেজের মালিক সুদখোর চণ্ডাল বিধুবাবুর প্রাণপ্রিয় জামাতা বাবাজীবন সুকুমার উকিলও সৌম্য সম্পর্কে এইরকমই ধারণা পোষণ করেন।

হরিপাল ষ্টেশনে যাওয়া-আসার পথে বা বিকেল-সন্ধের দিকে তারকেশ্বর লোকালের কামরায় সৌম্যকে দেখলেই ঐ ময়লা মনের ততোধিক ময়লা কোট-প্যাণ্ট পরা উকিল সুকুমার দত্ত ছত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলেন, হ্যারে সমু, কতদিন হয়ে গেল চাকরিতে ঢুকেছিস অথচ এখনও বিয়ে-থা করে সংসারী হলি না। রোজই তো বয়স বাড়ছে, তা কী ভুলে গেছিস?

সৌম্য কিছু না বললেও উকিলবাবু ওকে সৎ পরামর্শ দিতে নিরুৎসাহবোধ করেন না। বলেন, তবে হ্যাঁ, যদি বাবা-মা-দাদা-বৌদিদের না জানিয়ে টাকা জমিয়ে কলকাতায় ফ্ল্যাট কেনার পর বিয়ে করবি বলে ঠিক করে থাকিস, তাহলে অবশ্য......

না, এবার আর ও চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, আমাদের এত বড় বাড়ি থাকতে কোন দুঃখে কলকাতায় একটা পায়রার খোপে গিয়ে থাকব?

ছেলেটাকে এখনও নিজেরর মন্ত্রে দীক্ষিত করার সময় হয়নি দেখে রামকেপ্পন সুকুমার দত্ত মনে মনে দুঃখ পেলেও হতাশ হয়ে চুপ করে থাকার পাত্র না। একটু হেসে বলেন, দ্যাখ সমু, কলেজ-টলেজে পড়ার সময় আমরাও অনেক বড় বড় বুলি

ছেড়েছি. কিন্তু পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, শরৎ চাটুজ্যের নাটক-নভেলের ন্যাকা ন্যাকা কথাগুলো নাটক-নভেলেই মানায়। বাস্তব জীবনে ওসব একেবারেই অচল।

নেহাত এক পাড়ার থাকেন। তাছাড়া বড়দার সহপাঠী। তা না হলে বোধহয় সৌম্য ওর গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বলতো, স্টপ! নন্‌সেন্স!

না, ও তা পারে না। রুচিতে বাধে। তাইতো ও হরিপাল বাজারের মুদির দোকানের মালিক অবিনাশবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ওকে দেখেই অবিনাশবাবু বলেন, কীরে সমু, এত দেরি করে ফিরছিস?

সৌম্য একটু হেসে বলে, না, কাকা, দেরি করে ফিরছি না। আমি তো এই ছ'টা দশ বা চল্লিশের ট্রেনেই ফিরি।

বৃদ্ধ একটু হেসে বলেন, তার মানে সরকারী অফিসে চাকরি করলেও বাপ-দাদাদের মত তুইও ফাঁকি দিতে শিখিস নি।

ও চাপা হাসি হেসে বলে, শুধু আমার বাপ-দাদাদের কথা কেন বলেছেন? আপনিও কী কোনদিন ফাঁকি দিতে পারলেন?

—ফাঁকি দিলে কী এই মুদিখানার দোকানদারকে তুই এমন করে কাকা বলে ডাকতিস?

—একই গ্রামে যখন থাকি তখন কাকা বলে ডাকতেই হতো কিন্তু শ্রদ্ধা করতাম না।

—থাক, থাক, ওসব কথা রাখ। কাঁধের ব্যাগটা আমাকে দে।

সৌম্য ব্যাগটা ওর হাতে দিতেই উনি বলেন, বাপরে বাপ! এত ভারী কেন রে?

—ওর মধ্যে কয়েকটা বই আছে।

—ভাইপো-ভাইঝিদেরর স্কুল-কলেজের বই?

—না, না ; ওদের বই না। দুই বৌদির জন্য অফিস লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে যাচ্ছি।

—ও!

বৃদ্ধ অবিনাশবাবু মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকার পর আপনমনেই একটু হেসে বলেন, আমাকে তোরা কাকা বললেও আমি তোর বাবার চাইতে মাত্র ছ'-আট মাসের ছোট। তোর ঠাকুর্দার অনেক কিছুই মনে পড়ে। ভদ্রলোক আবগারী ইন্সপেক্টর ছিলেন। ইচ্ছা করলেই হাজার হাজার টাকা ঘুষ নিতে পারতেন। কিন্তু জীবনে একটা তামার পয়সাও অন্যায়ভাবে আয় করেন নি।

—হ্যাঁ, বাবাও তাই বলেন।

উনি যেন সেকথা শুনতেও পান না। উত্তরপাড়া-হিন্দ মোটর তো দূরের কথা, ট্রেন যে শেওড়াফুলিও পার হয়ে গেল, সেদিকেও খেয়াল নেই। আগের মতই আপনমনে বলে যান, উনি খুব দুঃখ করে বলতেন, বি.এ. পাশ করিনি বলে এমন চাকরি করছি যে সবাই ঘেন্না করে, সবাই সন্দেহ করে আমি ঘুষখোর।

এসব কথা সেই ছোটবেলা থেকেই বাবা-জ্যেঠার কাছে সৌম্য অনেকবার শুনেছে কিন্তু তবুও অবিনাশ কাকার কাছে আবার শুনতে বেশ ভালই লাগে। বোধহয় একটু গর্বিত হয়। ও চুপ করে শুনে যায়।

—উনি তোদের তিন পিসীকে কলেজে পড়াতে না পারলেও লেখাপড়া শিখিয়েই বিয়ে দেওয়া ছাড়া কত কষ্ট করে তোর বাপ জ্যেঠাকেও অত লেখাপড়া করালেন, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

এবার অবিনাশবাবু মুখ তুলে সৌম্যর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, তোর জ্যাঠার মত তোর বাবা তোদের ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার না করতে পারলেও......

ঠিক সেই সময় কে যেন পিছনের বেঞ্চি থেকে চিৎকার করল, অবিনাশদা, মালপত্র নামাও। নালিকুল ছেড়ে গেল।

উনি কথাটা শেষ না করেই পিছন ফিরে একটু হেসে বলেন, ও বসন্ত! তুই!

হরিপাল বাজারে অনেক বড় বড় দোকানে সুন্দর শেলফ্-এ হাজার রকমের জিনিস সাজানো আছে। সন্ধে লাগতে না লাগতেই জ্বলে ওঠে ডজন খানেক টিউব লাইট। তখন দোকানগুলোকে দেখতে কি সুন্দরই লাগে। সে সব দোকানে ভীড় লেগেই আছে। যাদের হাতে হঠাৎ মোটা টাকা এসে গেছে বা যাচ্ছে, তারা প্রায় সবাই এইসব দোকানেরর খদ্দের। অবিনাশ ঘোষের দোকানে অত চাকচিক্যও নেই, অত বিচিত্র ধরনের জিনিসপত্তরও নেই। তবে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসারে যা যা লাগে বা তাদের বাড়ির ছেলে-মেয়ে বউ-ঝিদের যা প্রয়োজন হয়, তা সবই আছে। সবাই জানে, বাজারের মধ্যে এই একটি দোকানেই এক পয়সা বেশি দাম দিতে হয় না। শুধু কী তাই? নতুন হেডমাষ্টার মশায়ের স্ত্রী মেয়ের জন্য কয়েকটা খাতা আর সার্ফের প্যাকেটের দাম দিয়েই হন হন করে চলে যাচ্ছিলেন। অবিনাশবাবু চিৎকার করে বলেন, বৌদি, চলে যাবেন না। এক মিনিট......

উনি পিছন ফিরে দু'এক পা এগিয়ে এসে বলেন, কী হল? টাকা কম দিয়েছি?

অবিনাশবাবু একটু হেসে বলেন, না, না। ঠিকই দাম দিয়েছেন। সার্ফের বড় প্যাকেটের সঙ্গে একটা লাক্স সাবান ফ্রী আছে।

উনি সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে সাবানটা দিয়ে বলেন, এটা নিয়ে যান।

কাউকে কাউকে তো উনি রীতিমত বকুনি পর্যন্ত দেন, এই চন্দন, পালাচ্ছিস কোথায়? ওর সঙ্গে যে একটা মগ ফ্রী আছে, সেটা না নিয়েই.....

চন্দনও একটু হেসে বলে, ওটা আমি না নিয়ে গেলেও আপনি তো পরে বাবা বা কাকাকে ঠিকই দিয়ে দিতেন।

—যদি আমি ভুলে যেতাম?

চন্দন মগটা হাতে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই হাসতে হাসতে বলে, তাহলেও মহাভারত অশুদ্ধ হত না।

এই গ্রামের সবার সঙ্গেই অবিনাশবাবুর মধুর সম্পর্ক। তাইতো সৌম্য ছাড়া আরো তিনজন হাসি মুখে ওর ঐ বড় বড় ব্যাগগুলো কামরা থেকে নামিয়ে দেয়।

সৌম্য একটা বড় ব্যাগ প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে রাখতেই অবিনাশবাবু বললেন, ঐ হতচ্ছাড়া সুকুমার উকিল তোকে নিশ্চয়ই আজেবাজে পরামর্শ দিচ্ছিল?

—হ্যাঁ, কাকা।

—বদ বুদ্ধি দেওয়াই তো ওর কাজ।

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, তুই ওর কথা একটা কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিবি। যে ওর কথা মত কাজ করেছে, সেই তো ডুবেছে।

সৌম্য একটু হেসে বলে, আমাকেও উনি ঐ রকমই সৎ পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

—তা আর আমি জানি না!

মালপত্র নিয়ে যাবার জন্য অবিনাশবাবু দোকানের দু'জন কর্মচারী আসতেই সৌম্য ষ্টেশনের বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

হঠাৎ হেডমাষ্টার বিকাশ সর্বজ্ঞ মশাইকে একেবারে সামনে দেখেই সৌম্য ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে, স্যার, আজ এত দেরি করে ফিরছেন?

—অ্যানুয়াল পরীক্ষার কোশ্চেন পেপার ছাপা হয়ে এলো। সেগুলো গুনে-টুনে সিন্দুকে রাখতে রাখতে দেরি হয়ে গেল।

—ও!

—তুই ভাল আছিস তো?

—হ্যাঁ, স্যার।

—চলি , ঐ আমার ট্রেন আসছে।

অন্য অনেকের মত সৌম্য সাইকেল বা রিক্সায় চড়ে বাড়ি যায় না। হেটেই যায়। সকালবেলায় তাড়াহুড়ো করে আটটা আটাশের ট্রেন ধরতে হয়। ওটা হরিপাল থেকেই ছাড়ে। তাছাড়া ঐ ট্রেনে গেলে সওয়া দশটার মধ্যেই কয়লাঘাটায় অফিসে

পৌঁছনো যায়। সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরার সময় তাড়াহুড়ো থাকে না। ও হেঁটেই বাড়ি ফেরে। তাছাড়া কতই বা দূর! হেঁটে বাড়ি ফেরার আরো একটা কারণ আছে। পথে কত চেনাজানা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। যারা সাইকেলে বা রিক্সায় যান, তাদের মধ্যেও অনেকে বলেন, সমু, কেমন আছিস? কেউ কেউ বলে, সমুদা, রবিবার সকালে দিকে চলে এসো না! আমি বাড়ি থাকব।

—সমুদা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমিও বাড়ি ফিরব।

সৌম্য থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকিয়েই একটু হেসে বলে, ও বকুল তুই!

বকুল এগিয়ে এসেই একটু হেসে বলে, একই কম্পার্টমেন্টে ছিলাম কিন্তু তুমি অবিনাশ জ্যেঠুর সঙ্গে কথা বলতে এমনি.........

—নারে, আমি তোকে সত্যি দেখিনি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুইও তো এই ছ'টা দশের ট্রেনে আসিস।

—রোজ আর আসতে পারি কোথায়? যাদবপুর থেকে হাওড়া ষ্টেশন তো কম দূর না!

—হ্যাঁ, সত্যিই বেশ দূর। আমিও তো পাঁচ বছর ওখানে.....

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বকুল বলে, কোন পার্টির মিছিল-মিটিং থাকলে তো ছ'টা চল্লিশ তো দূরের কথা, সাতটা পাঁচের ট্রেনটাও ধরতে পারি না।

—দেরি হলে যেমন কষ্ট তেমনি বাড়ির লোকজনের দুঃশ্চিন্তা........

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বকুল একটু হেসে বলে, দুঃশ্চিন্তা বলে দুঃশ্চিন্তা! একে মেয়ে, তার উপর এই বয়স!

সৌম্যও হাসতে হাসতে বলে, তাছাড়া তোরা তিনটে বোনই যে বড্ড সুন্দরী।

—ওটা কোন ফ্যাক্টর না। আমাদের এই বয়সের যে কোন মেয়ে বাড়ি ফিরতে দেরি করলেই বাড়ির লোকজনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে।

—কী করবে বল? বাঙালী রোমিও-জুলিয়েটের সংখ্যা তো কম না।

বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছতেই বকুল থমকে দাঁড়িয়ে বলে, সমুদা, তুমি কী অরিন্দম গাঙ্গুলীর একক গানের প্রোগ্রামে যাচ্ছো?

—কেন বল তো?

—তুমি তো ভাল ভাল আর্টিস্টের এই ধরনের অনুষ্ঠানে যাও, তাই......

বকুল চাপা হাসি হেসে বলে, আমি অরিন্দমের ফ্যান। ও যেমন ভাল অভিনয় করে, সেইরকমই ভাল গায়ক আর সুরকার।

—ছোড়দা- ছোটবৌদিকে জিজ্ঞেস করি, ওরা যাবে কিনা ; তারপর টিকিটের চেষ্টা করব।

বাড়ির মধ্যে পা দেবার আগে বকুল বলে. আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই যাবে কিন্তু ওদের সঙ্গে গেলে তো.....

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সৌম্য বলে, বুঝেছি, বুঝেছি।

উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় ধপাস করে বসে পড়েই সৌম্য ওর মাকে এগিয়ে আসতে দেখেই গলা চড়িয়ে বলে, তোমার পুত্রবধূদের ঠেলায় আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

বৃদ্ধা সরলাবালা অবাক হয়ে বলেন, কেন, ওরা আবার কী করল?

ঠিক সেই সময় ছোট বৌদি কাবেরী দেবীর আবির্ভাব।

—কীহলো ঠাকুরপো, পুত্রবধূদের বিরুদ্ধে মাকে কী বলছ?

—তোমাদের জলজ্যান্ত স্বাস্থ্যবান দু'টো স্বামী আছে। তারা থাকতে আমি কেন তোমাদের কুলিগিরি করে মরি?

কাবেরী আলতো করে ওর মাথায় হাত রেখে চাপা হাসি হেসে বলে, আমরা যে বিনা পয়সায় তোমাকে ট্রেনিং দিচ্ছি, তার জন্য তো তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

—কীসের ট্রেনিং?

—এই ট্রেনিং' এর জোরেই তো তুমি তোমার বউয়ের দাসত্ব করে সুখী হতে পারবে।

এবার কাবেরী একটু জোর করেই হাসেন।

—ছোড়দা যে তোমার দাসত্ব করে সুখী হয়েছে, তা তো জানতাম না।

—ঘরে বউ আনো। তারপর সব বলব। সব বুঝিয়ে দেব।

সৌম্য এ বিষয়ে আর কোন কথা না বলে ব্যাগ থেকে দুটো মোটা মোটা বই বের করে এগিয়ে দিয়ে বলে. এই নাও তোমাদের 'সাহেব বিবি গোলাম' আর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'।

এক হাতে বই দু'খানি নিয়ে অন্য হাতের দু'চারটে আঙ্গুল দিয়ে ওর থুতনি নেড়ে বলে, এইজন্যেই তো তোমাকে এত ভালবাসি।

ভিতর থেকে এ বাড়ির বড় বউ ছায়া দেবীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, ছোট ঠাকুরপো. ভিতরে এসো। চা হয়ে গেছে।

সৌম্যদের এই বাড়িটা পূর্ব পুরুষের। প্রায় দু'বিঘে জমির উপর এই বাড়ি। তবে এককালে ঘরদোর খড়ের বা টালির থাকলেও ঠাকুর্দা বৃন্দাবন সরকার সরকারী চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর পাকা বাড়ি তৈরি করেন। তবে প্রথমে মাত্র দু'খানা ঘর হয়েছিল। পরবর্তী কালে চাষ-আবাদের জমিজমা বিক্রি করে আরো দু'খানা

ঘর আর ছাদে যাবার সিঁড়ি তৈরি করেন। ওর চারটি সন্তান ; দু'টি পুত্র, দু'টি কন্যা। মনমোহন, গঙ্গা, যমুনা আর মনোরঞ্জন।

মনমোহন বি.এ পাশ করার পরই সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট আপার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি পেয়ে দিল্লী চলে যান। গঙ্গা বারো বছর বয়সে কলেরায় মারা যান। যমুনার বিয়ে হয়েছিল খুলনার এক উকিলের সঙ্গে। মনোরঞ্জন বি.এ পাশ করে মাত্র বছর খানেক চাকরি করেছেন বর্ধমান ট্রেজারীতে।

মনমোহন আস্তে আস্তে সেক্সন অফিসার পদে উন্নত হবার পর এই বাড়ির দোতলায় দু'খানা ঘর তৈরি করেন ছুটিতে সপরিবারে থাকার জন্য। আগে উনি বছর বছর হরিপালের বাড়িতে এলেও ছেলেরা ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করার পর দু'চার বছর অন্তর আসতেন শুধু স্ত্রীকে নিয়ে। ওর বড় ছেলে এম. বি. বি. এস. করার পর এম.ডি. হয়েছে। ওর স্ত্রীও ডাক্তার। হরিপালের মত গণ্ডগ্রামে ওদের আসার গরজও নেই, সময়ও নেই। ছোট ছেলে অভিমন্যু কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। বরোদায় চাকরি করে। ওখানে সুন্দর দোতলা বাড়িও তৈরি করেছে। একমাত্র মেয়ে অনন্যা আর্টিস্ট। ভূপেন কাক্করের প্রিয় ছাত্রী। অভিমন্যুর স্ত্রী মাধবী বাগবাজারের মেয়ে। বেথুন থেকে বি. এ. পাশ করেছে। ওরা তিনজনেই তিন-চার বছর অন্তর কলকাতায় এলেই অন্তত সপ্তাহ খানেক হরিপালে থাকবেই। মনমোহন আর তাঁর স্ত্রী তো আর বেঁচেই নেই।

ওরা তিনজনে হরিপালে বাড়িতে এলে যেন উৎসব লেগে যায়। ছায়া গ্যাসে চায়ের জল চাপাতেই মাধবী বলে, বড়দি, যে ক'দিন আমরা এখানে আছি, আমিই রান্না করব।

—না, না, তুই একা কেন রান্না করবি?

—রান্না করতে আমার ভালই লাগে। তাছাড়া এখানে এত ধরনের টাটকা শাক-সবজি-মাছ পাওয়া যায় যে এসব রান্না করার সুযোগ তো ওখানে পাই না।

—তাই বলে তোকে একা রান্না করতে হবে না।

—তাতে কী হলো বড়দি?

মাধবী একটু হেসে বলে, ক'দিন না হয় আমার হাতের রান্নাই খাও। তাছাড়া কাকা....

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ছায়া কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলে, বাবা বলেছেন, তোর হাতের রান্না একবেলা খাবেন।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে।

ঠিক সেই সময় অভিমন্যু রান্নাঘরে হাজির হয়ে বলে, কী হলো বড়বৌদি, ঘুম থেকে উঠেই আমার এমন সুন্দর বউটাকে বকছো কেন?

ছায়া সঙ্গে সঙ্গে দু'কাপ চা ওর হাতে দিয়ে চাপা হাসি হেসে বলে, এবার দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে চা খাও।

এইভাবেই দিনের শুরু হয়।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়েই অভিমন্যু মনোরঞ্জনবাবুকে জিজ্ঞেস করে, বলো কাকা, মাছ খাবে নাকি মাংস?

—তোর যা ইচ্ছে, তাই আন।

—না, না। তুমি বলো।

—তাহলে আজ মাংসই আন।

—কীসের মাংস খাবে? পাঁঠা নাকি....

—না, না, মুরগীর মাংস আমার ভাল লাগে না।

ঐ বারান্দায় বসেই অভিমন্যু চিৎকার করে, কাকীমা, এ বাড়িতে কী একটাও বউ নেই যে আমাকে বাজারের থলি-টলি দিতে পারে?

বৃদ্ধা সরলাবালা ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে ওকে বলেন, তোরা এলে বাড়িটা বেশ জমজমাট হয়ে যায়।

কাবেরীর হাতে বাজারের থলি থাকলেও বাড়ির সবাই এসে হাজির হয়।

অনন্যা বলে, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে বাজারে যাবো।

ও সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে কাবেরীকে বলে, ছোট মা, তুমিও চলো না।

—আমিও যাবো?

অনন্যা ওর দুটো হাত ধরে বলে, প্লীজ! খুব মজা হবে।

—তাহলে তো আবার কাপড়-চোপড় বদলাতে হবে।

—চট করে আমার একটা সালোয়ার কামিজ পরে নাও।

কাবেরী হাসতে হাসতে বলে, আমি সালোয়ার-কামিজ পরে এই হরিপাল বাজারে গেলে আর দেখতে হবে না।

পিছন থেকে সৌম্য টিপ্পনী কাটে, যাও, যাও। তুমি সালোয়ার-কামিজ পরলে ছোড়দা খুশিই হবে।

ওর কথায় সবাই হেসে ওঠেন।

অভিমন্যু কাবেরীর দিকে তাকিয়ে বলে, তোমাকে আর কাপড়-চোপড় বদলাতে হবে না। যা পরে আছো, তাতেই.......

সেই ভোরবেলা থেকে মাঝরাত্তির পর্যন্ত হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবে সবাই মেতে ওঠে।

বিদায় নেবার দিন মনোরঞ্জনবাবুকে প্রণাম করে অভিমন্যু বলে, কাকা, চাকরির জন্য আমাকে সারা বছরই অনেক বড় বড় শহরে যেতে হয়। থাকি বড় বড় হোটেলে। গাড়ি ছাড়া এক পা হাঁটি না কিন্তু এখানে এলে যে আনন্দ পাই, তার কোন তুলনাই হয় না।

চলে যাবার সময় মাধবী আর অনন্যা তো চোখের জলের বন্যা বইয়ে দেয়।

ওরা চলে যাবার পর এ বাড়ির কেউই ক'দিন হাসতে পারে না। সব সময় শুধু ওদের কথাই আলোচনা হয়।

দিন পনের পরে পিওনের হাত থেকে খামের চিঠিটা হাতে নিয়েই কাবেরী বেশ গলা চড়িয়েই ছায়াকে বলল, দিদি, বরোদা থেকে চিঠি এসেছে।

খাম খুলে চিঠির উপর মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়েই মনোরঞ্জনবাবু এক গাল হেসে বলেন, বৌমা শুধু আমাকেই এত বড় চিঠি লিখেছে! আমি ভেবেছিলাম, এর মধ্যে আরো অনেকের চিঠি এসেছে।

দীর্ঘ চিঠির শেষে মাধবী লিখেছে—ধাপে ধাপে আপনাদের ছেলেদের উন্নতি ও আশেপাশের প্রতিবেশী-পরিবেশের জন্য ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আমরা যথেষ্ট বিলাসিতা করি। যে সমাজে আমাদের বাস করতে হয়, যাদের সঙ্গে হরদম ওঠা-বসা করি, তাদের সম্পদ-সম্ভোগের নেশায় যে আমরাও সংক্রামিত হইনি, তা জোর করে বলার মত শক্তি আমার নেই। এই সমাজের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে গিয়েই সবাইকে অর্থ-প্রতিপত্তির লোভে এগুতেই হয়। থমকে দাঁড়ানো মানেই ব্যর্থতার গ্লানিতে ডুবে যাওয়া। এই এগিয়ে যাবার একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে, মাদকতা আছে কিন্তু নেই প্রাণের সুখ, মনের আনন্দ। পোড়া বাংলাদেশের অখ্যাত হরিপালে 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে ; তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।'......

........কী আনন্দেই যে হরিপালের দিনগুলো কেটেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। তবু বলব, আপনাদের ঐশ্বর্য না থাকলেও ঔদার্য আছে, প্রাচুর্য না থাকলেও আন্তরিকতা আছে, অর্থের দম্ভ না থাকলেও গভীর ভালবাসা আছে, আছে সহমর্মিতা। আমরা তিনজনেই হরিপালের সুখ-স্মৃতির অমৃত সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছি।

মনোরঞ্জনবাবু ডাক বিভাগে চাকরি করেছেন। অবসর নেবার আগে ছিলেন বর্ধমানের পোষ্টাল সুপারিনটেনডেন্ট। ওর বড় ছেলে শান্ত আর মেজ ছেলে পবিত্র দু'জনেই বি.এ. বি-এড পাশ করে শিক্ষকতা করেন। বাড়ির সবারই ইচ্ছা ছিল, সৌম্য অধ্যাপক হোক। তাইতো ও এম. এ. পড়ে কিন্তু মানুষ যা ভাবে, তাই কি হয়?

রেজাল্ট বিশেষ সুবিধের হলো না বলে অধ্যাপক হবার স্বপ্ন বিসর্জন দিতে হলো। কলেজের ক্লাশ রুমের বদলে ইস্টার্ণ রেলের কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টের কয়লাঘাটার অফিসে আপার ডিভিসন কেরানীগিরি শুরু করল সৌম্য। বাড়ির সবাই প্রথম দিকে বিশেষ সুখী না হলেও ও নিজে দুঃখিত হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি ওখানে চাকরি করে ও বেশ আনন্দেই আছে।

সেক্সন অফিসার যোগেনবাবু এই সেক্সনের সবারই বড়দা। ঠিক পৌনে দশটা অফিস আসেন ; চলে যান ঠিক পাঁচটায়। ডেপুটি সি-সি-এম তো দূরের কথা, স্বয়ং সি-সি-এম বা ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত জানেন, হাজার জরুরী কাজ থাকলেও ওকে দিয়ে পাঁচটা বাজার এক মিনিট পর আর কাজ করানো যাবে না!

তবে হ্যাঁ, ওরা সবাই জানেন, উনি যদি বলেন, অমুক কেসগুলোর রিপোর্ট অমুক দিনের মধ্যে হয়ে যাবে, তাহলে ঠিক সেই দিনই ফাইলগুলো ডেপুটি সি-সি-এমের কাছে পৌঁছবেই। কোন কারনেই তার অন্যথা হবে না, হতে পারে না।

যোগেনবাবু সুদর্শন না হলেও বেশ সুপুরুষ। সব সময় মুখে যেন পরিতৃপ্তির হাসি লেগে আছে। বাড়িতে কাচা হলেও প্রতিদিন ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি পরে অফিসে

আসেন। বর্ষাকালে ছাতি নিয়ে আসেন। তবে সারা বছর হাতে করে নিয়ে আসেন স্টেটস্‌ম্যান। দশটা বাজার আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে শুধু প্রথম পাতার বড় বড় খবরগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নেন। ভাল করে পড়েন টিফিনের সময়। এডিটোরিয়াল পড়েন সন্ধের পর বাড়ি ফিরে।

এই সেক্সনের মন্মথবাবু, হরিশবাববু আর সুখেনবাবু ওর প্রায় সমসাময়িক। মন্মথবাবুর দেহের খাঁচার মধ্যে যেন বহু আলোচিত হরিপদ কেরানীর আত্মা লুকিয়ে আছে। চোখে-মুখে দুঃশ্চিন্তার ছাপ। কোন ব্যাপারেই বিশেষ উৎসাহ নেই। বিশেষ প্রয়োজন না হলে কারুর সঙ্গেই কথা বলেন না। নিতান্ত মাসের শেষে মাইনে পাবেন বলে ফাইলপত্র নাড়াচাড়া করেন কিন্তু তাড়াহুড়ো বা দৌড়াদৌড়ির মধ্যে নেই। সুখেনবাবু ওর নামকরণ করেছেন 'দাদু'। এই সেক্সনের সবাই ছাড়া অন্যান্য সেক্সনের লোকজনেও ওকে দাদু বলেই ডাকেন। অনেকে হয়তো ওর আসল নামই জানে না।

কয়লাঘাটার সব চাইতে কাছে থাকেন বলেই বোধহয় ত্রিদিববাবু সব চাইতে দেরিতে অফিসে আসেন, সব চাইতে আগে অফিস থেকে বিদায় নেন। উনি অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সুখেনবাবু হাসতে হাসতে বলেন, তোর বউ বোধহয় রাতের ব্যথায় কাহিল বলে নিজেই রান্না করে খেয়ে-খাইয়ে এলি?

হাতের ব্যাগ টেবিলের উপর রেখেই ত্রিদিববাবু হাসতে হাসতে জবাব দেন, আমার বউ তোর বউয়ের মত সাত কুঁড়ের এক কুঁড়ে না যে বাতের ব্যথায় বিছানায় পড়ে থাকবে।

মৌজ করে পান-জর্দা খেতে খেতে রেখাদি চাপা হাসি হেসে বলেন, আঃ! সুখেনদা! কাকে কি বলছেন? ত্রিদিবদার বউ তো আমহার্স্ট স্ট্রীটের পি. টি. ঊষা! তাও জানেন না?

ফাইলপত্র নিয়ে কাজ করতে করতে কেউ একটু জোরে, কেউ একটু চাপা হাসি হাসেন।

ঘণ্টা খানেক কাজ করেই ক্লান্ত হয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই বলাইবাবু বলেন, ত্রিদিবদার আসতে কেন দেরি হলো জানি না, তবে আজ বিকেলে বৌদি বাপের বাড়ি যাবেন বলে ত্রিদিবদাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

যোগেনবাবু মন দিয়ে কাজ করতে করতেই কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে লোকসভার স্পীকারের মত ঘোষণা করেন, ডিসকাসন অ্যাবাউট বউমা নট অ্যালাউড!

ত্রিদিববাবু এক গাল হাসি হেসে বেশ গলা চড়িয়েই বলেন, এই না হলে বড়দা!

তবে হ্যাঁ, ত্রিদিববাবু কাজের লোক। যে কাজ অনেকে তিন দিনে পারবেন না, সে কাজ ইনি একবেলায় করে দেবেন।

বলরামবাবু যতক্ষণ অফিসে থাকেন, তার অর্ধেক সময় পে-কমিশনের সুপারিশ আর বকেয়া ডি-এ কবে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে, তার হিসেব-নিকেশ আর খোঁজখবর নেবার জন্য এখানে-ওখানে ঘুরাঘুরি করেই কাটান।

ত্রিদিববাবু ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, বলরামদা, তুমি কী লুকিয়ে-চুরিয়ে আবার বিয়ে করার মতলব করছো?

—হঠাৎ তোর এ সন্দেহ হলো কেন?

—এক সঙ্গে কিছু টাকা পাবার জন্য তুমি যেভাবে ছোটাছুটি করছো, তাই দেখে মনে হলো বোধহয়......

—ওরে হতভাগা, তোর বউয়ের মত আমার বউ তো শুধু ছেলে প্রসব করেনি! দুটো মেয়ের যে বিয়ের বয়স হয়ে গেল। তাদের বিয়ে দিতে হবে না?

—তুমি যদি শুধু শুক্লপক্ষে বৌদির সঙ্গে সহবাস করতে, তাহলেই তিনি শুধু ছেলে প্রসব করতেন!

গাইনোলজিক্যাল ব্যাপারে ত্রিদিববাবুর গভীর জ্ঞানের পরিচয় জেনে ঘরের সবাই হেসে ওঠেন।

বড়দা সঙ্গে সঙ্গে রুলিং দেন, ডিসকাসন অ্যাবাউট গাইনোলজিক্যাল ব্যাপার নট অ্যালাউড!

তিন দিন ডুব দেবার পর গুণময়বাবু অফিসে ঢুকেই সোজা যোগেনবাবুর কাছে গিয়ে চাপা হাসি হেসে কানে কানে কি যেন বলেন।

বড়দা জিজ্ঞেস করেন, দু'জনেই ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ, দু'জনেই ভাল আছে।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে সুখেনবাবু গুণময়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, তোর ডুব মারা দেখেই বুঝেছি, তোর বউ আবার লেবার রুমে ঢুকেছে।

গুণময়বাবু বেশ গর্বের সঙ্গেই বলেন, এবার আর মেয়ে হয়নি, ছেলে হয়েছে।

—দারুণ মহৎ কাজ করেছিস।

সুখেনবাবু প্রায় না থেমেই বলেন, এভাবে বছর বছর বউকে লেবার রুমে ঢোকাতে লজ্জা করে না?

—দ্যাখ সুখেন, রীতিমত দু'চারশ লোকের সামনে মন্তর-টন্তর পড়ে যে ভদ্রলোকের মেয়েটাকে ঘরে এনেছি, তার পেটটা তো খালি রাখতে পারি না!

বড়দা গর্জে ওঠেন, নো ডিসকাসন অ্যাবাউট মেটারিনিটি কেসেস।

দিলীপবাবু এসব আলাপ-আলোচনার মধ্যেও থাকেন না। উনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাথরুম যাবেন। চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে রুমাল দিয়ে ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে পকেট চিরুণী দিয়ে টেড়িটা ঠিক করে আসেন। গরমের দিনে একটা রুমাল গলায় জড়িয়ে সার্টের কলার ঢেকে না দিয়ে উনি বসতে পারেন না।

সুখেনবাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, রেখাদি মায়ার ব্যাগ থেকে লিপস্টিকটা বের করে দিলীপকে দিন। ও আনতে ভুলে গেছে।

দিলীপবাবুও সঙ্গে সঙ্গে বলেন, রেখাদি, মায়ার আইব্রো পেন্সিলটা সুখেনদাকে দেবার পরই আমাকে....

যোগেনবাবুও মুখ তুলে বলেন, ওরে বাপু, এটা বিউটি পার্লার না!

এই সেক্সনের সবারই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। চঞ্চল ঠাকুরদেবতার চাইতে গাভাসকারকে অনেক বেশি ভক্তি করে। কৃষানু দে যখন যে ক্লাবে খেলবে অসিত তখন সেই ক্লাবেরই সার্পোটার। ওর ধারণা, আফ্রিকার মধ্যে নেলসন ম্যাণ্ডেলার চাইতে চিমার স্থান অনেক উপরে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অরূপ পাঁচ-ছ'টা টি-ভি সিরিয়াল আর দু'তিনটে সিনেমায় প্লে-ব্যাক করবে বলে সই-সাবুদ হবার পরও যে কেন সেগুলো হলো না, তা সত্যিই চিন্তার ব্যাপার।

এই সেক্সনে পাঁচজন মহিলা আছেন। ওদের মধ্যে রেখাদির বয়সই সব চাইতে বেশি। ঊনপঞ্চাশ। ওর বাবা এই কয়লাঘাটা অফিসের ক্লেমস্ সেক্সনে কাজ করতেন। রিটায়ার করার ঠিক দু'বছর আগে দুম করে মারা যাওয়ায় মাত্র বাইশ বছর বয়সে উনি এই অফিসে ঢোকেন। সেই থেকে এই একই ঘরে একই চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করছেন। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু দু'ধাপ প্রমোশন। সাতাশ বছর আগে উনি যখন জয়েন করেন, তখন এই সেক্সনে আর কোন মেয়ে কাজ করতো না।

বন্দনা জিজ্ঞেস কর, ঘর ভর্তি পুরুষের মধ্যে তোমার একার কাজ করতে অস্বস্তি হতো না?

--হতো না আবার?

উনি একটু থেমে বলেন, বড়দা-সুখেনদা-ত্রিদিববাবু আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ও সম্মান করলেও কেশববাবু বলে এক ভদ্রলোক বড্ড বিরক্ত করতেন।

—বিরক্ত করতেন মানে?

—যখন তখন আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা ছাড়াও সুযোগ-সুবিধা পেলেই আমাকে একটু ধাক্কা দিয়ে যাতায়াত করতেন।

মায়া মুখ বিকৃতি করে বলে, তুমি কিছু বলতে না?

—কী বলব? এসব কথা বলতেও তো লজ্জা করে।

—তা ঠিক, কিন্তু.....

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই রেখাদি বলে, তবে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই বড়দা আর সুখেনদা কায়দা করে আমার দু'পাশের দুটো টেবিলে বসার ব্যবস্থা করেন।

—তারপর আর উনি তোমাকে বিরক্ত করার সুযোগ পান নি?

—না।

হঠাৎ বন্দনা জিজ্ঞেস করে, তুমি এই অফিসের কারুর প্রেমে পড়োনি?

উনি মুখে একটা পান দিয়ে জর্দার কৌটো খুলতে খুলতে এক গাল হাসি হেসে বলেন, ঠিক প্রেমে না পড়লেও একজনকে খুবই ভাল লেগেছিল।

তিন-চারজন মেয়ে প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করে, তিনি কে? তাকেই তুমি বিয়ে....

—শেখর সরকার ; ক্যাটারিং সেক্সনে কাজ করতেন।

রেখাদি জর্দা মুখে দিয়েই চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, দেখতে যেমন সুন্দর, সেইরকমই স্মার্ট ছিল। ওর কথা শুনলে মন জুড়িয়ে যেত।

—তারপর? তারপর?

উনি ওদের প্রশ্ন না শুনেই বলে যান, তখন আমিও তো দেখতে খারাপ ছিলাম না! বেশ ডাগর-ডোগরই ছিলাম।

মৃদুলা বলল, এই বয়সেই তুমি যা আছো, তা দেখেই বুঝতে পারি.....

রেখাদি মুখ টিপে হেসে বলেন, আরে দুর! দুর! তোদের জামাইবাবুর ভালবাসার ঠেলায় শরীরটার বারোটা বেজে গেছে।

মায়া হাসতে হাসতে বলে, জামাইবাবু এখন তো আর তোমাকে বিরক্ত করে না।

উনি ঠোঁট উল্টে বলেন, না করে আবার না! ছেলেমেয়ে দুটো এত বড় হয়ে গেছে কিন্তু তবু সপ্তাহে অন্তত একদিন ওর মাথায় ভূত চাপবেই।

ওর শ্রোতারা না হেসে পারে না।

ওদের হাসি থামতে না থামতেই রেখাদি বলেন, হাসি-ঠাট্টা বাদ দিয়ে একটা কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করব, মেয়েদের কাছে প্রাইভেট ফার্মে কাজ করার চাইতে সরকারী অফিসে কাজ করা অনেক নিরাপদের।

বন্দনা সঙ্গে সঙ্গে বলে, তা বলো না রেখাদি। ভাল প্রাইভেট ফার্মে কাজ করতে মেয়েদের বিন্দুমাত্র অস্বস্তিতে পড়তে হয় না।

ও একটু থেমে বলে, আমার ছোট বোন চন্দনাকে তো তুমি দেখেছ। ওর মত সুন্দরী স্মার্ট মেয়ে তিন বছর ধরে টাটা স্টীলে কাজ করছে কিন্তু......

—ওরে বাপু, টাটাদের সঙ্গে সাধারণ প্রাইভেট ফার্মের তুলনা করিস না।

ঘরের কোনা থেকে যোগেনবাবু একটু হেসে গলা চড়িয়েই বলেন, রেখা, তোমাদের মহিলামহলের অধিবেশন শেষ হলে একটু কাজ দিতাম।

মায়া হাসতে হাসতে বলে, বড়দা, শুধু রেখাদিকে না, আমাদেরও কাজ দিন।

যোগেনবাবু মুখ তুলে বলেন, সুখেন, এই রকম রেসপনসিবল সিনসিয়ার কাজের মেয়ে তুই ভূ-ভারতে আর দেখেছিস?

—এদের চাইতে আমার বউ অনেক ভাল।

হাওড়া-তারকেশ্বরের মধ্যে রোজ তেইশ জোড়া ট্রেন যাতায়াত করলেও হরিপালে শেষ ও শুরু হয় একটি মাত্র ট্রেন। সকাল আটটা দুই হরিপালে এসে পৌঁছবার পর আটটা আটাশে ছেড়ে যায়। হাওড়া পৌঁছবার কথা ন'টা আটচল্লিশে কিন্তু দু'পাঁচ-দশ মিনিট লেট করবেই। তা না হলে কী ভারতীয় রেলের ধর্ম থাকে?

হরিপালের কয়েক শ' অফিসযাত্রীদের মত সৌম্যও এই ট্রেন ধরে। যদি সম্ভব হয় একটু আগেই ষ্টেশনে পৌঁছে যায়। ট্রেন ছাড়ার মুখে এসে পৌঁছলেও ক্ষতি নেই। কেউ না কেউ ডাক দেবেই, এই সমু, এদিকে আয়। জায়গা আছে।

প্রতিবেশী-পরিচিতদের সঙ্গে গল্প-গুজব করতে করতেই এক ঘণ্টা কুড়ি-পঁচিশ মিনিট সময় যেন হাওয়ায় উড়ে যায়। তারপর গঙ্গা পেরিয়েই দু'পা এগুলেই কয়লাঘাটার লাল রঙের অফিস। দশটা পনের-কুড়ির মধ্যেই অফিস।

—গুড মর্ণিং! বড়দা

—গুড মর্ণিং! ব্রাদার!

—এত বড় জলজ্যান্ত দশাদশই চেহারার মহিলা বসে আছে, তা তোমার চোখেই পড়ল না?

সৌম্য পিছন ফিরে 'রেখাদিকে দেখেই একটু হেসে বলে, সরি! সত্যি আপনাকে খেয়াল করিনি।

—তা করবে কেন? যদি অবিবাহিতা সুন্দরী যুবতী হতাম, তাহলে ঠিকই দেখতে পেতে।

—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

—কিচ্ছু পরীক্ষা করতে হবে না। এ পরীক্ষায় সব বয়সের সব পুরুষই টপাটপ পাশ করে যায়।

কাঁধের ঝোলা টেবিলের উপর রেখেই সৌম্য বলে, পরীক্ষায় পাশ করতাম কিনা তা আপনার মত একজামিনারের উপর নির্ভর করে। তবে সত্যি যদি তেমন কোন স্বপনচারিণীর দেখা পেতাম, তা হলে বলতাম—হে নিরুপমা, আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।

যোগেনবাবু ফাইলের ফিতা খুলতে খুলতেই বলেন, কী রেখা! হেরে গেল তো?

রেখাদি খুশির হাসি হেসে বলেন, সৌম্যর মত ছোট ভাইয়ের কাছে হেরে গিয়েও তো আনন্দ!

মায়া তির্যক দৃষ্টিতে সৌম্যর দিকে তাকিয়ে ঈর্ষৎ হেসে বলে, রেখাদি, এই ছেলেটাকে তোমরা সবাই আর মাথায় তুলো না!

—দেখছ রেখাদি, তোমার স্নেহধন্য মায়া কি হিংসুটে!

সুখেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আঃ! সৌম্য! তুমি কী জানো না, শুধু বড়দার আর আমার বউ ছাড়া কোন মেয়েই উদার হয় না।

যোগেনবাবু বলেন, সুখেন, এবার তোরা টিকা-টিপ্পনী দেওয়া ছেড়ে কাজ শুরু কর।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, যেভাবেই হোক, আজ ধানবাদ ডিভিশনের সমস্ত কেসগুলো ফাইন্যাল করে ডেপুটি সি-সি-এম'কে দিতেই হবে।

—কিচ্ছু চিন্তা কোরো না ; কাজ আমরা ঠিকই তুলে দেব। কিন্তু আমাদের সেক্সনের ভ্যাকান্সীগুলো কী আমাদের বেঁচে থাকতে থাকতে ফিল আপ হবে না?

—গতকালই সি-সি-এম বলেছেন, বোধহয় দু'এক মাসের মধ্যেই আমরা পাঁচজন না হলেও জনা তিনেক লোক পাবোই।

বন্দনা হাসতে হাসতে বলে, বড়দা, তিনজনই যেন দাড়ি-গোফওয়ালা না হয়। তিনজনজনের মধ্যে অন্তত দু'জন যেন মেয়ে হয়।

গুণময়বাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, এমন যে আমার আদরের বউ, সে পর্যন্ত বলতে পারে না, পেটের মধ্যে ছেলে আছে নাকি মেয়ে আছে। তাহলে বড়দাই বা কি করে বলবে, দাড়িওয়ালা নাকি বিনুনিওয়ালী লোক আমরা পাবো?

এইভাবেই দিনের শুরু হয়। শত হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজবের মধ্যেও সবাইকে কাজ করতে হয়। না করে উপায় নেই। এই সেক্সনে যথেষ্ট কাজের চাপ। তার উপর পাঁচজন লোক কম। ঐ পাঁচজন কতবছর হল রিটায়ার করেছেন কিন্তু তারপর থেকে ঐ পাঁচটা চেয়ার-টেবিল ফাঁকাই পড়ে আছে। সর্বোপরি স্বয়ং বড়দা হচ্ছেন সেক্সন অফিসার। সুতরাং ফাঁকি দেওয়া তো দূরের কথা, ঢিলেঢালা হবারও সুযোগ নেই।

তা হোক, তবু সৌম্যর ভাল লাগে। খুবই ভাল লাগে।

সমাজ-সংসারে কেরানীকুলকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রুপের শেষ নেই। বিয়ের শেয়ার-বাজারে কেরানীদের দাম সব চাইতে কম। তবে টাটা-বাটা-সিটি-হংকং-গ্রিণ্ডলেস-স্টেট ব্যাঙ্কের কেরানীরা নিকষ কুলীন বলে তাদের ভাও বেশ ভাল হলেও সরকারী অফিসের কেরানী দেখলেই সুন্দরী যুবতীরা ঠোঁট ওল্টাতে বাধ্য। এ সব সৌম্য জানে। তবে একথাও জানে, অর্থ-খ্যাতি-যশ-প্রভাব-প্রতিপত্তি মানুষকে অনেক কিছু দিলেও বিসজর্ন দিতে হয় হৃদয় ঔদার্য, মনের শান্তি, প্রাণের আনন্দ। শুধু কি তাই? বিদ্বেষ-হিংসা-লোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে মনের মধ্যে। স্বপ্ন দেখে আকাশ কুসুমের। আর কেরানীরা? কয়লাঘাটার এই প্রায়ান্ধকার সর্বাঙ্গে মলিনতা মাখা ঘরের কেরানীরা? তারা বকেয়া মাগ্গী ভাতা আর পে-কমিশনের কৃপার বাইরে কিছুই প্রত্যাশা করে না। সুখেনবাবু ঈর্ষা করেন না ত্রিদিব গুণময়দের, প্রতি দ্বন্দ্বিতা নেই মায়া-বন্দনার মধ্যে। তাছাড়া মন্মথবাবুর মেয়ের বিয়ের সময় বা রেখাদির স্বামীর অপারেশনের সময় এই হতভাগ্য কেরানীদের উৎকণ্ঠা ও সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা ভাগ্যবানদের অদৃষ্টে কোনদিনই জুটবে না। এদের সান্নিধ্যে সারাদিন কাটিয়েও সৌম্য হাসি মুখেই ছ'টা দশের তারকেশ্বর লোকালে উঠে সওয়া সাতটা বাজাতে না বাজতেই হরিপালে পৌঁছে যায়।

হরিপাল!

কোন কোনদিন ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই সৌম্য যেন চমকে ওঠে। স্বয়ং বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে এইরকমই একদিন হরিপাল ষ্টেশনে নেমে হাঁটা পথে আঁটপুরে গিয়ে বাবুরাম ঘোষের বাড়িতে সবাই মিলে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

এর-ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই চৌধুরিপাড়ার মোড়ে পৌঁছতেই সৌম্য আর এগুতে পারে না। কতজনের সঙ্গে কত কথাই ওকে শুনতে হয়, বলতে হয়।

ষ্টেশনের দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে জি ডি স্কুলের মাষ্টারমশাই গুরুপদ কবিরাজ বললেন, সৌম্য, সামনের বছর স্কুলের সেন্টেনারী উৎসব শুরু হবে। যখন যেখানেই পুরনো ছাত্র ছাত্রীদের দেখা হোক, তুমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাম-ঠিকানা লিখে নিতে ভুলে যেও না।

—না, না, স্যার, ভুলব না। এসব তো আমাদের মত এক্স-স্টুডেন্টদেরই কাজ।

হঠাৎ পুলিশের জীপে চড়ে যাবার সময় এক দারোগাবাবু মাষ্টারমশাইকে হাত

নাড়াতেই গুরুপদবাবু সৌম্য ও তার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই দারোগাবাবু কোন বংশের ছেলে জানো?

সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই উনি বললেন, ইনি স্বয়ং চৈতন্যদেবের গুরু কেশব ভারতীর বংশধর!

—বলেন কী স্যার?

—হ্যাঁ, সৌম্য, ঠিকই বলছি।

মাষ্টারমশাই একটু হেসে বলেন, দারোগা হলেও ইনি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া।

—তাহলে তো একদিন আলাপ করতে হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেও। উনিও খুশি হবেন, তোমারও ভাল লাগবে।

মাষ্টারমশাই বিদায় নিতেই অঞ্জলি বৌদি কিছু কেনাকাটা করে গলির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে স্বামীকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, কখন ট্রেন এসে গেছে আর এখনও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে বক বক করে চলেছ?

চণ্ডী সঙ্গে সঙ্গে বলে, তুমি বাড়িতে নেই বলেই তো কেষ্টদা যেতে পারছে না আর আমাদেরও যেতে দিচ্ছে না।

—তোমাদের কেষ্টদা যে আমাকে এত ভালবাসে, তা তো জানতাম না!

—জানবে কী করে? তোমাদের সল্ট লেকের লোকজনদের মত হরিপালের মানুষ নিজেদের ঢাক-ঢোল পেটায় না।

চণ্ডী প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে, তবে কেষ্টদা তোমাকে যা ভালোবাসে, আমি তার লক্ষ কোটি গুণ বেশি ভালবাসব তোমার ছোট বোন আমার স্বপনচারিণীকে।

বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েই অঞ্জলি বৌদি একটু হেসে বলেন, মরে গেলেও আমার ছোট বোন হরিপালের বউ হবে না।

—কোন দুঃখে তাকে এখানে বউ করে আনব? আমি তো তাকে নিয়ে শুধু হনিমুনে যাবো!

কেষ্টদা হাসতে হাসতে বলে, জানিস সমু, যখনই শ্বশুরবাড়ি যাই, তখনই আমার ছোট শালী আমাকে চণ্ডীর কথা জিজ্ঞেস করবেই।

সৌম্য একটু কৌতুকের সঙ্গেই বলে, সত্যি?

উত্তর দেয় চণ্ডী, আলবাত্ জিজ্ঞেস করে!

বারো-তের ঘণ্টা বাইরে কাটিয়েও বেশ হাসি মুখেই সৌম্য বাড়িতে ফিরে আসে।

রবিবার সাত সকালেই যেন বাড়িতে ডাকাত পড়ল!

অনেক দূর থেকে সাইকেলের ক্রীং ক্রীং বেল বাজাতে বাজাতে দরজার গোড়ায় পৌঁছেই চণ্ডী চিৎকার করল, এই সমু! তুই তো কেল্লা ফতে করে দিয়েছিস!

এ বাড়ির লোকজন কিছু বুঝে ওঠবার আগেই বকুল আর ওর ছোড়দি পারুল নাইটি পরেই নাচতে নাচতে বাড়ির মধ্যে পা দিয়েই চিৎকার করে, সমুদা! কনগ্রাচুলেশনস!

ছায়া-কাবেরী তিথি-মৃত্তিকারা ওদেব প্রশ্ন করার আগেই উর্মির সম্পাদিকা দীপালিবৌদি একেবারে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতেই চিৎকার করে, সমু! কোথায় গেলি?

এই উল্লাস আনন্দের কাবণ জানার জন্য কাবেরী আর ধৈর্য ধরতে না পেরে দু'হাত দিয়ে পারুলকে জড়িয়ে ধরে বলে, ব্যাপার কীরে?

—আজ আনন্দবাজারে সমুদার গল্প বেরিয়েছে।

কাবেরী পাগলের মতো চিৎকার করে, ও মা! ও দিদি! আজকের কাগজে ঠাকুরপোর গল্প বেরিয়েছে!

এই হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কি ঘুম হয়! তিথি এক ডাক দিতেই সৌম্য উঠে বসে। সঙ্গে সঙ্গে উর্মির সম্পাদিকা জোর করে ওর মুখে মিষ্টি পুরে দেন।

শুরু হল অভিনন্দনের পালা। বকুল বলল, এবার বুক ফুলিয়ে বলতে পারব, আমাদের হরিপালেও একজন রীতিমতো ভাল লেখক আছেন।

সৌম্য খাট থেকে নামতে নামতে বলে, মাত্র দু'সপ্তাহ আগেই চিঠি পেলাম, গল্পটা মনোনীত হয়েছে কিন্তু ভাবতে পারিনি, এত তাড়াতাড়ি ছাপা হবে।

ও পায়ে চটি দিতে দিতে বলে, তোমরা বসো। বাবা-মা দাদা-বৌদিদের প্রণাম করে আসি।

যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা হরিপাল! প্রায় শোভাযাত্রা করে দলে দলে লোক এসে সৌম্যকে অভিনন্দন জানালো। অঞ্জলিবৌদি আর ছোটদা শুধু ওকে না, সবাইকে আবির মাখিয়ে দেবার পর মিষ্টি খাওয়ালেন। দুপুরের রোদ্দুর মাথায় করে হাজির হলেন অবিনাশবাবু—ওরে সমু, কোথায় গেলি বাবা! আয়, তোকে একটু বুকে জড়িয়ে ধরি।

সৌম্য ছুটে আসে। প্রণাম করে। অবিনাশবাবু ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেই ওর হাতে একটা ফাউন্টেন পেন দিয়ে বলেন, কলমটা দিয়ে লিখিস। খুব খুশি হব।

ও এক ঝলক কলমটা দেখেই বলে, কাকা, এ তো পার্কার!

—হ্যাঁ, তাতে কী হল?

—এত দামি কলম কেন দিলেন?

—তোকে কলমটা দিয়ে যে শান্তি পেলাম, তা কি দশ-বিশ টাকা লাভ করে পেতাম?

—তা না কিন্তু..........

মনোরঞ্জনবাবু বারান্দায় এক কোনায় বসে চিঠি লিখতে লিখতেই মুখ তুলে ছোট ছেলেকে বলেন, অবিনাশ যখন দিচ্ছে তখন এত দ্বিধা করছিস কেন?

ছায়া ঘরে ভিতর থেকে একটু মুখ বাড়িয়ে বলে, কাকা! চলে যাবেন না। একটু বসুন।

দু' মিনিটের মধ্যে কাবেরী এক প্লেট মিষ্টি সামনে এনে ধরতেই অবিনাশবাবু বলেন, মা লক্ষ্মী, বসে বসে দোকানদারি করতে করতে আমি ডায়াবেটিক হয়ে পড়েছি। আজ আমাদের সবার আনন্দের দিন। তাই একটা তুলে নিচ্ছি।

এ বাড়ির মধ্যে সবার আগে তিথি আর মৃত্তিকা এক সঙ্গে গল্পটা পড়েই ছুটে আসে। দু'জনেই এক সঙ্গে বলে, ভালকাকু, গল্পটা ওয়াণ্ডারফুল হয়েছে।

হাজার হোক প্রেমের গল্প। মা-বাবা-দাদারা খুশি হলেও মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু দুই বৌদি তো চুপ করে থাকার পাত্রী না।

ছায়া বলে, সত্যি করে বলো তো এই তমোঘ্নাকে পাওনি বলেই কি তুমি বিয়ে করছ না?

সৌম্য হো হো করে হেসে উঠে বলে, বড় বৌদি, এটা গল্প! আমার জীবন কাহিনী না।

ছায়া তর্ক-বিতর্ক না করে চলে গেলেও কাবেরী তো সহজে ছাড়ার পাত্রী না। দুঁধে ফৌজদারি উকিলের মতো রীতিমতো জেরা করতে শুরু করে।

—তমোঘ্নাকে কালো বললেও সে তো অত কালো ছিল না।

—কে অত কালো ছিল না?

কাবেরী সেকথা কানে না তুলেই বলে, তমোঘ্না শ্রীরামপুর কলেজে পড়লেও সে তো পড়তো প্রেসিডেন্সীতে। তাছাড়া মোটেও সে বাংলায় অনার্স নেয় নি, ওর অনার্স ছিল.....

সৌম্য একটু গলা চড়িয়ে ধরে বলে, পাগলের মতো কী যা তা বক বক করছ?

কাবেরী তবুও থামে না। বলে যায়, তমোঘ্না এই হরিপালের বাবু পাড়ার মেয়ে হলেও সে থাকত নালিকুলে। তবে কলেজ বন্ধ থাকলেই তিনি হরিপালে না এসে পারতেন না।

—এই ছোট বৌদি, কেন চৈতিকে নিয়ে টানাটানি করছ? যে মেয়েটা আমাকে রাখি পরাত তার সম্পর্কে প্লীজ.....

—তাহলে বলো, তমোঘ্না কে?

—কাবেরী দেবী! পবিত্রবাবুর শয্যাসঙ্গিনী হয়েও যে আমাকে পাগলের মতো ভালবাসে......

—বুঝেছি, বুঝেছি। তোমাকে না পাবার জন্য যে কাবেরী রোজ একবার করে আত্মহত্যা করে, তার কথা বলছ তো?

—ইয়েস! ইয়েস!

শুধু কাবেরী বা হরিপালের লোকজনই না, পরদিন কয়লাঘাটা অফিসে পা দিতেই সুখেনবাবু বলেন, এই যে ব্রজের রাখাল! অন্যতমা গোপিনীকে নিয়ে গল্প পড়লাম। আমার বৌ তো গলে গেছে তোমার গল্প পড়ে।

যোগেনবাবু থেকে শুরু করে প্রত্যেকে ওকে অভিনন্দন জানালেন। মায়া-বন্দনা চেপে ধরল, সত্যি করে বলো তো কে তমোঘ্না? সত্যি কথা বললে তোমাকে একটা দারুণ প্রাইজ দেব।

—আগে বলো কী প্রাইজ দেবে?

—আমরা যা প্রাইজ দেব, তাতে তোমার মন খুশিতে ভরে যাবে।

—যদি তোমরা দু'জনেই তোমাদের স্বামীকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে না করো, তা না হলে আমি খুশি হব না।

মায়া বলল, খোকা, একটি থাপ্পড় খাবে।

বন্দনা বলল, মায়া যা ইচ্ছে করুক। তুমি সত্যি কথা বললে আমি নাচতে নাচতে

তোমাকে বিয়ে করব।

একটা মাত্র গল্প প্রকাশিত হবার পর সৌম্যকে ঘরে বাইরে কত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। হঠাৎ গল্প লিখলে কেন, কখন লেখ, ছাপতে দেবার আগে কাকে কাকে পড়িয়েছে, আর কতগুলো গল্প পত্র-পত্রিকায় পাঠিয়েছ, যে গল্প ছাপা হয়েছে, তার জন্য কত টাকা পেলে ইত্যাদি আরও কত কথা কতজনে জিজ্ঞেস করে।

পরের মাসে দু'পাঁচ দিনের ব্যবধানে যুগান্তরে একটা আর নবকল্লোলে আরও দুটো গল্প ছাপা হতেই মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল।

কাবেরী বাড়িভর্তি লোকের সামনে সৌম্যর পিঠে দুম দুম করে ঘুসি মেরে বলে, অসভ্য ছেলে কোথাকার! তোমার নায়িকা কাবেরীর মতো এই কাবেরী মোটেও বিয়ের আগে প্রেম করেনি।

—আমি কী করে জানব? নেহাৎ বড়বৌদি সব কিছু বলার পর একটা গল্প লিখতে......

ছায়া প্রায় বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে সৌম্যর একটা কান ধরে বলে, বাঁদর ছেলে, আমি তোমাকে এইসব আজেবাজে কথা বলেছি?

—শ্বশুরবাড়ি বলে ভয় পাচ্ছ কেন বড়বৌদি? আমি থাকতে তোমার ভয় কী?

ওদিকে অন্য গল্পে সল্টলেকের আরতি বাবা-মা দিদি-জামাইবাবুর অনেক অনুরোধ-উপরোধ-ভয় উপেক্ষা করে বাউণ্ডুলে চণ্ডীর সঙ্গে উধাও হবার বছর পাঁচেক পর এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে ওসাকা থেকে ফিরতেই সবার চক্ষুস্থির। এই পৃথিবীতে প্রেমের চাইতে যে কোনো বড় শক্তি নেই, তা প্রমাণ করে আরতি আর চণ্ডী কী খুশি!

এই গল্পের জন্যও কতজনের কত কথা ওকে শুনতে হয়েছে!

এইসব গল্প ছাপা হবার জন্যই নয়, স্বভাব-চরিত্রের জন্যই সৌম্যকে সবাই ভালবাসে। ছায়া তো ওকে প্রায় নিজের সন্তানের মতোই ভালবাসে, স্নেহ করে। কাবেরী তো ঠাকুরপো বলতে অজ্ঞান। না হবার কোন কারণও নেই। দুই বৌদি আর দুই ভাইঝির ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা প্রয়োজন তো ও হাসিমুখে সামলায়। দুই ভাইঝির নামকরণ থেকে ওদের লেখাপড়া-জামাকাপড় শখ-আনন্দ সবকিছুই তো ভালকাকুর দায়িত্ব। দোতলার একটা ঘরে সৌম্য থাকে, অন্য ঘরে থাকে তিথি আর মৃত্তিকা। হিন্দোল থাকে দাদু-ঠাম্মার ঘরে। পড়াশুনা-শোওয়া-বসা সবই ঐ ঘরে। পড়াশুনা ছাড়া অন্য সবকিছু সামলায় ভালকাকু। অফিসেও সবাই ওকে ভালবাসেন। ইদানীং দু'চারটে গল্প লেখার জন্য কয়লাঘাটা বিল্ডিং-এর অনেকেই

ওকে একটু সম্মান করতে শুরু করেছেন।

বাড়ির লোকজনের মতো অফিসের সহকর্মীরা শুধু একটি বিষয়েই চিন্তিত। ছেলেটার রূপ আছে, গুণ আছে. রেলের আপার ডিভিশন ক্লার্ক হলেও মাইনে তো বেশ ভালই। বিয়ে করলে থাকা খাওয়ার ব্যাপারে কোনা দুঃশ্চিন্তার কারণ নেই। তবে বিয়ে করছে না কেন?

বাবা-মা-দাদারা জিজ্ঞেস করতে না পারলেও দুই বৌদি বহুবার সৌম্যকে বলেছেন, তুমি যদি নিজে কাউকে পছন্দ করে থাক, তাহলে আমাদের তো বলতে পারো। একবার বলেই দেখ না, আমরা কীভাবে কী করি।

—সত্যি বলছি, বিশেষ কোনো মেয়েকে বিয়ে করার জন্য আমি বসে নেই। এখনই আমার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে নেই।

—কিন্তু তোমার তো একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে, ভবিষ্যত......

সৌম্য একটু হেসে বলে, রাত্রে বিছানায় একটা বউ পেলেই বুঝি আমার ব্যক্তিগত জীবন ধন্য হয়ে যাবে? বাবা-মা না হয় বুড়ো হয়েছেন কিন্তু তোমরা তো আছ, আমার তিনটি ভাইপো-ভাইঝি আছে। আমার আবার চিন্তা কী?

ওরা হতাশ হয়ে চুপ করে থেকেছে।

কতজনে কত ভাল ভাল মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন কিন্তু সৌম্য আমল দেয়নি।

সেদিন অফিস ছুটির ঘণ্টা খানেক আগে মন্মথবাবু পুরী যাবার পাসের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়েই একটু হেসে যোগেনবাবুকে বলেন, বুঝলে বড়দা, মেয়েগুলোকে পার করবার পর এবার বুড়ো-বুড়ি একটু নিশ্চিন্তে ক'টা দিন কাটাতে পারব।

—যাও, যাও, দিন পনেরো বিশ্রাম করে এস। মেয়েগুলোর চিন্তায় তোমার শরীরটাই একেবারে ভেঙে গেছে।

উনি একটু থেমে বলেন, বছরে এক-আধ মাস সবারই বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সুখেন-ত্রিদিবরা মাঝে মাঝেই টুকটাক বেরিয়ে পড়ে বলে ওরা কত ভাল আছে।

সঙ্গে সঙ্গে সৌম্য বলে, বড়দা, ওদের চাইতে অনেক ভাল আছেন আপনার প্রিয় পাত্রীরা। স্বামীকে ল্যাংবোট করে শ্রীমতীরা তো হরদম....

ফোস করে ওঠে রেখাদি, আমাদের স্বামী আছে বলেই তাদের নিয়ে যাই। তুমি একটা বউ যোগাড় করতে পারলে না বলে তাদের হিংসা কর কেন?

বন্দনা বলল, তোমার বউ নেই বলে তুমি বেড়াতে যাও না।

এইসব টিকা-টিপ্পনী শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সৌম্যর খেয়াল হয়, তিনবছর ধরে

রেলের চাকরি করলেও সে একবারও পাস নিয়ে কোথাও যায়নি। বিনা খরচে ফার্স্ট ক্লাস বা এ. সি-টু টায়ারে চড়ে ভারত ভ্রমণের এ হেন সুযোগ এতদিন না নেবার জন্য দুঃখও হয়, আক্ষেপও হয়। মনে মনে ঠিক করে, এই সুযোগ আর কখনও নষ্ট করবে না।

যোগেনবাবুর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে সৌম্য বলে, বড়দা, একটা আবেদন আছে। তিন বছরের মধ্যে আমি ছুটিও নিইনি, পাসও নিইনি।

উনি কাজ করতে করতেই একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, কেন নাও নি? আমি কি আপত্তি করেছি?

—না কিন্তু লোকজন তো কম......

—তার জন্য তুমি একা কেন সাফার করবে? এই তিন বছরে কে ছুটি নেয়নি?

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর সৌম্য বলে, মাস খানেক ছুটি নিলে কি খুব বেশি অসুবিধে হবে?

এবার উনি মুখ তুলে তাকিয়ে বলেন, একশ'বার অসুবিধার হবে কিন্তু তাই বলে তিন বছর পর তুমি এক মাস ছুটি পাবে না, তা তো হতে পারে না।

যোগেনবাবু মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, এখনই ছুটির দরখাস্ত লিখে দাও। আজ ডেপুটি সি-সি-এম খুব ভাল মুডে আছেন। যে কাগজ সামনে ধরব, তাতেই উনি সই করে দেবেন।

ছুটি, পাস, সামনের মাসের মাইনে—কোনো কিছু পেতেই অসুবিধে হল না। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই এ পর্ব চুকল।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে চা-জল খাবার খেতে খেতে মা আর বড় বৌদির সামনেই সৌম্য ছোট বৌদিকে বলল, কাবেরী, যদি আমার স্ত্রী হিসেবে যেতে রাজি থাক, তাহলে এয়ার-কণ্ডিশনড্ গাড়িতে সিমলা পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনতে পারি।

কনিষ্ঠ পুত্রের কথা শুনে সরলাবালা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি লুকোলেও ওর দুই পুত্রবধূই হাসিতে ফেটে পড়েন।

ওদের হাসি থামার আগেই সৌম্য আবার বলে, ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে দেওর-বৌদির বিয়ে হয়। সুতরাং সিমলা ভ্রমণের আনন্দ যদি তুমি স্থায়ীভাবে উপভোগ করতে চাও, তাহলে আমি পাকাপাকিভাবেও তোমাকে শয্যাসঙ্গিনী করতে......

বৃদ্ধা সরলাবালা আর ওখানে থাকা নিরাপদ মনে করেন না। স্থান ত্যাগ করেন। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া আঁচল দিয়ে মুখ চাপা দেন আর কাবেরী

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে হাসতে হাসতেই সৌম্যর একটা কান ধরে বলেন, ঠাকুরপো, তোমাকে যদি আমি ঠাণ্ডা করতে না পারি, তাহলে আমার নাম কাবেরী না।

—সে তো আমি একশ বার স্বীকার করি। তুমি ছাড়া আর কেউ তো আমার জ্বালা-যন্ত্রণা-আগুন......

দিন এগিয়ে চলে; এগিয়ে চলে চার সপ্তাহের ছুটি কাটাবার প্রস্তুতি। স্বদেশি-বিদেশি টুরিস্টদের মতো এক একটা জায়গায় দু' একদিন কাটিয়েই ও খুশি হবে না। তাইতো ঠিক করেছে কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী আর সিমলায় চার-পাঁচ দিন করে থাকবে। তিথি জিজ্ঞেস করে, ভালকাকু, তুমি আগ্রার ফোর্ট বা তাজমহলও দেখবে না।

সৌম্য বলে, এবার আর হবে না।

—কেন? তুমি তো দিল্লী যাবে। যাতায়াতের পথেই তো আগ্রা ঘুরে যেতে পার।

—কোনো ঐতিহাসিক শহরে এক-আধ বেলা কাটিয়ে কি মন ভরে?

ও একটু থেমে বলে, এইসব জায়গা ভালভাবে জানতে হলে, দেখতে হলে হাতে একটু সময় নিয়ে যাওয়া উচিত।

মৃত্তিকা বলে, ঠিক বলেছ ভালকাকু। দিন-রাত্তিরের নানা সময় নানাভাবে না দেখলে কি তাজের বিউটি উপভোগ করা যায়?

তিথি বলে, দ্যাটস্ রাইট কিন্তু তার জন্য তো সময় পয়সা দুই-ই চাই। সুতরাং অনেক সময়......

সৌম্য বলে, কিন্তু আমার তো কোনো তাড়া নেই। বছর বছরই তো ছুটি পাব, পাসও পাব।

অফিসের সহকর্মীদের অনেকেই ওকে কাশী-লক্ষ্ণৌ-দিল্লি-সিমলার ব্যাপারে অনেক খোঁজখবর দিলেন। কলকাতা থেকে রওনা হবার ক'দিন আগেই সমস্ত রিজার্ভেশনও হয়ে গেল। তারপর একদিন বাড়ির সব গুরুজনদের প্রণাম করে হরিপাল থেকে হাওড়া স্টেশন। পূর্বা এক্সপ্রেসে তুলতে এলেন ছোড়দা, ছোটবৌদি আর তিন ভাইপো-ভাইঝি ছাড়া একদল বন্ধুবান্ধব। বুক ভর্তি স্বপ্ন নিয়ে সৌম্যর উত্তর ভারত ভ্রমণের প্রথম পর্ব শুরু হল।

এর আগে ও মাত্র দু'বার বেড়াতে বেড়িয়েছে। একবার হরিপালের চার-পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে পুজোর সময় ক'দিন দীঘায় যাওয়া ছাড়া যাদবপুরে পড়ার সময় ক্লাসের ক'জন বন্ধর সঙ্গে দার্জিলিং গিয়েছিল। পূর্বা এক্সপ্রেসের এ-সি টু-টায়ার কম্পার্টমেন্টে একটু স্থিতু হয়ে বসতেই সে স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠল।....

হঠাৎ শৈবাল বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, হ্যারে, দার্জিলিং যাবি?

তিন-চারজন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, এই শীতে?

—শীতের দার্জিলিং-ই তো সব চাইতে বিউটিফুল। এক ফোঁটা মেঘ-বৃষ্টি থাকবে না....

নানা জনে নানা ধরনের প্রশ্ন করে। দার্জিলিং-এর সৌন্দর্য দেখার আর সময় পেলি না? হঠাৎ এমন উদ্ভট চিন্তা তো' মাথায় এল কেন? এখন গেলে তো টাকাগুলো জলে যাবে।

দু' একজন শর্মিষ্ঠা-মল্লিকাদের দেখিয়ে চাপা হাসি হেসে বলল, এরা যদি বেড ওয়ার্মার হতে রাজি থাকে, তাহলে আমরা যেতে পারি।

শৈবাল দু'হাত তুলে বলে, তোরা বাজে বক বক না করে আমার কথা শোন।

—হাঁ, হ্যাঁ, বল।

—আমার দিদির বড় ভাসুর এখন নর্থ বেঙ্গলের ডিভিশন্যাল কমিশনার। আমাকে খুবই ভালবাসেন। উনি কাল রাত্তিরেই কথায় কথায় হঠাৎ আমাকে বললেন, ইয়াংম্যান, এই ডিসেম্বরের শীতে দু'একজন বন্ধুকে নিয়ে দার্জিলিং চলে যাও। সারাদিন ধরে কাঞ্চনজঙঘা দেখতে দেখতে নেশা হয়ে যাবে।......

অভিষেক ওর কথার মাঝখানেই প্রশ্ন করে, আগে বল, উনি আমাদের জন্য কী করবেন?

—শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাতায়াতের জন্য গাড়ি দেবেন, সার্কিট হাউস বা অন্য কোন ভাল বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা করা ছাড়াও এদিক-ওদিক যাবার জন্য দু'একদিন জীপও দেবেন।

শর্মিষ্ঠা বলল, তার মানে আমাদের ট্রেন ভাড়া আর খাওয়া-দাওয়ার খরচ যোগাড় করতে পারলেই......

—দ্যাটস্ রাইট!

সৌম্য বলে, আমরা ক'জন যেতে পারি, তা কি উনি বলেছেন?

—না, তা বলেন নি।

ও একটু থেমে বলে, উনি আজ আর কাল কলকাতায় আছেন। তোরা রাজি থাকলে আমি আজ রাত্তিরে ওনার সঙ্গে দেখা করে সব জেনে নেব।

—গুড।

পরের দিনই শৈবাল বলল, উনি বলেছেন, জনা ছয়েকের বেশি হলে বোধহয় এক জায়গায় ঘর দেওয়া একটু অসুবিধে হতে পারে ; তবে অন্য কোনো বাংলোয় উনি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দেবেন।

সে যাই হোক অনেক আলাপ-আলোচনা হিসেব-নিকেশ সুবিধে-অসুবিধের পর্ব শেষ হবার পর বিশে ডিসেম্বর সন্ধের পর দার্জিলিং মেলে চড়ল শৈবাল, সৌম্য, শিখর, মানব, মল্লিকা আর লোপামুদ্রা। সেই সাতদিন দার্জিলিং কাটাবার স্মৃতি সৌম্য কোনোদিন ভুলতে পারবে না। শুধু সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে করতেই রাত ন'টা নাগাদ সৌম্য বাবা বিশ্বনাথের খাস তালুকে পৌঁছে যায়।

যার শুরু আছে, তার শেষও আছে। তাইতো উত্তর বাহিনী গঙ্গা বক্ষে নৌকাবিহার করতে করতে অসংখ্য মন্দিরে সন্ধ্যাবাতির মঙ্গল-ধ্বনি শোনার পর ঘুরে বেড়ায় লক্ষ্ণৌতে সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত রেসিডেন্সি আর ভুলভুলাইয়া, অলস মধ্যাহ্ন কাটায় কুতুব মিনারের আশেপাশে, অপরাহ্ন কাটায় বাদশা-বেগমদের খাসমহলে। যাদবপুরের এক পুরনো বন্ধু এখন দিল্লিবাসী সাংবাদিক হওয়ায় একদিন লোকসভার অধিবেশনও দেখে নেয়। সিমলায় গিয়ে সেই ফেলে আসা ছাত্রজীবনের সোনালি দিনে দার্জিলিং ভ্রমণের স্মৃতি বড্ড বেশি মনে পড়ে। তারপর কালকা মেলে সোজা হাওড়া!

মাস খানেক পর বাড়ি ফিরে আসায় সবাই খুশি। তিথি আর মৃত্তিকা বলে, ভালকাকু, তুমি না থাকলে এই বাড়িতে থাকার কোনো আনন্দ নেই।

বৃদ্ধা সরলাবালা একটু হেসে বললেন, জানিস সমু, বড় বৌমা কী বলেছে?

—কী বলেছে?

—বলেছে, বিনা নুনের রান্না খাওয়া আর ছোট ঠাকুরপো ছাড়া এ বাড়িতে থাকা একই ব্যাপার।

ছায়া সঙ্গে সঙ্গে বলে, ঠিকই তো বলেছি, আপনার অন্য দুই ছেলে বাড়িতে থাকলেও যা, না থাকলেও তাই।

কাবেরী বলে, সত্যি ঠাকুরপো, তুমি না থাকলে এই বাড়িতে থাকতে একটুও ভাল লাগে না।

—তা আমি খুব ভাল করেই জানি। তোমার সব সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা স্বপ্ন-সাধনা যে আমাকে নিয়েই.......

তিথি তো এখন আর ছোট নেই। বি.এ. ক্লাসের ছাত্রী। সে চাপা হাসি হেসে সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার এই ধরনের কথাবার্তগুলোই তো মা-কাকিমার টনিক। তোমার এইসব কথা না শুনে ওরা হাঁপিয়ে উঠেছিল।

পরের দিন শুক্রবার আঠাশে অফিসে যেতেই সবাই মহাসমাদরে ওকে অভ্যর্থনা করলেন। এমন কি মন্মথবাবু পর্যন্ত বললেন, তুমি ফিরে এসে বাঁচালে।

সুখেনবাবু বললেন, ওহে ব্রজের রাখাল, হিল্লী-দিল্লির গোপিনীদের হৃদয় দেবার পরও ফিরতে পারলে?

রেখাদি বললেন, সুখেনদা-ত্রিদিবদাদের ঝুনো নারকেলের মতো মুখগুলো দেখতে দেখতে আমরা টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম।

ত্রিদিববাবু একটু গলা চড়িয়ে বললেন, বড়দা, তোমার প্রিয় পাত্রী রেখা দেবীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনছি।

যোগেনবাবু ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই জবাব দেন, তুই মামলা করলে নিশ্চয়ই তোর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব।

বন্দনা বলল, বড়দা, আপনার প্রিয় পাত্রদের বলে দিন, সোমবার যে দু'জন মহিলা জয়েন করবেন, তারা আমাদের মতো মিশুকে নাও হতে পারেন। ভদ্রমহোদয়রা যেন একটু বুঝে সুঝে.....

সুখেনবাবু বললেন, ও ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়। এই কয়লাঘাটায় কলম পিয়ে পিয়ে কয়লা হয়ে গেলাম আমরা। এখন দু'জন মহিলার ভয়ে স্বভাব পাল্টাতে হবে?

সৌম্য মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, রেখাদি, সোমবার থেকে বুঝি দু'জন মহিলা আমাদের সেকশনে জয়েন করছেন?

—হ্যাঁ, ভাই।

সাড়ে দশটার মধ্যে দু'জনেই এসে হাজির। শ্রীমতী চৈতালী মুখার্জী আসানসোল ডিভিশন্যাল অফিসে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করার পর এখানে এলেন দুটো ছেলেমেয়ের জন্য। ছেলে দু'বছর আগেই যাদবপুরে ঢুকেছে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। ভদ্রেশ্বরে মাসির বাড়িতে থেকেই পড়ছিল কিন্তু ওখান থেকে যাতায়াত করতে এত পরিশ্রম ও সময় চলে যায় যে ঠিক মতো পড়াশুনা করতে পারছিল না। এবার মেয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ভাগ্যক্রমে ডাক্তারিতে চান্স পেয়ে ন্যাশনাল মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছে। এদের দু'জনের জন্যই ঢাকুরিয়ায় বাসা ভাড়া করেই অনেককে ধরাধরি করে এখানে বদলী হয়ে চলে এসেছেন।

ভদ্রমহিলার গায়ের রং বেশ চাপা। একটু মোটা থলথলে। মাথার চুলে পাক ধরেছে। চোখে চশমা। মুখখানা দেখে অনেকটা কানন দেবীর মতো স্নেহময়ী মনে হয়।

অন্যজন তিথি ব্যানার্জীর বয়স কত হবে? বড় জোর সাতাশ আঠাশ বা তার আশেপাশে। তিরিশের বেশি কখনই নয়। বেশ ছিপছিপে চেহারা কিন্তু কখনই রোগা না। গায়ের রঙ মায়ার মতো অত ফর্সা না হলেও বেশ উজ্জ্বল। নাক একটু চ্যাপ্টা হলেও টানা টানা বড় বড় দুটি চোখ আর সুন্দর দুটি ভুরু মুখখানিকে মাধুর্যে ভরিয়ে দিয়েছে। ডান হাতে ছোট্ট একটা ঘড়ি, বাঁ হাতে শুধু একটা চুড়ি। পরনে রঙীন তাঁতের শাড়ি। ডান কাঁধ দিয়ে ছোট্ট আঁচলটা ঘুরিয়ে এনেছেন। বাঁ কাঁধে ব্যাগ। কপালে টিপ, সিঁথিতে একটু সিঁদুরের স্পর্শ। রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে জীবনে এই প্রথম চাকরি করতে এসেছেন।

যোগেনবাবু ওদের দু'জনের কথা জানাবার পর ঘরের অন্যান্যদের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

—মন্মথবাবু থেকে শুরু করে সুখেন ত্রিদিব, বলরাম, বলাই, গুণময়, দিলীপরা শুধু আমার সহকর্মী না, এরা আমার ভাই, আমি সবার বড়দা।

সুখেনবাবু বলেন, বড়দা, আমার ব্রজের রাখালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না?

যোগেনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? জানিস না, একেবারে শেষে দই-মিষ্টি পরিবেশন করতে হয়?

কথাটা শুনে নবাগতা দু'জনেই কৌতুক মিশ্রিত দৃষ্টিতে সৌম্যর দিকে তাকাতেই ও লজ্জায় দৃষ্টি গুটিয়ে নেয়।

মেয়েদের সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিয়ে যোগেনবাবু বলেন, এরা প্রত্যেকেই আমাদের বোন। এরা বড় ভাল। আমি হচ্ছি এদের ছেলেমেয়েদের বড় বড়মামা। আর এই হচ্ছে সৌম্য সরকার.......

মিসেস মুখার্জী ওর দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে বলেন, এমন সুন্দর সৌম্যদর্শন ছেলের আর কী নাম হবে?

তিথি ওর দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েই একটু হাসেন। মুখে কিছু বলেন না।

যোগেনবাবু বলে যান, সৌম্য শুধু এম. এ. পাশ না, ভাল গল্প লেখে। আনন্দবাজার, যুগান্তর, নবকল্লোলে......

উনি আরে কত কী বলেন কিন্তু তিথির কানে যায় না। সে আপন মনে কী যেন ভাবে। দু'এক মিনিট পর হঠাৎ সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলেন, স্বপনচারিণী গল্পটা কি আপনারই লেখা?

সৌম্য শুধু বলে, হ্যাঁ।

—গল্পটা সত্যি অপূর্ব! আমি তিন-চারবার পড়েছি। নায়িকার নাম তমোঘ্না ছিল না?

—হ্যাঁ।

—আমি ভাবতেই পারিনি, এখানে আপনার দেখা পাব।

রেখাদি ওদের দিকে তাকিয়ে বলেন, কয়লাঘাটার এই পঙ্কে সৌম্যই তো একমাত্র পঙ্কজ। ওর দৌলতে এখন আমরাও একটু খাতির-টাতির পেতে শুরু করেছি।

সব শেষে যোগেনবাবু বলেন, আমাদের মধ্যে একমাত্র সৌম্যই এখনও বিয়ে করেনি।

সৌম্য বলে, বড়দা, সেটা কী আমার কোয়ালিফিকেশন, নাকি ডিসকোয়ালিফিকেশন?

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন, এটা স্ট্যাটাস্ রিপোর্ট। কেউ বলবে, আধ গেলাস ভর্তি, আবার কেউ বলবে, আধ গেলাস ফাঁকা।

যোগেনবাবুর মন্তব্য শুনে শুধু নবাগতা দু'জন মহিলাই না, সৌম্যও একটু না হেসে পারে না।

. .

সেদিন সন্ধের পর বাড়ি ফিরেই সৌম্য সোজা ভিতরে ঢুকে ছায়াকে বলে, জানো বড় বৌদি, আজ আমাদের সেকশনে যে দু'জন মহিলা জয়েন করলেন, তার মধ্যে একজনের নাম তিথি।

দুই বউই এক সঙ্গে বলে, তাই নাকি?

সৌম্য এক গাল হেসে বলে, ভদ্রমহিলার নাম তিথি জেনে আমার এত ভাল লাগল যে কি বলব!

ছায়া বলে, খুব স্বাভাবিক। এই নামটা তোমার খুব প্রিয় বলেই তো মেয়েটার নাম রাখলে।

—একে তো নাম তিথি, তার উপর কী সুন্দর দেখতে! ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, যেমন ডিগনিফায়েড, সেইরকমই মার্জিত রুচির।

কাবেরী বলে, উনি বিবাহিতা?

—হ্যাঁ, দু'জনেই বিবাহিতা।

অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খেতে খেতে ওদের বিষয়ে যতটুকু পেরেছে, সৌম্য তা বৌদিদের বলে। তারপর মন্তব্য করে, আমি মনে মনে ঠিক করেছি মিসেস মুখার্জীকে বড়দি বলে ডাকব। ঐ মহিলাকে আর কিছু বলে ডাকা যায় না।

কাবেরী প্রশ্ন করে, আর ঐ তিথিকে কী বলে ডাকবে?

—ওকে দিদি বলেও ডাকা যায় না, আবার নাম ধরে ডাকাও যাবে না। আর ঐ মিসেস বোস-ঘোষ-চ্যাটার্জী-ব্যানার্জী বলতে আমার একদম ভাল লাগে না।

সৌম্য একটু থেমে একটু হেসে বলে, উনি বোধহয় আমার চাইতে এক-আধ বছরের ছোট বা সমবয়সী হবেন। ওর সঙ্গে 'আপনি' 'আপনি' বলে কথা বলতেও যেমন দ্বিধা হচ্ছে, সেই রকম 'তুমি' বলাও তো কখনই উচিত হবে না।

ছায়া বলল, সত্যি এক সমস্যা।

মিসেস চৈতালী মুখার্জী আসানসোল ডিভিশন্যাল অফিসের কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে দীর্ঘদিন কাজ করলেও ক্লেমস' এর ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবু মাস খানেকের মধ্যে মোটামুটিভাবে কাজের অনেকটাই বুঝে নিলেন। একটু অসুবিধে হলেই রেখাদি ওকে বুঝিয়ে দিতেন।

তিথি কোনদিন কোন অফিসে চাকরি করেননি বলেই যোগেনবাবু প্রথম দিনই ওকে বলেছিলেন, আপনি এখন দু'তিন মাস শুধু এর-ওর কাছ থেকে ফাইল নিয়ে পড়ুন। দেখুন, ওরা কে কি নোট লেখে। তারপর একটু নিয়ম-কানুনগুলো জেনে যাবার পর দেখবেন, আমাদের কাজ তেমন কিছু কঠিন না।

সুখেনবাবু বলেন, কঠিন হলে কি আমাদের মতো গাধাদের দিয়ে কাজ চলত?

—ও কথা কেন বলছেন দাদা? কিছু বুদ্ধি, কিছু নিষ্ঠা, কিছু পরিশ্রম ছাড়া পৃথিবীর কোনো কাজ হয়?

মায়া বলে, আপনার এই কথাগুলো যদি আমাদের বরেরা বুঝত, তাহলে তো বেঁচে যেতাম। ওদের ধারণা, নিতান্ত শোভাবর্ধন করার জন্যই আমরা অফিস আসি।

বলরামবাবু বলেন, তোমাদের বরেদের মতো বড়দার বউমাও মনে করে, নিতান্ত গায়ে হাওয়া দিয়েই আমাদের দিন কেটে যায়।

ত্রিদিববাবু বলেন, রেখাদি, হাজার হোক, এরা নতুন এলেন। এদের সামনে কি বলা ঠিক হবে। আমার পরিবারের ধারণা, শুধু তার স্বামীর জন্যই হাওড়া-শিয়ালদা গাড়ি চলে আর রেলের লোকজন মাইনে পায়?

—না, না, এসব প্রাইভেট কথা এখনই জানিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

মিসেস মুখার্জি আর মিসেস ব্যানার্জী ওদের কথা শুনে না হেসে পারেন না।

দিন পনেরো কেটে যাবার পর সৌম্য একদিন টিফিনের সময় মিসেস মুখার্জীকে বলে, আপনার আপত্তি না থাকলে আমি আপনাকে বড়দি বলে ডাকতাম।

উনি এক গাল হেসে বলেন, আমি ভাই-বোনদের মধ্যে সব চাইতে বড়। ওরা সবাই আমাকে সত্যি বড়দি বলে।

—তাহলে ভাইবোনদের রেজিস্টারে আমার নামটা লিখে নেবেন।

—সে রেজিষ্টারে তোমার নাম প্রথম দিনই লিখে রেখেছি।

ঐ টিফিনের আড্ডায় তিথি বলল, প্রথম দিন এই অফিসে ঢোকার সময় কী ভয় করছিল, তা আপনারা ভাবতে পারবেন না।

ও একটু থেমে বলে, প্রথম দিন, বিশেষ করে, বড়দার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল, বোধহয় এটা টিপিক্যাল সরকারি অফিসের মতো প্রাণহীন হবে না। এখন তো মনে হচ্ছে, এর চাইতে ভাল অফিস হতেই পারে না।

বন্দনা বলল, আমাদের এই অন্ধকার নোংরা ঘর, ভাঙা চেয়ার টেবিল দেখেও মনে করতে পারলে এর চাইতে ভাল অফিস হয় না?

—সহকর্মীরা যদি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, সহযোগিতা না করে বস্-এর কাছে সত্যি-মিথ্যে নালিশ করে, তাহলে কি এয়ারকণ্ডিশনড্ অফিসে সুন্দর চেয়ার-টেবিলে বসে কাজ করে শান্তি পাওয়া যায়?

ও একটু হেসে বলে, বন্দনাদি, আসল হচ্ছে মানুষ। ভাল মানুষ পেলে আর সব কিছু তুচ্ছ মনে হয়।

—ঠিক বলেছ।

এরই মধ্যে একদিন এইরকম টিফিনের সময় মিসেস মুখার্জী ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে ধরে বললেন, রেখাদি, আমার ছেলেমেয়ের ছবি দেখ।

খাম থেকে প্রথম ছবিটা বের করে এক ঝলক দেখেই উনি বললেন, বাঃ! ভারী সুন্দর দেখতে তো তোমার ছেলেমেয়েকে।

—সুন্দর হবে না কেন? ওদের পিতৃদেবকে তো এখনও বিয়ের পিড়িতে বসানো যায়।

রেখাদি হাসতে হাসতে বলেন, স্বামীর রূপ সম্পর্কে তো তোমার দারুণ গর্ব!

—তা ঠিকই ধরেছ।

সবাই ছবিগুলো দেখার পর মায়া জিজ্ঞেস করল, চৈতালীদি, তোমার কাছে জামাইবাবুর ছবি নেই?

—কাল ওর ছবি নিয়ে আসব।

এইভাবেই দিন এগিয়ে যায়। দেখতে দেখতে ক'টা মাসও কেটে যায়।

সেদিন অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই তিথির কানে এল রেল চলাচলের বিপর্যয় নিয়ে কথাবার্তা বলছেন বড়দা ও আরও দু'তিন জন। ঠিক বুঝতে পারল না কী ব্যাপার। তবে অনুমান করল, হাজার হোক রেলের অফিস। এখানে এ ধরনের আলোচনা হতেই পারে।

প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ সৌম্য অফিসে ঢুকতেই তিন চারজন এক সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, কাল কত রাত্তিরে বাড়ি পৌঁছলে? কাগজে দেখলাম, ঝড়ের জন্য বহু জায়গায় গাছপালা পড়ে ওভার হেড তার ছিঁড়ে যাওয়ায়.....

ওদের কথা শেষ হবার আগেই সৌম্য নিজের টেবিলের উপর কাঁধের ঝোলাটা রেখে একটু হেসে বলে, প্রায় আড়াইটে নাগাদে বাড়ি পৌঁছেছি।

যোগেনবাবু চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, আড়াইটে?

—হ্যাঁ, বড়দা।

সৌম্যর কথা শুনে তিথি স্তম্ভিত হয়ে যায়।

—আজ এলে কেন?

মায়া মুখ টিপে হেসে বলল, বড়দা, আপনি কিচ্ছু বোঝেন না। বউ না থাকলে কি বাড়িতে সারাদিন কাটানো যায়?

—এসব দায়িত্ব তো আমি তোমাদের উ'·'র ছেড়ে দিয়েছি।

এইসব কথাবার্তা বন্ধ হবার পর ত্রিদিববাবু নিজের টেবিল ছেড়ে উঠে এসে সৌম্যর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, কাল কোথায় আটকে পড়েছিলে?

ও একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, হাওড়া থেকেই তো ট্রেন ছাড়ল রাত সওয়া এগারটায়। তারপর শ্রীরামপুর পার হতে না হতেই আবার ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল।

ত্রিদিববাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, আজকে তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল। অফিসে আসা ঠিক হয়নি।

—দাদা, আজ অফিসের পর একটা জায়গায় যাবার কথা। তাই....

—সেখানে তো কালও যেতে পারতে?

—না, দাদা, আজই অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। অফিসে না এলেও ঐ অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাকে কলকাতায় আসতেই হত।

—ও!

অফিস ছুটির পর ডালহৌসি পাড়ায় যেন আণবিক বোমা বিস্ফোরণ হয়। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ পাগলের মতো দৌড়ে যায় বাস-ট্রাম ধরার জন্য। সারাদিন যারা এক সঙ্গে কাজ করেন, হাসি ঠাট্টা গল্প গুজবে আনন্দ পান, টিফিনের সময় একই সঙ্গে খাবার দাবার ভাগ করে খাওয়া-দাওয়া করেন, ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা ছুঁতে না ছুঁতেই তারাও যেন কেউ কেউ কাউকে চিনতে পারেন না। সবাই তখন মন চলে নিজ নিকেতনে। কয়লাঘাটা রেলের অফিসের যোগেনবাবুর সেকশনও এর ব্যতিক্রম নয়।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাড়ে ছ'টায়। সুতরাং সৌম্য মন্থর গতিতে অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে পা দিয়েই ছোলা ভাজা কেনে। দু' একটা দানা মুখে দিতে দিতে চারপাশের মানুষ দেখে। এক আধবার থমকে দাঁড়ায়। কানে আসে টুকরো টুকরো কিছু কথা, হাসির আওয়াজ। আবার দু'এক পা এগিয়ে যায়। হঠাৎ জি-পি-ও থেকে বেরিয়েই তিথি ওর সামনে এসে বলে, কী হল? কোথায় যেন যাবেন, ট্রাম-বাস ধরবেন না?

—যার সঙ্গে দেখা করতে যাব, তার অফিস এসপ্লানেডের কাছেই।

—তাড়াতাড়ি দেখা করে বাড়ি ফিরে যান।

—সাড়ে ছ'টার আগে যেতে বারণ করেছেন। তাই.....

—ও!

—আপনি বাসে না ট্রামে......

তিথি একটু হেসে বলে, অফিস পাড়ার ভিড়ে যাতায়াত রপ্ত করতে পারিনি। তাই একটু ভিড় না কমা পর্যন্ত.......

ঐ কথাটা শেষ না করেই ও বলে, চলুন, কোথাও বসে চা খাওয়া যাক।

—চলুন।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সৌম্য হাতের ঠোঙা ওর সামনে ধরে বলে, ছোলা ভাজা খান।

দু'এক দানা মুখে দিয়েই তিথি বলে, আপনি তারকেশ্বরে থাকেন?

—ঠিক তাককেশ্বরে না, তার একটু আগে হরিপালে।

—ঐ একই কথা।

ও একটু থেমে প্রশ্ন করে, অত দূর থেকে যাতায়াত করেন কী করে? কলকাতায় চাকরি করবেন আর থাকবেন বনগাঁ-বর্ধমান-তারকেশ্বর?

সৌম্য একটু হেসে বলে, আসতে তো মাত্র ঘণ্টা দেড়েক লাগে।

ও প্রায় না থেমেই বলে, এই শহরেরই নানা জায়গা থেকে এসপ্লানেড-ডালহৌসী পাড়ায় আসতে তো তার চাইতেও বেশি সময় লাগে।

রেঁস্তোরায় ঢুকে দুটো মুখোমুখি চেয়ারে বসেই তিথি বলে, তা হয়তো লাগে কিন্তু কলকাতায় থাকার তো হাজার সুবিধা।

—আমার তো মনে হয়, কলকাতায় থাকার চাইতে হরিপালের মতো জায়গায় থাকা অনেক ভাল।

ওয়েটার সামনে এসে দাঁড়াতেই তিথি জিজ্ঞেস করে, বলুন, কী খাবেন?

—শুধু চা।

—না, না, শুধু চা না। তিথি একটু হেসে বলে, প্রথম দিন আপনাকে ডেকে এনে শুধু চা খাওয়াতে পারি না।

—তাহলে আপনার যা ইচ্ছা বলে দিন।

তিথি দুটো ফিস ফ্রাইয়ের অর্ডার দিয়েই বলে, কলকাতার চাইতে হরিপালে থাকা ভাল কেন?

—সব দিকে দিয়েই ভাল।

সৌম্য একটু থেমে বলে, কলকাতার মানুষদের মতো আমরা পায়রার খুপরিতে থাকি না। দীন দরিদ্রের বাড়িতেও একটু উঠোন আছে, দু'চারটে ফুল-ফলের গাছ আছে। দিন-রাত্তির আমাদের প্যা-পো ভো-ভো আওয়াজ শুনতে হয় না। নাকে যায় না গাড়ি-ঘোড়া কল-কারখানার কালো ধোঁওয়া.....

—কিন্তু......

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, আগে আমাকে বলতে দিন।

তিথি চুপ করে ওর দিকে তাকায়।

—মিছিল-মিটিং-মাইক্রোফোনের অত্যাচারে আমরা নিত্য জর্জরিত হই না। আমরা খেতে পাই টাটকা শাক-সবজী-মাছ......

—এটা স্বীকার করি কিন্তু......

—হোল্ড ইওর টাঙ, লেট মী ফিনীশ্।...

তিথি একটু হেসে বলে, ফিশ ফ্রাই ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগেই শেষ করুন।

—আমাদের কত বন্ধুবান্ধব, দাদা-বৌদি মাসিমা-পিসিমা আছেন, তা আপনারা ভাবতে পারবেন না।

সৌম্য মুহূর্তের জন্য থেমে গম্ভীর হয়ে বলে, আমি জানি, কলকাতার উপকণ্ঠে বা আমাদের হরিপালের মতো গ্রাম-গঞ্জের সব মানুষই দেবতা না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলব, আমরা কলকাতার মানুষদের মতো আত্মকেন্দ্রিকও না, স্বার্থপরও না।

দু'জনেই চুপচাপ ফ্রাই খেতে শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ পর তিথি জিজ্ঞেস করে, শনিবার-রবিবার কীভাবে কাটান?

—তিন ভাইপো-ভাইঝির সঙ্গে গল্প করি, বড়বৌদির কাজের সময় ঝামেলা করি, ছোটবৌদির সঙ্গে ঝগড়া করি। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিই......

—তাহলে ছুটির দিনগুলো ভালই কাটান!

—একশ'বার।

ও না থেমেই বলে, অন্য দিনগুলোতে বন্ধুবান্ধব-পরিচিতদের সঙ্গে ট্রেনে আসা-যাওয়া আর বড়দার আশ্রমে দশটা-পাঁচটা করেও বেশ আনন্দ পাই।

ফ্রাই খাওয়া শেষ হয়। চা খেতে খেতে তিথি জিজ্ঞেস করে, হরিপালের বাড়িতে আপনারা কে কে থাকেন?

—বাবা-মা, দুই দাদা, দুই বৌদি, দুই ভাইঝি, এক ভাইপো আর এক সৌম্য।

—বাবা নিশ্চয়ই এখন আর চাকরি-বাকরি করেন না?

—না, দীর্ঘদিন ডাক বিভাগের সেবা করে বছর পনেরো আগেই রিটায়ার করেছেন।

—দাদারা?

—দুই দাদাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

—দুই বৌদির সঙ্গে বুঝি আপনার খুব ভাব?

—দু'জনের সঙ্গেই আমার হেভি দোস্তী কিন্তু বড়বৌদি অনেক বড় বলে ছোটবৌদির সঙ্গেই বেশি বাঁদরামি করি।

ও প্রায় না থেমেই বলে, তবে আমি না থাকলে ওদের দু'জনের মুখ থেকেই হাসি উড়ে যায়।

—আর ভাইপো-ভাইঝিরা?

—ওরাই আমার সবকিছু।

তিথি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, সবকিছু মানে?

—ওরা তিনজনে আমার তিনটে ল্যাবরেটরী।

ও চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলে, আমার দুই দাদা স্কুল মাস্টার, আমি কেরানী। দেখি, ওরা একটু এগিয়ে যেতে পারে কিনা।

—ওদের পড়াশুনার ব্যাপারটা আপনিই দেখেন?

—ওদের টেক্সট্ বুক-সিলেবাসের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা দাদা-বৌদিদের দায়িত্ব। টেক্সট্ বুক-সিলেবাসের বাইরে যে বিশাল জগত আছে, আমি তারই সঙ্গে ওদের একটু-আধটু পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করি।

—মা'র কাছে শুনেছি, আমার বাবা ঠিক এই ধরনের কথা বলতেন।

সৌম্য অবাক হয়ে বলে, আপনার বাবা নেই?

তিথি একটু শুকনো হাসি হেসে বলে, আমার পাঁচ বছর বয়সে বাবা মারা যান।

—কী হয়েছিল?

—বাবা আর্মিতে ছিলেন। মারা যাবার সময় কাশ্মীরে পোস্টেড ছিলেন। হেলিকপ্টারে একটা অ্যাডভান্স পোস্টে যাবার সময় হঠাৎ ব্যাড ওয়েদারে......

ও যেন কথাটা শেষ করতে পারে না।

সৌম্যই উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে, হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করেছিল?

ও মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর সৌম্য বলে, আপনার মা বেঁচে আছেন তো?

—গত বছরই মা মারা গেলেন।

—আপনার আর কোনো ভাই-বোন নেই?

—দাদা আছেন।

—তিনি কী করেন।

—দাদা .আর্মিতেই আছেন।

—এখন কোথায় পোস্টেড?

—বছর দেড়েক নাগাল্যাণ্ডে থাকার পর মাস তিনেক আগেই কাশ্মীরে গিয়েছে।

—মাঝেমধ্যে দেখাশুনা হয়?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

এবার তিনি জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আপন.ব ভাইপো-ভাইঝিরা কত বড়?

—দাদার দুই মেয়ের পর ছোড়দার ছেলে।

—ওরা কী পড়ে?

—বড় ভাইঝি ইংলিশ অনার্স নিয়ে স্কটিশে পড়ছে, ছোট ভাইঝি আমাদের ওখানকার জি.ডি. স্কুলে ক্লাশ নাইন'এ আর ভাইপোও ঐ স্কুলে ক্লাশ সিক্সে পড়ে।

—ওদের কী নাম?

এবার সৌম্য এক গাল হাসি হেসে ব.ে., তিথি, মৃত্তিকা আর......

তিথিও এক গাল হাসি হেসে বলে. আপনার বড় ভাইঝির নাম তিথি?

—হ্যাঁ।

—কে ওর নাম রেখেছে।

—এই অধম।

—হঠাৎ এই নাম রাখলেন কেন?

—আমার মন চেয়েছে, আমার ভাল লাগে বলে।

দু'জনেই মুখে হাসি নিয়ে রেঁস্তোরা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

বড় বড় অফিসারদের ঘরের মতো এ ঘরে জৌলুস চাকচিক্য না থাকলেও কাজ যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ। মোটা ফাইলের আদ্যোপান্ত পড়ে, অনেক নথিপত্র যাচাই করে, হাজার রকম নিয়ম-কানুন মেনে এই চির উপেক্ষিত কেরানিদের এক একটি শব্দ লিখতে হয়। পানের থেকে চুন খসলেই সর্বনাশ। সামান্য ছিদ্র পথ ধরেই কে বা কোনো ব্যবসাদার রেলের বিরুদ্ধে মামলা লড়তে লড়তে একেবারে হাইকোর্ট-সুপ্রীম-কোর্ট পৌঁছে যাবে।

এ বিষয়ে সবাই সচেতন। তার উপর যোগেনবাবু অত্যন্ত সতর্ক। তবু কি রেলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা হয় না? হয়। ক্ষতিপূরণের অঙ্ক হের-ফের হলেও রেল হেরে যায় কম মামলাতেই। তবে মুঘলসরাই-এর ওমপ্রকাশ কেজরিওয়ালের মতো কিছু কিছু পার্টি আছে, যারা যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারেই হাইকোর্টে পৌঁছে যায়। অফিসাররা এই সব ঝামেলা এড়াবার জন্যই ওদের যতটা সম্ভব ক্ষতিপূরণ দিয়ে মামলা-মোকদ্দমা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

বছরের পর বছর এইসব ব্যবসাদারদের ক্ষতিপূরণ দাবির ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে এই প্রায়ান্ধকার ঘরে কোনো এক কেরানির দৌলতে কেঁচো খুঁড়তে সাপও বেরিয়ে পড়ে। সালেম স্টিল প্ল্যান্ট থেকে আনানো ওমপ্রকাশের স্টেনলেস স্টিল মালগাড়ির সিল ভেঙে মুঘলসরাই ইয়ার্ড থেকে চুরি হয় কিন্তু পৌঁছে যায় ওর ভাই বদ্রীপ্রসাদ কেজরিওয়ালের কাশীর কারখানায়। হ্যাঁ, এর জন্য ওমপ্রকাশকে খুশি করতে হয় রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স (আর-পি-এফ) আর রেল পুলিশকে। তা হোক। বাহাত্তর লাখ টাকার মালের বারো আনা ষ্টিল সরিয়ে নেবার

বিনিময়ে লাখ দশেক পার্বনী দেওয়া তেমন কোনো ব্যাপার নয়। তারপর তো আছে রেলের কাছ থেকে ঐ বারো আনা মালের ক্ষতিপূরণ! কয়লাঘাটার অফিসে ঠিক মতো ফাইলপত্র পাঠাবার জন্য হয়তো ওমপ্রকাশ মুঘলসরাই ডিভিশন্যাল অফিসের কিছু কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খুশি রাখতে নিশ্চয়ই ত্রুটি করেন না। তবে দুনিয়ার সবাই তো কেজরিওয়ালদের বন্ধু নয়, সব কর্মচারীও হনুমান ভক্ত নয়। দুটো-চারটে উড়ো চিঠি সম্বল করে দু'চারবার ফাইলপত্র নিয়ে মুঘলসরাই যাবার পর এই ঘরের এক কেরানির সতর্কতায় ও সততায় অনেক কোর্ট-কাছারি ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত কেজরিওয়াল ভ্রাতৃদ্বয়কে সর্বস্ব খুইয়ে কাশীর জেলে যেতে হয়।

এই ধরনের কেস ছাড়া কদাচিৎ কখনও লোকসভা-রাজ্যসভায় কোনো প্রশ্ন এলে ঝড় উঠে যায়। যোগেনবাবু কালবিলম্ব দেরি না করে কয়েকজন সহকর্মীকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আসানসোল-ধানবাদ-দানাপুর-মুঘলসরাই-মালদা'তে পাঠিয়ে দেন।

এইসব উত্তেজনার সময় ছাড়া কাজকর্মের মধ্যেও দিনগুলো বেশ কেটে যায়। কখনও কখনও তো সুখ-দুঃখের বন্যায় ভেসে যায় এই ঘরের মানুষগুলো।

সেদিন রেখাদিকে অত সেজেগুজে বিরাট এক হাঁড়ি কে. সি. দাশের রসগোল্লা হাতে নিয়ে ঢুকেই যোগেনবাবু আর মন্মথবাবুকে প্রণাম করতেই সবাই অবাক। সবাই হৈ হৈ করে উঠলেন। সবার মুখেই এক প্রশ্ন—কী ব্যাপার? হঠাৎ এত আনন্দ, এত খুশির কারণ কী?

রেখাদি আনন্দে আবেগে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, আজ আমার সত্যি আনন্দের দিন। আজ আমাদের শুধু বিয়ের দিন না ; আজ বিবাহিত জীবনের পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। আর আজ ভোরেই ছেলের টেলিগ্রাম পেয়ে জানলাম, সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, টেলিগ্রামটা হাতে পেয়েই আমরা স্বামী-স্ত্রী আনন্দে খুশিতে কেঁদে ফেলেছি। ছেলেটা যে ঠিক আজকের দিনেই এমন একটা উপহার দেবে, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

সবাই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, সত্যিই আনন্দের দিন। বিবাহিত জীবনে এর চাইতে বড় পুরস্কার হয় না।

মিষ্টি মুখের পর্ব শেষ হতেই সৌম্য টিপ করে রেখাদিকে প্রণাম করে বলে, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে বলে এই গেঁয়ো ভাইটাকে ভুলে যেও না।

উনি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে কপালে স্নেহচুম্বন দিয়ে বললেন, এমন সোনার টুকরো ভাইকে কোনো দিদিই ভুলতে পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দনা-মায়া-তিথিও ওকে প্রণাম করে।

তিথি বলল, বড়দা, আমার একটা নিবেদন আছে।

—হ্যাঁ, বলো।

—আমরা সবাই মিলে যদি রেখাদি আর জামাইবাবুকে সম্বর্ধনা জানাই, তাহলে কেমন হয়?

রেখাদি গলা চড়িয়ে বলেন, এই তিথি, তুমি কি পাগল হয়েছ?

উনি আপত্তি করলে কী হয়, সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলেন, নিশ্চয়ই সম্বর্ধনা জানানো উচিত।

যোগেনবাবু বললেন, চৈতালিদি, তুমি, বন্দনা, তিথি, মায়া আর সৌম্য আলাপ-আলোচনা করে যা ঠিক করবে, তাই হবে। শুধু বলে দেবে, আমাদের কী করতে হবে।

অফিস ছুটির পর একটু আলাপ-আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত সবাই তিথির অনুরোধ মেনে নিলেন। মিসেস চৈতালি মুখার্জী বললেন, তোমার যখন অতই ইচ্ছা, তখন শনিবার দুপুরে আমরাই তোমাদের মুর এভিন্যুর বাড়িতে হাজির হব।

বন্দনা বলল, তিথি, খুব বেশি রান্নাবান্না করো না।

তিথি হেসে বলে, এই ব্যাপারটা ষোলো আনা বাবার দায়িত্ব। তিনি যা বলবেন, ঠিক তাই রান্না হবে।

মায়া বলল, তুমি তোমার শ্বশুর মশাইকে বলে দিও.....খাওয়া দাওয়া নিয়ে তোমাদের অত ভাবতে হবে না।

এবার তিথি ওদের বাড়ি যাবার পথ নির্দেশ করার পর বলে, সব চাইতে ভাল হয়, তোমরা সবাই যদি এক সঙ্গে মেট্রোয় চড়ে একেবারে টালিগঞ্জে আসো। সময়টা যদি বলতে পার, তাহলে আমি মেট্রো স্টেশনে থাকব।

মায়া আর বন্দনা এক সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল।

শনিবার বারোটা নাগাদ ওরা টালিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছতেই তিথি এক গাল হেসে বলল, কোনো কষ্ট হয়নি তো?

চৈতালিদি বললেন, কষ্ট আবার কীসের?

সৌম্য বলল, নেমন্তন্ন পেলে আমি দু'একটা নদী সাঁতরে দশ বিশ মাইল মাঠঘাট হেঁটে পার হতেও রাজি।

তিথি ঘাড় ঘুরিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, কোন গল্পের নায়কের কথা বলছেন?

মায়া জিজ্ঞেস করল, কীসে যেতে হবে? বাসে নাকি অটোতে?

—না, বাবা গাড়ি পাঠিয়েছেন।

ওরা সবাই ভাবেন, তিথি কেরানি বলে কি ওর শ্বশুরের গাড়ি থাকতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে কিন্তু ভাবতে পারেনি স্বয়ং তিথিই সে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে।

স্টিয়ারিং-এ বসে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে গিয়ার চেঞ্জ করতেই চৈতালিদি একটু হেসে, একটু অবাক হয়ে বলেন, বাপ্‌স! তুমি তো দারুণ গাড়ি চালাও। শ্বশুর মশাই নাকি তোমার স্বামী গাড়ি চালানো শিখিয়েছেন?

স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালাতে চালাতেই তিথি বলে, আমার বাবা আমার মাকে ড্রাইভিং শেখান। তারপর মা আমাকে আর দাদাকে...।

মায়া বলে, তার মানে তুমি বিয়ের আগেই গাড়ি চালাতে পারতে?

—গাড়ি চালানো শিখি বারো-চোদ্দ বছর বয়সে কিন্তু আঠারো হবার পরই ড্রাইভিং লাইসেন্স পাই।

সৌমা পিছনের সীটের কোনায় বসে প্রশ্ন করে, আপনি আর কী কী জানেন?

—আপনার মত মিষ্টি প্রেমের গল্প লিখতে পারি না কিন্তু পিস্তল-রাইফেল চালাতে পারি।

—কোনদিন রাগিয়ে আমাদের উপরই শুটিং প্র্যাকটিশ করবেন না তো?

ওর প্রশ্ন শুনেই সবাই হেসে উঠতেই তিথি স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকেই বলে, এই হল মুর এভিন্যু।

সৌমা বলে, কলকাতার মধ্যে যে এই রকম গাছপালাওয়ালা জায়গা আছে, তা তো জানতাম না।

—হরিপাল ছাড়া অন্য কোথাও কি গাছপালা থাকতে পারে না?

এই কথা বলতে না বলতেই গাড়ি একটা বেশ বড় গেটের মধ্য দিয়ে একটা পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে এসে থামে।

গাড়ি থামতেই এক সুদর্শন সুপুরুষ বৃদ্ধ সামনের বারান্দা থেকে নেমে এসে বললেন, আসুন, আসুন। আমার মা জননীর অনুরোধে আপনারা এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি।

তিথি পরিচয় করিয়ে দেয়, বাবা, এই হচ্ছে চৈতালিদি—আর ছেলেমেয়ে ......

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বৃদ্ধ একটু হেসে বলেন, ছেলেমেয়ে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে তো! জানি, জানি।

চৈতালিদি ওকে প্রণাম করতেই উনি ওর মাথায় হাত দিয়ে বলেন, সুখে শান্তিতে থাকো মা!

উনি এক নিঃশ্বাসেই বলেন, কে মায়া, কে বন্দনা?

মায়া ওকে প্রণাম করতে করতেই বলে, মেসোমশাই, আমি মায়া!

সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা প্রণাম করে একটু হেসে বলে, মেসোমশাই আমি কি আমার নাম বলব?

বৃদ্ধ ওদের দু'জনকে আশীর্বাদ করে বললেন, মা জননীর কাছে তোমাদের সবার এত প্রশংসা শুনেছি যে.....

ওরা দু'জনেই এক সঙ্গে বলে, প্রশংসা করার মতো আমরা তো কিছু করিনি।

—নিশ্চয়ই করেছ মা। আমার মা জননীকে তোমরা সবাই যে কত ভালবাস, তা কি আমি জানি না?

এবার উনি বলেন, এসো সৌম্য, তোমাকে একটু বুকে জড়িয়ে ধরি।

সৌম্য প্রণাম করতেই উনি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, তোমার তিনটে গল্প আমিও পড়েছি। তোমার লেখায় দরদ আছে, আবেগ আছে বলে খুব ভাল লেগেছে।

—না, না, মেসোমশাই, অত প্রশংসা করার মতো.....

তিথি বলে, বাবা, এখানেই কি ওদের সঙ্গে গল্প করবেন নাকি......

—না, মা জননী, চল চল ভিতরে যাই।

বারান্দা পেরিয়ে বিশাল লিভিং রুমে পা দিয়ে চারপাশে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতেই সবাই অবাক। চৈতালিদি বলেন, মেসোমশাই, আপনার পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই জমিদার ছিলেন।

বৃদ্ধ দিবাকর ব্যানর্জী হো হো করে হেসে ওঠেন। তারপর বলেন, আমার বাবা ছিলেন অধ্যাপক, ঠাকুরদা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক, তার বাবা.....

সৌম্য বলে, কিন্তু মেসোমশাই, এই বাড়ি দেখে তো মনে হয়....

তিথি বলে, আগে সবাই বসুন তারপর...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা সবাই বসো। তারপর এই বাড়ির কাহিনী বলছি।

ওরা সবাই বসতে না বসতেই মোষের মতো কালো চেহারার একজন বয়স্ক লোক ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিথি একটু হেসে বলে, এই হচ্ছে জংলিকাকা! আমার আর বাবার বস্।

সৌম্য ভুরু কুঁচকে বলে, কোনো মানুষের নাম তো জংলি হতে পারে না।

তিথি ট্রে থেকে শরবতের গেলাস ওদের সবার হাতে তুলে দিতেই ঐ জংলি এক গাল হাসি হেসে বলেন, সাহেব আদর করে আমার এই নাম রেখেছেন।

মিঃ ব্যানার্জী গম্ভীর হয়ে বলেন, হতচ্ছাড়া চোর কোথাকার! তোকে আবার আদর করব?

জংলি ও কথা শোনার পরও নির্বিবাদে হাসতে হাসতে বলেন, চোর ছিলাম, সে কথাও ঠিক, আপনি ভালবাসেন, সে কথাও ঠিক। তা না হলে আটত্রিশ বছর ধরে এমন রাজার হালে রেখেছেন?

—তুই শরবত দিয়ে বিদেয় হ! তোর মুখ দেখলেও গা জ্বলে যায়।

—এখানে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে বক বক করার আমার সময় নেই। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

ও ট্রে নিয়ে চলে যেতেই তিথি একটু হেসে বলে, এই হচ্ছে জংলিকাকা! এ বাড়িতে ওর হুকুম ছাড়া কোনো কাজ হয় না।

চৈতালিদি মিঃ ব্যানার্জীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, ওকে পেলেন কী করে?

—ব্যাটা বড্ড চুরি করত। আঠারো বছরে মধ্যেই শ্রীমান বার তিনেক জেল ঘুরে এসেছে। তারপর আবার চুরি করে ধরা পড়তেই থানার অফিসাররা ওকে আমার কাছে নিয়ে এল। ওকে বললাম, দারোগাদের হাতে এত মার খাচ্ছিস, জেল খাটছিস, তবু চুরি করেছিস?

বৃদ্ধ একটু হেসে বলেন, হতভাগা নির্বিবাদে আমাকে বলল, আপনি খেতে-পরতে দিন, তাহলেই আর চুরি করব না। ব্যস্! সেই দিন থেকেই হতভাগা আমার কাছে আছে।

সৌম্য জিজ্ঞেস করে, আপনিও কি পুলিশে ছিলেন?

—হ্যাঁ, বাবা।

তিথি বলে, বাবা অ্যাডিশন্যাল আই.জি হিসেবে তিন বছর কাজ করার পর রিটায়ার করেন।

ও একটু থেমে বলে, জংলিকাকা আমাদের সবকিছু। ও চেক বই সামনে ধরলেই বাবা সই করে দেন। সংসারের খরচাপত্র, লোকজনের মাইনে, আমাদের যার যা প্রয়োজন, সবকিছুই উনি দেখেন।

ও আবার একটু থেমে একটু হেসে বলে, আমিও মাইনে পেয়ে পুরো টাকাটাই ওর হাতে তুলে দিই। আমার দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য কিছু টাকা হাতে রেখে সব টাকা উনি ব্যাঙ্কে জমা করে দেন।

মায়া বলে, এরকম মানুষ যে হয়, তা আমরা ভাবতেই পারি না।

মিঃ ব্যানার্জী বলেন, দেখ মা, ভাল হবার সুযোগ দিলে অধিকাংশ খারাপ মানুষই ভাল হয়ে যায় কিন্তু আমরা ক'জন মানুষকে ভাল হবার সুযোগ দিই!

সৌম্য বলে, ঠিক বলেছেন।

তিথি চৈতালির দিকে তাকিয়ে বলে, চলুন। আমার ঘরে গিয়ে বসা যাক।

---হ্যাঁ, মা জননী, তোমরা যাও।

সবাই উঠে দাঁড়াতেই উনি আবার বলেন, মা জননী। আমার প্রস্তাবের কথাটাও ওদের বলো।

—হ্যাঁ, বাবা, বলব।

লিভিং রুমের পরই ডাইনিং রুম। তারই ডান দিক দিয়ে কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা বারান্দা। পাশাপাশি দু'টি বড় বড় শোবার ঘর। দুটি ঘরের সঙ্গে দুটি বাথরুম।

বন্দনা জিজ্ঞেস করল, ও ঘরে কি তোমার শ্বশুরমশাই থাকেন?

—শাশুড়ি বেঁচে থাকতে এটাই ছিল ওদের ঘর। শাশুড়ি মারা যাবার পর থেকে বাবা নিচের ঘরেই থাকেন। এখন ঐ ঘরে জংলিকাকা থাকেন।

সৌম্য বলল, জংলিকাকা রিটায়ার করার পর আমি কি ঐ চাকরিটা পেতে পারি?

—দরখাস্ত করবেন। এখনই কোনো কথা দিতে পারি না।

ওর কথায় সবই হেসে ওঠে।

তিথির ঘরখানি নিচের লিভিংরুম-ডাইনিংরুমের মতো ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচারে সজ্জিত নয়। একটা আধুনিক ডবল বেডের খাট, পড়াশুনা করার একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার এক কোনায়, তার পাশেই বেশ বড় একটা বুক শেলফ্। একটু দূরে একটা পিয়ানো। অন্যদিকে একটা গোল সেন্টার টেবিল আর তার চারপাশে অ্যালুমিনিয়ামের পাঁচটা ফোল্ডিং চেয়ার। খাটের দু'পাশে দুটো বেড সাইড টেবিলের একটিতে টেলিফোন।

পড়ার টেবিলে আর্মির পোশাকে বাবার ছবি। বুক শেলফ্ এর উপরে মা, দাদা, শাশুড়ির ছবি দেখবার পর এক সুদর্শন যুবকের ছবি দেখিয়ে তিথি বলল, আর ইনি হচ্ছেন আমার স্বামী।

চৈতালিদি জিজ্ঞেস করলেন, উনি কী অফিসে?

—ও আমেরিকায় গিয়েছিল পড়াশুনা করতে। পড়াশুনা শেষ করে এখন ওখানেই চাকরি করছে।

মায়া বলে, উনি কি প্রত্যেক বছরই কলকাতা আসেন?

তিথি একটু হেসে বলে, এই সাত বছরের মধ্যে একবারই আসবেন বলে প্লেনের টিকিট কেটেছিলেন কিন্তু ইরাকের যুদ্ধের জন্য তাও হয়ে ওঠেনি।

বন্দনা জিজ্ঞেস করে, এরমধ্যে তুমি নিশ্চয়ই ওখানে ঘুরে এসেছ?

—না, আমি যাইনি।

ও হাসি মুখে কথাগুলো বললেও মেয়েরা অবাক হয়ে যায়। চৈতালিদি বলেন,

সাত বছর তোমাব বর বিদেশে আর তুমি এখানে পড়ে আছ?

—তাতে কী হল?

—তাহলে বিয়ে করলে কেন?

তবুও তিথি হাসতে হাসতে বলে, আমার বর তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আজ না হোক কাল সে তো ফিরে আসবেই।

যাইহোক এবার রেখাদি-জামাইবাবুকে অভিনন্দন জানানোর ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার পর সবকিছু ঠিক হবার পর চৈতালিদি সৌম্যকে বললেন, দু'তিন দিনের মধ্যেই অভিনন্দন পত্র লিখে বন্দনাকে দিয়ে দেবে। ওর বব ওদের অফিসের আর্টিস্টকে দিয়ে সুন্দর করে লেখাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

এরপর খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই তিথি বলল, বাবার খুব ইচ্ছা অনুষ্ঠানটা আমাদের বাড়ির বাগানেই হোক আর উনিই সেদিন আমাদের সবাইকে লাঞ্চ খাওয়াবেন।

সৌম চুপ করে থাকলেও অন্য তিনজনই বলে, না, না। উনি কেন আমাদের সবাইকে খাওয়াবার ঝামেলা...

—ঝামেলা মনে করলে কি বাবা নিজেই এই প্রস্তাব দিতেন?

—তা ঠিক কিন্তু....

ঠিক সেই সময় মিঃ ব্যানার্জী ঘরের দরজায় হাজির হয়ে বলেন, কী হল মা জননী? অন্য মা জননীরা আমার অনুরোধ মেনে নিয়েছে?

তিথি কিছু বলার আগেই চৈতালিদি বলেন, মেসোমশাই, আপনি কেন আমাদের জন্য ঝামেলা......

—মা, আমি যদি তোমাদের দু'মুঠো খাইয়ে আনন্দ পাই, সেটা কি তোমরা মেনে নিতে পার না?

উনি না থেমেই বলেন, মানুষজন আমরা সবাই ভালবাসি। এ বাড়িতে তোমাদের পাঁচজনের পায়ের ধুলো পড়লে আমরা খুশি হব, আনন্দ পাব। আজকেই তোমাদের কথা দিতে হবে না। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে দু'দিন পরই আমাকে তোমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিও।

দুপুরে খাওযা-দাওয়ার সময়ই মিঃ বানার্জীর রুচির পরিচয় আবার পাওয়া গেল। স্যালাড দিয়ে ফিস ফ্রাই খাবার পব ডাল ভাতের সঙ্গে একটি করে ইলিশ মাছ ভাজা আর তারপর মুরগির মাংস ; আলুবখরার চাটনির পর কাস্টার্ড পুডিং।

তিথির দিকে তাকিয়ে চৈতালিদি জিজ্ঞেস করেন, কে রান্না করেছে?

—রান্না সাবিত্রীদি করেন,তবে ফিস ফ্রাই আর পুডিং জংলিকাকাই করেছেন।

সৌম্য ওকে বলল, যে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করব বলেছিলাম, তা আর করব না।

তিথি একটু হেসে বলে, কেন?

—আর যে কাজই পারি না কেন, ফিস ফ্রাই-পুডিং আমার দ্বারা হবে না।

পুত্রবধূর কাছে পুরো ব্যাপারটা শোনার পর মিঃ ব্যানার্জী হাসতে হাসতে বললেন, তোমার মতো গুণী ছেলেকে জংলির জায়গায় বসালে যমরাজ আমাকে আর আমার মা জননীকে কী শাস্তি দেবেন, তা কি ভেবে দেখেছ?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তুমি বরং দু'চারদিন আমাদের এখানে থেকে জংলীকে ভালভাবে স্টাডি করে একটা গল্প লেখো। সেটা সবার পক্ষেই আনন্দের হবে।

পরেব দিন চৈতালিদির কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর মেজোবাবু বললেন, আমরা এমন কিছু কেউকেটা বা পাষণ্ড হইনি যে ব্যানার্জী সাহেবের এমন অনুরোধ উপেক্ষা করব।

সবাই বললেন, হ্যাঁ, বড়দা, তুমি ঠিকই বলেছ।

পরের রবিবার প্রসাদ জামাইবাবুর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটি সত্যি সর্বাঙ্গসুন্দর হল। খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল দোতলায় ঐ বিশাল বারান্দায়। এক পাশে দু'টি সুন্দর আসন পাতা। আর সবার জন্য সাধারণ-আসন। সামনে কলাপাতা, মাটির গেলাস। রেখাদি আর জামাইবাবু ঐ দুটি বিশেষ আসনে বসতেই সাবিত্রীদি ওদের সামনে দুটি কাঁসার থালায় ভাত, ঘিয়ের বাটি, দু'রকমের ভাজা দিয়ে রাখার পরই দশ-বারোটি ছোট ছোট বাটি সাজিয়ে দিলেন থালার পাশে।

রেখাদি গলা চড়িয়ে বলেন, এই তিথি, এ কী করেছ?

—এ ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা নেই। পুরো ব্যাপারটার স্রষ্টা তোমার বাবা, পরিচালক জংলিকাকা।

এবার রেখাদি মিঃ ব্যানার্জীর দিকে তাকিয়ে বলেন, মেসোমশাই, করেছেন কী?

উনি স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্ন হাসি হেসে বলেন, বড় মেয়ে-জামাই প্রথম আমার বাড়িতে এল। এটুকু না করলে কি এই বুড়ো খুশি হতে পারে?

খাওয়া-দাওয়া না, হল ভুরি ভোজ। তারপরও এল রাবড়ি। শুধু তাই না। যে আন্তরিকতার সঙ্গে মিঃ ব্যানার্জী সবার খাওয়া-দাওয়ার তদারকি করলেন, তাতে সবাই মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না।

বিদায় নেবার প্রাক্কালে মিঃ ব্যানার্জী রেখাদি-জামাইবাবুর হাতে দুটো প্যাকেট দিয়ে বললেন, এই বুড়োর পছন্দ তোমাদের ভাল লাগবে কিনা জানি না। যাই হোক তোমরা ব্যবহার করো।

—মেসোমশাই, এসব করার কী দরকার ছিল?

—নাতির এই কৃতিত্ব, তারপর মেয়ে-জামাইয়ের এই আনন্দের দিনে আমার কি কিছু দিতে ইচ্ছা হবে না?

আনন্দে খুশিতে আবেগে ডালহৌসি পাড়ায় কেরানি দম্পতির চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

ওরা দু'জনেই ওকে প্রণাম করেন। রেখাদি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, মেসোমশাই, আমার বাবা-মা শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যে কেউই বেঁচে নেই। আমি যদি আপনাকে বাবা বলি, তাহলে কি রাগ করবেন?

—না, রাগ করব না। কিন্তু নিশ্চয়ই একটু অহংকারী হব আর মাঝে মধ্যে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে উপদ্রব করব।

স্বল্পভাষী জামাইবাবু বললেন, দয়া করে উপদ্রব করবেন।

হঠাৎ মিঃ ব্যানার্জী গর্জে উঠলেন, এই হতচ্ছাড়া জংলি, আমার মেয়ে-জামাইকে কী দয়া করে পৌঁছে দিবি?

—সেই জন্যই তো দাঁড়িয়ে আছি।

—রাস্তা গণ্ডগোল করবি না তো? এই দুপুরে রোদ্দুরে অযথা ওদের ঘুরালে তোকে খুন করে ফেলব।

—আপনি সারাজীবন পুলিশে চাকরি করে একটা পয়সা ঘুষ খেতে পারেন নি, একটা গালাগাল দিতে পারেন নি। আপনি আবার খুন করবেন! আপনার কেরামতি জানতে জংলির বাকি নেই।

সগর্বে জংলি কথাগুলো বলতেই সবাই অবাকও হন, আবার না হেসেও পারেন না।

জংলি বলে, বৌমা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে নাকি?

—যাব জংলিকাকা।

পথে যেতে যেতে রেখাদি বলে, তিথি, তোমার শ্বশুরের মতো স্নেহপরায়ণ মানুষ আমি অন্তত জীবনে দেখিনি।

জামাইবাবু বলেন, তাছাড়া কী উদার।

তিথি বলে, এইরকম শ্বশুর পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে।

রেখাদি বলে, জংলি কাকারও কোনো তুলনা হয় না।

—তা কি আর আমি জানি না?

বাড়ি ফেরার পথে প্রায় ফাঁকা তারকেশ্বর লোকালের কামরায় ব:স সৌম্য কত কী ভাবে। যতই অর্থ-যশ-প্রতিপত্তি থাকুক, প্রিয় ও ঘনিষ্ঠজনের সান্নিধ্য হারিয়ে মানুষের মন শূন্যতার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরবেই। সেই শূন্যতা পূরণের জন্য কেউ ঠাকুর-দেবতা নিয়ে মেতে ওঠেন, কেউ ঘন ঘন তীর্থ পরিক্রমণ বা দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন অথবা আশেপাশের মানুষকে কাছে টেনে নিয়ে স্নেহ-ভালবাসায় ভরিয়ে দেন। না দিয়ে পারেন না। রেখাদি-জামাইবাবুর সম্বর্ধনা সেই সুযোগটাই এনে দিয়েছিল ব্যানার্জী সাহেবকে। তা না-হলে উনি এমন পাগলের মতো স্নেহ-ভালবাসার স্রোতে সবাইকে ভাসিয়ে দেন!

যখন যেখান থেকেই হোক বাড়ি ফিরে সৌম্য একটু হৈ চৈ না করে পারে না। কিন্তু আজ নিঃশব্দে দোতলায় উঠতে যেতেই ছায়া জিজ্ঞেস করে, কী হল ঠাকুরপো? শরীর খারাপ লাগছে?

—না, বড় বৌদি, শরীর ঠিকই আছে, তবে বড্ড ক্লান্ত।

—একটু ঘুমিয়ে নাও, তাহলেই ক্লান্তি চলে যাবে।

হ্যাঁ, সৌম্য শুয়ে পড়ে, ক্লান্তিতে ঘুমোতেও চায় কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। শুধু তিথি আর ব্যানার্জী সাহেবের কথাই মনে হয়। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরও শুয়ে শুয়ে কতকক্ষণ জেগে থাকে।

পরের দিন অফিসে ব্যানার্জী সাহেব আর জংলি কাকাকে নিয়ে কত সপ্রশংস আলোচনা হয়। তিথিকে কতজনে কত ভাল কথা বলেন। সৌম্য মাঝে-মধ্যে একটু হাসে কিন্তু বিশেষ কথাবার্তা বলে না।

শুধু সেদিন না, তারপর দু'তিন সপ্তাহ অফিসের কাজকর্মের ব্যাপারে কথা বললেও সৌম্য তিথিকে অন্য কোনো কথা বলে না। অবশ্য তিথি এই ক'মাসেই বুঝেছে, অন্য অনেকের মতো ও অযথা বক বক করে না। তবুও একটু যেন খটকা লাগে।

প্রায় মাস খানেক পরের কথা। অফিসে ঢুকেই সবার সামনে তিথি সৌম্যকে বলে, আপনি কথা দিয়েও বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন না বলে উনি খুব দুঃখ করছিলেন।

রেখাদি বললেন, সত্যি সৌম্য, এত দিনের মধ্যে তোমার নিশ্চয়ই একবার যাওয়া উচিত ছিল।

স্বয়ং যোগেনবাবু পর্যন্ত বললেন, অন্যদিন না হোক, কোনো এক শনি-রবিবার তো ঘুরে আসতে পারতে!

আরো দু'একজন মন্তব্য করলেন।

তারপর সৌম্য বলে, বড়দা, হরিপাল থেকে টালিগঞ্জ ঘুরে আসতে হলে প্রায় সারাদিনই চলে যাবে। কিন্তু প্রত্যেক শনি-রবিবারই এত কাজ থাকে যে....

যোগেনবাবু বললেন, শনি-রবিবার তো কাজকর্ম থাকবেই কিন্তু তবু বলব, এর মধ্যে একদিন সময় করে ঘুরে এসো।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব।

এবার ও তিথিকে বলে, মেসোমশাইকে বলবেন, শনি-রবির মধ্যে একদিন বিকেলের দিকে আসব।

পরের দিন তিথি বলে, বাবা বলছিলেন, একটু তাড়াতাড়ি এসে দুপুরে আমাদের ওখানেই খেতে।

—না, না, তা সম্ভব হবে না। দুপুরে আপনাদের ওখানে খেতে হলে আমাকে দশটা-সাড়ে দশটার মধ্যেই বেরুতে হবে।

সৌম্য প্রায় না থেমেই বলে, ছুটির দিন সকালে আমার অনেক কাজ থাকে।

পরের রবিবার চারটে বাজতে না বাজতেই সৌম্য ও বাড়িতে হাজির হয়। ব্যানার্জী সাহেব আর তিথি সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন। ওকে দেখেই তিথি বলেল, আসুন, আসুন।

সৌম্য বারান্দায় উঠেই ব্যানার্জী সাহেবকে প্রণাম করে। উনি ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন, ভাল থাক বাবা।

সৌম্য একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই উনি আবার বলেন, তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করার লোভ সামলাতে পারছিলাম না বলেই তোমাকে কষ্ট দিলাম।

—আর যাই হোক কলকাতায় আসা-যাওয়া করতে আমাদের মতো ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের কোনো কষ্ট হয় না।

তিথি পট থেকে খালি কাপে চা ঢেলে এগিয়ে দেয়।

—দেখো বাবা, আমাদের অনেককেই অনেক কাজ প্রতিদিন করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই কিন্তু কষ্ট হয় না বলা ঠিক না।

সৌম্য একটু হেসে বলে, যে কোনো কাজেই মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার আর কষ্ট হয় না। তাইতো দীর্ঘদিনের সাধনায় অভ্যস্ত সন্ন্যাসীরা শুধু একটা নেংটি পরে হিমালয়ে কাটিয়ে দিতে পারলেও শীতের দেশের সাধারণ মানুষ কখনই তা

পারবে না।

ওর কথা শুনে তিথি হাসে।

মিঃ ব্যানার্জী এক গাল হাসি হেসে বলেন, তুমি এমন উদাহরণ দিলে যে হার স্বীকার করতে বাধ্য হলাম।

—না, না, মেসোমশাই। হার-জিতের কথা নয়। আপনি যে কথা বলেছেন, তা বহু ক্ষেত্রেই সত্যি। যে সব মহিলারা পাঁচটা-সাতটা সন্তানের জননী হয়েছেন, তারা প্রসব বেদনায় অভ্যস্ত হলেও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পান।

মিঃ ব্যানার্জী ওর হাতের উপর একটা হাত রেখে বলেন, খুব সত্যি কথা বলেছ।

তিথি উঠে দাঁড়িয়ে সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলে, আর এক কাপ চা খাবেন তো?

—হ্যাঁ, তা খেতে পারি।

তিথি ভিতরে যেতেই সৌম্য বলে, মেসোমশাই, আপনার পুত্রবধূর পক্ষে তো কেরানির চাকরি করা খুব স্বাভাবিক না।

—অস্বাভাবিক কেন হবে? মা জননী আর্মি অফিসারের মেয়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর ওর মা আর্মির স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ছেলেমেয়েকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টেই থেকেছেন। কোনো কাজকেই ওরা অসম্মানের মনে করেন না।

—কিন্তু উনি তো আপনার পুত্রবধূও?

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, দুটি কারণে আমিও এই চাকরির ব্যাপারে ষোলো আনা সম্মতি দিয়েছি।

মুহূর্তের জন্য থেমে উনি বলেন, আমিও কোনো কাজই অসম্মানজনক মনে করি না। আর একটি বড় কারণ হচ্ছে, বিয়ের কয়েক দিনের মধ্যেই আমার ছেলে আমেরিকা চলে যায়। পড়াশুনা শেষ করেই ওখানে চাকরি শুরু করেছে। দেখতে দেখতে সাত বছর গেল সে দেশে আসে না।

ব্যানার্জী সাহেব আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, মা জননীর শূন্যতা, জ্বালা আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। আমি তাকে যত স্নেহ-ভালবাসা বা সান্নিধ্য দিই না কেন, তাতে যে ওর দুঃখ ঘোচে না, তা আমি খুব ভালো করেই জানি। তাই এই চাকরি নিয়েছেন বলে......

—বাবা-মা স্বামী-সন্তানের অভাব কি চাকরি করে মিটতে পারে?

—না, কখনই মিটতে পারে না। তবে মানুষজন কাজকর্ম নিয়ে থাকলে তো মন একটু....

ঠিক সেই সময় ট্রে হাতে নিয়ে তিথি আসতেই ওদের আলোচনা বন্ধ হয়ে

যায়।

তিথি সেন্টারে টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখতেই সৌম্য সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলে, এত সব খাবার-দাবার আনলেন কেন?

—এতসব তো আনিনি। নিমকি দিয়ে চা খাবার পর এই সামান্য একটু পায়েস...

—পায়েস?

—আজই প্রথম নতুন গুড়ের পায়েস করেছি, তাই....

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিঃ ব্যানার্জী একটু হেসে বলেন, সৌম্য, মা জননীর হাতের পায়েস এত ভাল হয় যে আমাদের না খাইয়ে এক্সপোর্ট করলে কত কোটি টাকা যে ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করা যেত.....

ওর কথার মাঝখানেই তিথি সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলে, বাবার ধারণা ভূ-ভারতের আর কেউ এমন পায়েস করতে পারে না।

মিঃ ব্যানার্জী বেশ জোরের সঙ্গে বলেন, পারেই না। তো!

সৌম্য বলে, আপনাদের তর্ক করার দরকার নেই। আমি একটু পরেই পায়েস খেয়ে বলে দিচ্ছি, এটা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি কি না।

ব্যানার্জী সাহেব বললেন, হাঁ, সেই ভাল।

চা-নিমকি খাবার খানিক পরে এক চামচ পায়েস মুখে দিয়েই সৌম্য বলল, রিয়েলি অপূর্ব!

সলজ্জ হেসে তিথি বলে, কেন লজ্জা দিচ্ছেন? আপনার মা বৌদিরা নিশ্চয়ই এর চাইতে অনেক ভাল...

—ওরা ভাল করলে কি আপনি ভাল করতে পারেন না?

আরো দশ-পনের মিনিট গল্পগুজব করেই সৌম্য বলে, মেসোমশাই, আজ উঠি।

—এখনই উঠবে? তুমি তো ঘন্টা খানেকও আসোনি।

ও একটু হেসে বলে, না, না, ঘন্টা খানেকের আগেই এসেছি।

—তা হোক। আরও একটু বসো।

উনি একটু থেমে বলেন, তোমার গল্প পড়েই বুঝেছিলাম, তুমি ঠিক আর পাঁচজনের মতো সাধারণ না। তারপর যেদিন তুমি প্রথম আমাদের এখানে এলে, সেদিন তোমাকে দেখেই ভাল লেগেছিল।

এবার উনি একটু হেসে বলেন, আর আজ এই সামান্য সময় তোমার কথাবার্তা শুনেই বুঝলাম, তোমাকে ভালবেসে ভুল করিনি।

সৌম্য এক গাল হাসি হেসে বলে, মেসোমশাই, যে যাকে স্নেহ করে, ভালবাসে, সে শত খারাপ হলেও তার চোখে পড়ে না।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ কিন্তু আমি তো সারাজীবন পুলিশে চাকরি করেছি। তাই চট করে কাউকে ভাল বলতে পারি না।

—মানুষের উপর নিশ্চয়ই কর্মজীবনের প্রভাব থাকতেই পারে কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী হচ্ছে তার মন, রুচি, স্বভাব-চরিত্র-দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রভাব।

ও একটু থেমে বলে, অন্য মানুষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আপনিই বলুন, খুনিরা কী অন্য সবাইকে খুনি ভাবে নাকি খুন করতে চায়? বেশ্যারা কি অন্য সব মেয়েকেই.....

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর একটু চাপা হাসি হেসে তিথি বলে, বাবা, এবারও আপনি হেরে গেলেন।

—মা জননী, সৌম্যর মত ছেলেকে একটু খুঁচিয়ে না দিলে তো এইসব কথা শোনা যাবে না।

সৌম্য উঠে দাঁড়িয়ে বলে, মেসোমশাই, আমি কিন্তু এত প্রশংসার যোগ্য নই।

ও ব্যানার্জী সাহেবকে প্রণাম করতেই উনি জিজ্ঞেস করেন, আবার কবে আসবে?

—নিশ্চয়ই আসব, তবে ছুটির দিনে এত কাজ থাকে যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বেরুবার সময় বিশেষ হয় না।

ও প্রায় না থেমেই বলে, তাছাড়া হরিপাল থেকে আপনাদের এই টালিগঞ্জে আসা-যাওয়া তো....

—নিশ্চয়ই কষ্টকর, নিশ্চয়ই সময় সাপেক্ষ। তবু বলছি, তুমি মাঝে মাঝে এলে খুব খুশি হব।

সৌম্য মুহূর্তের জন্য তিথির দিকে তাকিয়ে বলে, কাল অফিসে আসছেন তো?

—আসব বৈকি।

সৌম্য চলে যাবার পর ওরা দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। তারপর মিঃ ব্যানার্জী সাহেব যেন স্বগতোক্তি করেন, আমার ছেলেটা যে কেন সৌম্যর মতো ভদ্র সভ্য নম্র হল না!

এবার উনি পুত্রবধূরর দিকে তাকিয়ে বলেন, ছেলেটাকে যত দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে দম্ভ ঔদ্ধত্য থাকে, তার কিছুই ওর মধ্যে নেই। কথাবার্তা আলাপ-আচরণ যেমন সংযত, সেইরকমই বাহুল্যহীন।

—এইসব কারণেই তো অফিসের সবাই ওকে ভালবাসেন।

—সৌম্যর মতো ছেলেকে কি ভাল না বেসে পারা যায়!

তারকেশ্বর লোকালের প্রায় ফাঁকা কামরায় বসে সৌম্যও শুধু ওদের দু'জনের কথাই চিন্তা করে। বার বার ওদের দু'জনের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যত স্বাভাবিক হবারই চেষ্টা করুন না কেন, একটু ভালভাবে মন দিয়ে দেখলেই ওদের চোখে-মুখে একটা বিচিত্র বেদনার ছাপ দেখা যায়। দেখা না দেবার তো কোনো কারণ নেই। ব্যানার্জী সাহেব যত বড় অফিসারই থাকুক না কেন, যার এক মাত্র সন্তান সাত বছর ধরে বিদেশে পড়ে আছে, কবে দেশে ফিরবে, তার ঠিকঠিকানা নেই, চোখের সামনে শিক্ষিতা পরমা সুন্দরী যুবতী পুত্রবধূ স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা হয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে, যে সংসার নাতি-নাতনির কলগুঞ্জনে মুখরিত হবার পরিবর্তে প্রেতপুরীর মতো নিঝুম হয়ে রয়েছে, তার চোখে-মুখে বেদনার ছাপ থাকবে না?

তিথি? সে ভদ্র সভ্য শিক্ষিতা অত্যন্ত সংযত হলেও তো সে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী না। সে রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ। দুনিয়ার সব মানুষের মতো তারও ক্ষুধা তৃষ্ণা কামনা বাসনা নিশ্চয়ই আছে। নিশ্চয় সে ভালবাসা চায়, ভালবাসতে চায়। তাছাড়া কোন বিবাহিতা মেয়ে সন্তানের জননী হতে চায় না? এমন ঘন কালো উজ্জ্বল দুটো চোখও যেন ম্রিয়মান; অমন লাবণ্যময়ী মুখেও যেন বিষাদের ছায়া।

ওদের কথা ভাবতে ভাবতে সৌম্যর মন বিষণ্ণতায় ভরে যায়। মনে মনে উপলব্ধি করে, ওদের এই বেদনা, এই শূন্যতার জ্বালা তো দু'চারজন পরিচিতের ক্ষণিক সান্নিধ্যে কখনই দূর হতে পারে না।

ওদের কথা ভাবতে ভাবতেই সৌম্য বাড়িতে ঢোকে। বড় বৌদির মুখোমুখি হতেই একটু শুকনো হাসি হেসে নিজের ঘরে চলে যায়। একটু পরে কাবেরী এসে হাজির।

—কী ভাবছ ঠাকুরপো?

—ভাবছি ব্যানার্জীসাহেব আর তিথির কথা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার সৌম্য বলে, ভদ্রলোকের ছেলে সাত বছর ধরে আমেরিকা আছে। এরমধ্যে একবারও দেশে আসেনি। চোখের সামনে পুত্রবধূ প্রায় বৈধব্যের জীবন যাপন করছে। একটা নাতি-নাতনি থাকলেও তাকে নিয়ে ওরা মেতে থাকতে পারতেন কিন্তু তাও তো ওদের কপালে জুটল না।

—সত্যি খুব দুঃখের ব্যাপার।

—জানো ছোট বৌদি, ব্যানার্জীসাহেব দারুণ মিশুকে ; তিথিও কত স্বাভাবিক।

হঠাৎ দেখলে মনেই হবে না ওদের কোনো দুঃখ আছে, কিন্তু একটু ভালভাবে ওদের দেখলেই বুঝতে পারবে ওরা যেন কোনো মতে চোখের জল আটকে রেখেছেন।

কাবেরী বেদনার্ত মুখে বলে, ওদেব চোখে না দেখলেও শুধু ওদের কথা শুনেই মন খারাপ হয়ে যায়।

ও একটু থেমে বলে, তবু তিথির কপাল ভাল যে অমন ভাল শ্বশুর পেয়েছে।

—ব্যানার্জী সাহেবের মতো শ্বশুর তো লাখে একজন পাওয়া যায় না কিন্তু তুমিই বলো, শ্বশুর কি স্বামী বা সন্তানের অভাব দূর করতে পারেন?

কাবেরী মাথা নেড়ে একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, না, ভাই, তা কখনই সম্ভব না। দুধের স্বাদ তো ঘোলে মিটতে পারে না।

ঠিক সেই সময় মৃত্তিকা ঘরে ঢুকেই সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলে, ভাল কাকু, তুমি আর ছোট মা কি সিরিয়াস কিছু আলোচনা করছো?

—কেন বল তো?

—দিদি বলছিল, তোমরা সিরিয়াস কিছু আলোচনা না করলে ও একটু আসতো।

সৌম্য একটু হেসে বলে, আমার ঘরে তোরা তিন ভাইবোন যখন খুশি আসতে পারিস।

মৃত্তিকা প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে যাবার এক মিনিটের মধ্যে তিথি এসে হাজির।

ওকে দেখেই কাবেরী একটু হেসে বলে, নিশ্চয়ই কিছু স্পেশাল আব্দার আছে!

তিথি বেশ জোরের সঙ্গেই বলে, আছেই তো!

খাটে আধ শোয়া অবস্থাতেই সৌম্য ডান হাত এগিয়ে তিথির একটা হাত ধরে বলে, আয়; কাছে আয়।

তিথি পাশে বসতেই ও বলে, বল্, কী বলবি।

তিথি একটু হেসে বলে, পরশু দিন দুই বন্ধু সালোয়ার-কামিজ কিনবে বলে আমাকেও জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।....

—কোথায়?

—নিউ মার্কেটে।

—বন্ধুরা সালোয়ার কামিজ কিনেছিল?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, ঐ দোকানের সালোয়ার-কামিজগুলো দেখে তো আমাদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল ; যেমন সুন্দর, তেমনই রিজনেবল্ দাম।

কাবেরী মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলে, ঠাকুরপো, কবে এই আদরিনী মেয়েকে নিয়ে নিউ মার্কেট যাচ্ছো?

—পরশু।

তিথি এক গাল হাসি হেসে বলে, ভাল কাকু, সত্যি পরশু যাবে?

—বেশি দেরি করলে কি ওগুলো আর পাওয়া যাবে?

সৌম্য একটু থেমে বলে, কাল আমার অফিস আছে। তোরও কলেজ আছে। পরশু তো বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি। তুই...

খুশির হাসি হেসে তিথি বলে, আমরা তিন ভাইবোনই যাব নাকি আমি একলা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরাও যাবে।

—তার মানে কি হোল ডে প্রোগ্রাম?

—নিশ্চয়ই।

তিথি এক ঝলক কাবেরীর দিকে তাকিয়েই বলে, জানো ভাল কাকু, ছোট মা-র কাছে এই খবর পেয়েই মা ছুটে এসে বলবে, তোর আর ক'টা সালোয়ার-কামিজ চাই রে?

ওর কথা শুনে সৌম্য আর কাবেরী দু'জনেই হেসে ওঠে।

সৌম্য সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েই তিথিকে বলে, চল, আমিই তোর মাকে বলে দিচ্ছি, তোর ক'টা সালোয়ার-কামিজ চাই।

এক মুহূর্ত দেরি না করে ও তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। ওর পিছনে পিছনে আসে কাবেরী আর তিথি।

সিঁড়ি থেকে নেমে বারান্দায় পা দিতেই ছায়াকে সামনে দেখে সৌম্য বলে, বড় বৌদি, মঙ্গলবার বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি। সেদিন সকালে জলখাবার খেয়েই আমি তিনটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে কলকাতা যাব। ওদের দু'একটা জরুরি জিনিসপত্র কেনার পর আমরা খেয়েদেয়ে ঘুরে-ফিরে সন্ধের পর ফিরব।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছায়া প্রশ্ন করে, তোদের কী জরুরি জিনিস কিনতে হবে?

তিথি কিছু বলার আগেই সৌম্য বলে, ক'দিন আগে এক বন্ধুর সঙ্গে নিউ মার্কেটে গিয়ে এমন সুন্দর সুন্দর সালোয়ার-কামিজ দেখলাম যে তোমাকে কী বলব!

ও এক নিঃশ্বাসেই বলে, সেদিন পকেটে টাকা ছিল না বলে কিনতে পারিনি, তাই.....

তিথি আর কাবেরী অতি কষ্টে হাসি চেপে রাখে।

ছায়া বলে, ওদের তো যথেষ্ট জামাকাপড় আছে। আবার শুধু শুধু.....

সৌম্য একটু হেসে বলে, বড় বৌদি, ছেলেমেয়েগুলোকে তো এখনও তোমাদের

মতো বুড়ো-বুড়ি হয়নি। তাছাড়া সামনের মাসেই তিথিদের কলেজের অ্যানুয়াল সোশ্যাল আর রি-ইউনিয়ন। সাত দিন ধরে পুরনো জামাকাপড় পরে গেলে কি মেয়েটার প্রেস্টিজ থাকবে?

আনন্দে খুশিতে তিথি দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে, থ্রী চিয়ার্স ফর ভাল কাকু!

কাবেরী মুখ টিপে হাসতে হাসতে ছায়ার একটা হাত ধরে বলে, দিদি, চল, ভিতরে যাই।

রবিবার নানা কাজের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। সোমবার ভোরবেলাতেই খবর এল, কেষ্টদার মা ম্যাসিভ সেরিব্রাল অ্যাটাকে একটু আগেই মারা গিয়েছেন। খবরটা শুনে সারা বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এল। তিনটে ছেলেমেয়েকে বাড়িতে রেখে সবাই ছুটে গেলেন ও বাড়িতে।

এ বাড়ির সবাই জানে, ঠিক একান্ন বছর আগে সরলাবালা যখন এই সংসারে আসেন, তখন এই গ্রামের একমাত্র মাধুরীলতার সান্নিধ্য আর বন্ধুত্বই ছিল তাঁর এক মাত্র আনন্দ। দিন যত এগিয়েছে, ওদের সম্পর্ক আরও গভীর আরও নিবিড় হয়েছে। ছায়াকে তো উনিই পছন্দ করে শান্তর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ছেলে-বউদেরে কাছে মাধুরীলতা ছিলেন ভাল মা আর তিনটে ছেলেমেয়ের ছিলেন ভাল ঠাকুমা।

নানাজনের কান্নাকাটি, স্মৃতি রোমন্থনের পর উদ্যোগ আয়োজন করে শ্মশানে রওনা হতেই বেশ বেলা হয়ে গেল। গ্রামের অন্যান্য অনেকের সঙ্গে সৌম্যরা তিন ভাই-ই শ্মশানে গেল। বাড়ি ফিরল সন্ধে ঘুরে যাবার পর।

একটু পরেই বকুল এসে সৌম্যকে বলে, সমুদা, আমি তোমার অফিসে ফোন করে বলে দিয়েছি।

—কার সঙ্গে কথা বললি?

—তোমরা যাকে বড়দা বল, সেই যোগেনবাবুর সঙ্গেই কথা বলেছি।

—উনি কিছু বললেন?

—বললেন, এত ব্যস্ত হয়ে খবর দেবার দরকার ছিল না। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া তো সৌম্য কখনই কামাই করে না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার একটু আগে হিন্দোল উপরে দিদিদের ঘরে যায়। শুকনো মুখে বলে, দিদিভাই, কাল কি ভাল কাকু আমাদের নিয়ে বেরুবে?

তিথি বলে, ভাইমণি, কিছুই বুঝতে পারছি না। কারুরই তো মন ভাল না। তাই ভাল কাকুকে জিজ্ঞেস করতেও পারছি না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরে ঢোকার আগেই সৌম্য ভাইঝিদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, মা, তোরা ঘুমিয়েছিস?

তিথি-মৃত্তিকা একই সঙ্গে বলে, না, ভাল কাকু।

—কাল সকাল সকাল উঠবি। ন'টা পাঁচ-দশের মধ্যেই আমাদের বেরুতে হবে।

তিথি বলে, আমরা তার আগেই তৈরি হয়ে নেব।

মৃত্তিকা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, যাই, ভাইমণিকে বলে আসি।

খানিকটা পরেই ছায়া সৌম্যর ঘরে এসে হাজির।

—ঠাকুরপো, ঘুমুচ্ছ নাকি?

—না, বড় বৌদি

—আজ সারাটা দিন যেভাবে কাটল! কাল না হয় নাই বেরুলে?

—না, বড় বৌদি, তা হয় না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ওরা কত আশা করে বসে আছে। এর মধ্যে তো আর কোনো ছুটিও নেই। রবিবার নিউ মার্কেট বন্ধ থাকে, শনিবার একটায় বন্ধ। তাছাড়া শনিবার তো ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ আছে।

ছায়া আর কোনো কথা না বলে নিচে চলে যান।

ন'টা চল্লিশে হরিপাল ছেড়ে এগারোটা দুই'তে হাওড়া পৌঁছবার কথা কিন্তু পৌঁছল প্রায় এগারোটা কুড়িতে। তারপর ট্যাক্সিতে নিউ মার্কেট।

লিণ্ডসে স্ট্রিটে ট্যাক্সি থেকে নেমে নিউ মার্কেটে ঢুকতেই সৌম্য দুই ভাইঝিকে বলে, সবার আগে ভাইমণির জিনিস কিনব।

শুনে খুশিতে হিন্দোলের মুখে আর হাসি ধরে না।

মৃত্তিকা বলে, দিদিভাই, ভাইমণির পর আমি, তুই লাস্ট!

কয়েক পা এগুতেই একটা শো কেসের সামনে জংলী কাকাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সৌম্য অবাক হয়ে যায়। এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে সৌম্য বলে, জংলি কাকা, আপনি এখানে?

জংলি এক গাল হেসে বলে, বৌমাকে নিয়ে এসেছি।

—আপনার বৌমা কোথায়?

—দোকানের ভিতরে।

—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

উনি বেশ একটু পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলেন, বৌমা তো আমাকে গাড়িতে বসে থাকতে দেয় না।

—কেন?

—তাহলে লোকে যে আমাকে ড্রাইভার ভাববে। আমাকে কেউ ছোট মনে করবে, তা তো বৌমার সহ্য হবে না।

ওর কথা শুনে সৌম্য একটু খুশির হাসি হাসে।

ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীমতী তিথি ব্যানার্জী দোকানের বাইরে পা দিয়েই ওদের দেখে অবাক হয়ে যান।

—আপনি!

সৌম্য জবাব দেবার আগেই উনি ওর সঙ্গী তিনজনের উপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়েই বলেন, এরাই তো আপনার ভাইপো-ভাইঝি?

—হ্যাঁ।

এবার উনি অষ্টাদশীর একটা হাত ধরে একটু হেসে বলেন, তুমিই তো তিথি?

—হ্যাঁ।

—আমার নামও তিথি।

ছোট তিথি চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, ও আপনিই তিথি!

—হ্যাঁ। আমার কথাও তুমি জান?

—শুধু আপনার কথা না, আপনাদের বাড়ির সবার কথাই ভাল কাকু আমাদের বলেছে।

এবার উনি অন্য দু'জনকে একটু আদর করে বলেন, তুমি মৃত্তিকা আর তুমি হিন্দোলবাবু! কি ঠিক বলেছি তো?

ওরা দু'জনে এক সঙ্গে জবাব দেয়, হ্যাঁ।

—কী কিনতে নিউ মার্কেট এসেছ?

মৃত্তিকা বলে, দিদিভাইয়ের সালোয়ার-কামিজ। আমাদের দু'জনের জন্যও কিছু কেনাকাটা হবে। ভাল কাকু তো কখনও একজনকে কিছু দেয় না।

—মা-কাকিমাকে নিয়ে কেনাকাটা কর না?

এবার ছোট তিথি বলে, ওদের আমরা এসব কথা বলিই না। আমাদের সবকিছুই ভাল কাকু সামলায়।

—ইস! আমার যদি এইরকম একটা ভাল কাকু থাকত!

ছোট তিথি একটু হেসে বলে, আমার বন্ধুরা তো সব সময় বলে, তোর মতো একটা ভাল কাকু আমাদের থাকলে কী মজাই হত।

তিথি সৌম্যর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, কেনাকাটা করেই বাড়ি ফিরে যাবেন?

—না, না। সারাদিন এদের নিয়ে ঘোরাঘুরির পর ফিরব রাত্রে।

—তাহলে কেনাকাটা করে আমাদের ওখানে চলুন। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করে...

ওর কথার মাঝখানেই জংলি কাকা বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের ওখানেই চলুন। আপনাদের সবাইকে নিয়ে গেলে সাহেব খুব খুশি হবেন।

সৌম্য বলে, আজ থাক। অন্য একদিন যাব।

তিথি ওদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমাদের কী তোমাদের একটুও পছন্দ হচ্ছে না? তোমরাও কী আমাদের সঙ্গে যেতে চাও না?

ছোট তিথি বলে, ভাল কাকু বললেই আমরা যেতে পারি।

—তোমাদের কী ইচ্ছা?

ছোট তিথি একটু হেসে বলে, আমি তো যেতে চাই।

মৃত্তিকা সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমিও তো যেতে চাই।

—হিন্দোলবাবু, তুমি?

জংলি কাকা একটু হেসে হিন্দোলকে বলেন, আমাদের বাড়িতে একটা দোলনা আছে। চল, চল। খুব মজা হবে।

—সত্যি দোলনা আছে?

তিথি বলে, হ্যাঁ বাবা, দোলনা আছে।

হিন্দোল এক গাল হাসি হেসে বলে, তাহলে আমিও যাব।

এবার তিথি চাপা হাসি হেসে সৌম্যকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন নাকি এদের তিনজনকে নিয়েই আমরা চলে যাব?

—পরাজিত সেনাপতিকে আর কেন দুঃখ দিচ্ছেন?

আনন্দে খুশিতে উত্তেজিত হয়ে তিথি বলে, জংলি কাকা, প্রথমে আইসক্রীম-কোল্ড ড্রিঙ্ক, তারপর কেনাকাটা করেই সোজা বাড়ি।

তিথি তিন ভি-আই-পিকে আইসক্রীম-কোল্ড ড্রিংকে আপ্যায়িত করতেই জংলী কাকা বলেন, বৌমা, আমি আমার কাজ সেরে গাড়ির কাছে যাচ্ছি। তোমরা কেনাকাটা করে গাড়ির কাছে চলে এস।

—হ্যাঁ, সেই ভাল।

প্রথমে হিন্দোলের টি-সার্ট প্যান্ট মোজা গেঞ্জি কেনার পর দুই বোনের জন্য সুন্দর দুটো সালোয়ার-কামিজ কেনা হলে সবাই মিলে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সৌম্য তিথিকে বলে, আপনি এদের নিয়ে গাড়ির ওখানে যান। আমি আসছি।

সুন্দর একটা বোকে কিনে সৌম্য গাড়ির কাছে এসে দেখে তিথি ওদের তিনজনকে নিয়ে পিছনের সীটে বসে হাসাহাসি করছে। ওকে দেখেই তিথি বলে, আপনি সামনে বসুন।

সৌম্য সামনের সীটে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে বলে, এই তিনটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরতে পারব তো? নাকি ওদের আপনি রেখে দেবেন?

—আমি আগে থেকে কেন বলে দেব?

ওদের কথা শুনে ছোট তিথি আর মৃত্তিকা হাসে।

জংলি কাকা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং ঘুরাতেই হিন্দোল বলে, ভাল কাকু, আমরা কী মোহনবাগান মাঠের পাশ দিয়ে যাব?

সৌম্যকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জংলি কাকা বলেন, হ্যাঁ, ভাই, আমরা মোহনবাগান মাঠের পাশ দিয়েই যাব।

সৌম্য বলে, তাহলে তো আমাদের অনেক ঘুরতে হবে।

—তাতে কিছু হবে না। ক' মিনিটের আর ব্যাপার!

জংলি কাকা ওকে শুধু মোহনবাগান মাঠ না, ইডেন গার্ডেন, ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান মাঠও দেখিয়ে রেড রোড ধরে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে যান।

তিথি জিজ্ঞেস করে, হিন্দোলবাবু, তুমি ইডেন গার্ডেনে টেষ্ট ম্যাচ দেখেছ?

—না, টেস্ট ম্যাচ দেখিনি, রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইন্যাল দেখেছি।

—তুমি একলা দেখেছ নাকি দিদিরাও দেখেছে?

—আমরা তিনজনেই দেখেছি।

—কোনো বড় ক্লাবের ফুটবল খেলা দেখেছ?

—এখানকার তিনটে বড় ক্লাবের খেলাই দেখেছি।

—তিনজনেই দেখেছ?

—হ্যাঁ।

এবার উনি ছোট তিথিকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা ভাল করে কলকাতা দেখেছ?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, ভাল কাকু আমাদের একেক বার একেক ধরনের দ্রষ্টব্য দেখায়।

—যেমন?

—যেমন একবার আমরা দক্ষিণেশ্বর মন্দির, চিত্তেশ্বরী, বাগবাজার-ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী, কালীঘাট ছাড়াও পরেশনাথের মন্দির আর নাখোদা মসজিদ দেখেছি।

ও একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, একবার আমরা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, জগদীশচন্দ্র, রাসমণি, নেতাজী আর স্যার আশুতোষের বাড়ি দেখি।

—বাঃ! খুব ভাল।

মৃত্তিকা বলে, দিদিভাই, আমাদের খাবার গল্প কর।

ছোট তিথি একটু হেসে বলে, ভাল কাকু আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুলেই একেকবার একেক ধরনের খাবার-দাবার খাওয়ায়।

—যেমন?

—কোনো বার বড়বাজারে কোথাও মাড়োয়ারি খাবার খাই, পরের বার হয়তো মুসলমানের দোকানে বিরিয়ানি খাই, আবার কখনও সুরুচি বা বঙ্গলক্ষ্মীতে ষোল আনা বাঙ্গালি খাবার খাই।

—বাঃ! গুড আইডিয়া!

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, এবার থেকে ভাল-মন্দ খাবার সময় আমাকে সঙ্গে নেবে?

—আপনি আমাদের সঙ্গে ঘুরলেই খেতে পাবেন।

—যদি তোমাদের ভাল কাকু আপত্তি করেন?

—আমাদের ভাল কাকু সে ধরনের মানুষই না।

চাপা হাসি হেসে তিথি প্রশ্ন করে, তোমাদের ভাল কাকু কী ধরনের মানুষ?

—ভাল কাকুর চাইতে ভাল বন্ধুও হয় না, ভাল মানুষও হয় না।

সৌম্য বলে, এবার এই আলোচনা বন্ধ করুন তো!

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-রেস কোর্স পিছনে ফেলে জংলি কাকা গাড়ি চালাতে চালাতেই বলেন, হিন্দোলবাবু, তুমি কী খেতে ভালবাস? মাছ না মাংস?

—চিকেন।

—খুব ভাল।

মুর এভিন্যুর ব্যানার্জী নিবাসে ঢোকার আগে থেকেই জংলি কাকা পাগলের মতো হর্ন বাজাতে বাজাতে গাড়ি ভিতরে ঢোকায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যানার্জী সাহেব বাইরে বেরিয়ে এসেই চিৎকার করেন, এরকম হর্ন বাজাচ্ছিস কেন?

গাড়ির দরজা খুলে সবাই বেরুতেই তিথি এক গাল হেসে বলে, বাবা দেখছেন, কাদের ধরে এনেছি?

—ও মাই গড!

ব্যানার্জী সাহেব প্রায় লাফ দিয়ে নিচে নেমে এসে তিনজন ভি-আই-পি অতিথিকে প্রায় বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, একি সৌভাগ্য!

জংলী কাকা এক গাল হেসে বলেন, এ হতভাগা অহেতুক হর্ন বাজায় না।

—না, আজকে আর তোকে বকতে পারলাম না।

সৌম্য তিন শিষ্য-শিষ্যাকে ইসারা করে প্রণাম করতে বলতেই ওরা ব্যানার্জী সাহেবকে প্রণাম করে। উনি ওদের প্রত্যেককে আদর করে আশীর্বাদ করেন।

এবার ওরা তিথি আর জংলি কাকাকেও প্রণাম করে।

জংলি কাকা বলেন, আমাকে আবার প্রণাম করলে কেন?

ছোট তিথি বলে, আপনিও আমাদের দাদু।

—আমি দাদু?

হিন্দোল বলে, আপনি ভাল দাদু।

ব্যানার্জী সাহেব বলেন, আর আমি?

ছোট তিথি বলে, আপনি নতুন দাদু।

তিথি বলেন, আমিও এক কাকুর স্ত্রী। আমাকেও কাকিমা বলবে তো?

ছোট তিথি কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর একটু হেসে বলে, আপনাকে সুন্দরী কাকিমা বলব।

—আমি সুন্দরী!

—আপনি শুধু সুন্দরী না, আপনি ভারী চার্মিং অ্যান্ড সুইট।

মৃত্তিকা বলে, ঠিক বলেছিস দিদিভাই।

ব্যানার্জী সাহেব বলেন, মা জননী, এদের গ্রেপ্তার করলে কোথায়?

—সৌম্যবাবু এদের জামাকাপড় কেনাকাটার জন্য নিউ মার্কেট এসেছিলেন। সেখানেই এদের পাকড়াও করি।

—খুব ভাল করেছ।

—সৌম্যবাবু আসতে চাইছিলেন না।

—কেন?

—ওর প্ল্যান ছিল এদের নিয়ে ঘোরাঘুরি করবেন আর বাইরে খাবেন।

—তারপর?

তিথি খুশির হাসি হেসে বলেন, ওর তিন শিষ্য-শিষ্যাই আমার প্রস্তাবে রাজি হওয়ায় উনি আসতে বাধ্য হলেন।

সারাদিন সবারই অভাবনীয় আনন্দে কাটল। বিদায় নেবার আগে ছোট তিথি ব্যানার্জী সাহেবকে বলে, নতুন দাদু, যে কোনো ছুটির দিনে আপনি ভাল দাদু আর

সুন্দরী কাকিমাকে নিয়ে আমাদের ওখানে আসুন। বোধহয় খুব খারাপ লাগবে না।

তিথি বলেন, যাব কী করে? তোমার ভাল কাকু তো কখনই আমাদের যেতে বলেন না।

ব্যানার্জী সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, সৌম্য আবার কী বলবে? আমার বড়দি যখন যেতে বলছে, তখন আমাদের যেতেই হবে।

গাড়িতে ওঠার আগে সৌম্য তিথিকে একটু পাশে ডেকে বলে, আজকে যে আমরা সবাই আপনাদের এখানে কাটিয়ে গেলাম, তা অফিসের কাউকে বলবেন না।

—কেন বলুন তো?

—আমাদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বাইরের কাউকে জানাবার কি দরকার আছে?

মুহূর্তের জন্য একটু চিন্তা করে তিথি বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। না, আমি কাউকেই বলব না।

বাড়ি ফিরে তিন ভাইবোনে এক সঙ্গে চিৎকার করে বলে, সুন্দরী কাকিমাদের বাড়িতে দারুণ এনজয় করেছি।

বৃদ্ধা সরলাবালা জিজ্ঞেস করেন, কে সুন্দরী কাকিমা?

তিথি বেশ গলা চড়িয়েই বলে, ঐ তো ভাল কাকুর অফিসের তিথির কথা বলছি।

ও এবার মা-কাকিমার দিকে তাকিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে, তোমরা ভাবতে পারবে না, সুন্দরী কাকিমা কী চার্মিং আর কী সুইট!

হিন্দোল বলে, নতুন দাদু আর ভাল দাদুও খুউব ভাল।

তিথি বলে, আমি ওদের একদিন আসতে বলেছি।

কাবেরী বলে, ওরা কি আর এখানে আসবেন?

মৃত্তিকা বলে, হ্যাঁ, ছোট মা, ওরা সত্যিই আসবেন।

ছায়া পাশ ফিরে বলেন, ঠাকুরপো, ওরা কি সত্যি আসবেন?

—হ্যাঁ, বড় বৌদি, ওরা সত্যি আসবেন।

আটটা আঠাশের তারকেশ্বর লোকাল ধরে হাওড়া পৌঁছে ফেরিতে গঙ্গা পেরিয়ে সৌম্য অফিসে ঢোকার পর দেখতে পায় যোগেনবাবু ফাইলপত্র পড়তে শুরু করে দিয়েছেন। রেখাদিও প্রায় ঐ সময়ই আসেন। সপ্তাহে দু'একদিন সৌম্য পৌঁছবার পাঁচ-দশ মিনিট আগেও এসে যান। এই দু'জন ছাড়া সৌম্য অফিসে ঢুকে আর কাউকেই দেখতে পায় না। অন্যান্য সবাই ওর পরেই আসেন। তাইতো সোমবার অফিসে ঢুকে যোগেনবাবু ছাড়া তিথিকে দেখে ও অবাক হয়ে যায়। বলে, কী ব্যাপার? আজ এত তাড়াতাড়ি?

যোগেনবাবু বলেন, সী কেম শার্প অ্যাট টেন!

তিথি কোনো কথা বলেন না। ওর দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসেন।

সৌম্যও নিজের আসনে বসেই ওর দিকে তাকিয়ে একটু না হেসে পারে না।

দৃষ্টি বিনিময় হতেই দু'জনেই একটু লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করে। ঠিক সেই সময় রেখাদি ঘরে ঢুকেই তিথিকে দেখে বলেন, কী ব্যাপার তিথি? আজ এত তাড়াতাড়ি?

—আপনাদের আসার পর রোজ রোজ আমার আসা কি ঠিক?

পনের-বিশ মিনিটের মধ্যে শুধু মায়া ছাড়া আর সবাই এসে যান। ঘণ্টা খানেক পর যোগেনবাবুই বলেন, রেখা, মায়া এল না কেন বলতে পার? ও তো না বলে-কয়ে কামাই করে না।

—না. বড়দা, আমি তো কিছু জানি না। শুক্রবার ছুটির পর আমরা অনেক গল্পগুজব করেছি কিন্তু আজকে যে ও আসতে পারবে না, তা তো বলেনি।

সুখেনবাবু বলেন, নিশ্চয়ই কিছু কাজে আটকে পড়েছে। কাল ঠিক আসবে।

না, পরের দিনও মায়া আসে না।

বুধবারও যখন ও এল না, তখন একটু চিন্তিত হয়েই যোগেনবাবু বলেন, মায়া তো চিন্তায় ফেলে দিল। কোনো আপদ-বিপদে বা অসুখ-বিসুখে পড়ল কিনা, তা'ও বুঝতে পারছি না।

মন্মথবাবু বললেন, সত্যিই চিন্তার ব্যাপার।

রেখাদি বলেন, আমি জানি, ও বাঙ্গুর এভিন্যুতে থাকে কিন্তু বাড়িটা তো চিনি না। উনি পাশ ফিরে বলেন, বন্দনা, তুই তো ওর বাড়ি চিনিস?

—সে প্রায় বছর তিনেক আগে একদিন সন্ধের দিকে হঠাৎ ওর সঙ্গে লেক টাউনে দেখা হবার পর ও জোর করে টেনে নিয়ে যায় ওর বাড়িতে কিন্তু খেয়ালই করিনি ঠিক কোন গলিতে....

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সৌম্য বলে, বড়দা, আমি ওর হাসব্যাণ্ডকে চিনি। আমার বড়দার একটা পলিসির ব্যাপারে কয়েক দিন ওর অফিসেও গিয়েছিলাম। দরকার হলে আমি ওর অফিসে গিয়ে খবর নিতে পারি।

যোগেনবাবু বলেন, উনি এল-আই-সি'র কোন অফিসে কাজ করেন?

—হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এ তিনতলায় কোনার দিকের একটা ঘরে বসেন।

রেখাদি আর সুখেনবাবু প্রায় এক সঙ্গেই বলেন, বড়দা, সৌম্য বরং একবার ওর কাছ থেকে খবরটা নিয়ে আসুক।

তিথি সঙ্গে সঙ্গে বলে, বড়দা, যদি বলেন, তাহলে আমিও সৌম্যবাবুর সঙ্গে যেতে পারি।

রেখাদি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ বড়দা, তিথিও সৌম্যর সঙ্গে যাক। মায়া যদি অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে থাকে, তাহলে তিথি একটু.....

যোগেনবাবু বলেন, হ্যাঁ, তিথিও যাক।

মিসেস চৈতালি মুখার্জী বললেন, মায়ার যদি সত্যি তেমন কোনো অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকে, তাহলে সে তিথিকে বলতে পারলেও সৌম্যকে না'ও বলতে পারে।

মন্মথবাবু-সুখেনবাবু-ত্রিদিববাবুও ওদের দু'জনকে বললেন, সব খোঁজ খবর নিয়েই এসো।

সৌম্য ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলে, হ্যাঁ, সব খবর নিয়েই আসব।

ওর পিছন পিছন বেরিয়ে আসে তিথি।

কয়লাঘাটা অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েই সৌম্য বলে, ট্রামে-বাসে তো হিন্দুস্থান বিল্ডিং যাওয়া যাবে না। হয় ট্যাক্সিতে, না হয় হেঁটে যেতে হবে।

—ট্যাক্সি তো অনেক ঘুরে-ফিরে যাবে। তার চাইতে হেঁটে যাওয়াই ভাল।

—এই রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটতে কষ্ট হবে না?

তিথি একটু হেসে বলে, ভুলে যাবেন না, আমি দিল্লিতে বড় হয়েছি। কলকাতার চাইতে ওখানে অনেক বেশি গরম পড়ে।

ব্যাঙ্কশাল কোর্ট ডান দিকে রেখে হেয়ার স্ট্রিটের দিকে এগুতে এগুতে সৌম্য বলে, তাহলে চলুন।

হেয়ার স্ট্রিট থেকে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে পড়েই তিথি বলে, তিথি-মৃত্তিকা-হিন্দোলবাবু কেমন আছে?

—ভালই।

—সেদিন বাড়ি ফিরে ওরা কিছু বলল?

সৌম্য ওর দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার কথার জবাব পরে দিচ্ছি। আগে বলুন, হঠাৎ আপনি এলেন কেন?

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর তিথি বলে, পরশু দিন আপনাদের চারজনকে নিয়ে এত আনন্দ করার পর আজ অফিসের মধ্যে ঐভাবে চুপচাপ থাকতে একটুও ভাল লাগছিল না।

—সেদিন সত্যি খুব আনন্দ পেয়েছেন?

—বিশ্বাস করুন, সেদিন যা আনন্দ পেয়েছি, তা আপনাকে মুখে বলে বোঝাতে পারব না। বাবা আর জংলি কাকাও অসম্ভব খুশি হয়েছেন।

—তিথি-মৃত্তিকা-হিন্দোলও খুব আনন্দ পেয়েছে।

সৌম্য মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমার বাবা-মা আর বৌদিদের কাছে ওরা তিনজনে বোধহয় হাজারবার আপনাদের প্রশংসা করেছে।

তিথি একটু হেসে বলে. ওরা তো আনন্দ পেয়েছে, কিন্তু আপনি?

—আপনার কী মনে হয়?

—আপনার মনের কথা আমি কী করে জানব?

—তবু অনুমান।

—এর মধ্যে যদি একদিন আসেন, তাহলে বুঝব বোধহয় আমাদের খুব খারাপ লাগেনি।

রাজভবন পিছনে ফেলে গভর্ণমেন্ট প্লেস ইষ্ট পেরিয়ে ওয়াটারলু স্ট্রিটে পৌঁছে সৌম্য বলে, আমি তো বেশ ক'দিন আপনাদের ওখানে গিয়েছি। এবার আপনারা একদিন আমাদের গ্রামে আসুন।

—আপনি তো কোনোদিন যেতে বলেননি।

—আমি না বললেও আমার ভাইপো-ভাইঝিরা তো বলেছে।

—ওরা নিশ্চয়ই বলেছে, আমরাও বলেছি যাব কিন্তু আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছাও তো জানা দরকার।

—আমার অনেক দৈন্য থাকতে পারে কিন্তু মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে জানি।

—আপনার লেখা পড়ে তা আমি আগেই বুঝেছি।

ওর কথা শুনে সৌম্য হাসতে হাসতে বলে, আমি কী শরৎচন্দ্রের মতো শ্রীকান্ত লিখেছি যে আপনি আমার....

—শ্রীকান্ত তো অনেক পরের কথা। রামের সুমতির মতো ছোট্ট গল্প পড়েই সারা বাংলাদেশের মানুষ জেনে যায়, দুর্বল দুঃখীর প্রতি শরৎচন্দ্রের কি অপরিসীম দরদ আর ভালবাসা ছিল।

ও একবার নিঃশ্বাস নিয়েই সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে আপনার দু'চারটে গল্প পড়ে কেন বুঝতে পারবব না...

—থাক, থাক, আর বলবেন না। আমার মতো চুনো পুঁটি লেখকের এসব শুনলে মাথা ঘুরে যাবে।

কথাটা শুনেই তিথি একটু রাগ করেই বলে, আপনি সব সময় নিজেকে এত ছোট মনে করেন কেন? অফিসেও আপনার লেখা নিয়ে কেউ একটু ভাল কথা বললেই আপনি....

—আমি জানি, আমি একজন অতি তুচ্ছ নগণ্য লেখক। তাই....

—এখন আপনি যত সামান্যই হন, ভবিষ্যতে যে আপনি একজন বিখ্যাত লেখক হবেন না, তা কে বলতে পারে?

—আমি জানি, আমার সে ক্ষমতা নেই।

—আমি যদি বলি, আপনার মধ্যে সে ক্ষমতা চাপা পড়ে আছে?

—আপনি মহৎ, আপনি উদার বলেই এই সব কথা বলছেন।

হঠাৎ সামনে হিন্দুস্থান বিল্ডিং দেখেই ওরা থমকে দাঁড়ায়। তিথি একটু হেসে বলে, এরপর একদিন ভাল করে ঝগড়া করব।

—তথাস্তু!

হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর তিন তলার কোণার দিকে ঘরে ওরা ঢুকতেই অমিতাভবাবু এক গাল হেসে বলেন, কী ব্যাপার সৌম্য? এবার কার পলিসির ব্যাপারে......

—না, দাদা, কারুর পলিসির ব্যাপারে আসিনি।

—তাহলে?

—মায়াদির খবর নিতে এসেছি।

অমিতাভবাবু তিথিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ইনি?

তিথি সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে নমস্কার করে বলে, দাদা, আমার নাম তিথি ব্যানার্জী। আমরা একই সেক্সনে কাজ করি।

অমিতাভবাবু পাশের দুটো চেয়ারে দেখিয়ে বলেন, দিদি, বসুন ; সৌম্য বসো।

সৌম্য চেয়ারে বসেই বলে, মায়াদি সোমবার থেকে অফিসে আসছেন না বলে সবাই খুবই চিন্তিত। তাই বড়দা আমাদের আপনার কাছে পাঠালেন খবর নেবার জন্য।

অমিতাভবাবু হাতের কলমটা নামিয়ে রেখে একটু শুকনো হাসি হেসে বলেন, বহুদিন পর তোমাদের মায়াদির সঙ্গে গত শনিবারই আলিপুর কোর্টে আমার দেখা হয়েছিল।

সৌম্য অবাক হয়ে বলে, আলিপুর কোর্টে?

—হ্যাঁ, ভাই, আলিপুর কোর্টে।

উনি ম্লান হাসি হেসে বলেন, ঐদিনই আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেল।

—তার মানে?

উনি আবার একটু হেসে বলেন, মায়ার মতো মেয়ে কি আমার মতো অপদার্থের সঙ্গে সারাজীবন কাটাতে পারে? যার সঙ্গে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বা কর্পোরেট হাউসের আপ-কামিং অফিসারের বিয়ে হওয়া উচিত, সে আমার মতো কেরানির ঘরনি হয়ে থাকবে কেন?

—আপনি মোটেও কেরানি না, আপনি তো অফিসার!

—দু'একশ টাকা মাইনে বাড়লেই কেরানিদের অফিসার বলা হয় কিন্তু তাই বলে কি তারা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের মতো কুলিন হয়ে যায়?

তিথি স্তম্ভিত হয়ে নীরব থাকে। সৌম্যও হতবাক।

দু'পাঁচ মিনিট চুপ করে থাকার পর অমিতাভবাবু বলেন, মায়া এই সিদ্ধান্তটা আগে নিলে ওর জীবন আরো আনন্দেরও হত, আরো সুখেরও হত।

সৌম্য জিজ্ঞেস করে, ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত কী মায়াদিই নিয়েছিল?

—হ্যাঁ, ভাই।

—কিন্তু কেন? আপনি কী অপরাধ করেছেন?

—অপরাধ করেছি কিনা বলতে পারব না, তবে একথা বলতে পারি, আমি ওর স্বামী হবার উপযুক্ত না, ওকে সুখী করতেও পারিনি।

—দাদা, কিছু যদি মনে না করেন, বলুন তো কি হয়েছিল।

অমিতাভবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, সৌম্য, চলো একটা রেঁস্তোরায় গিয়ে বসি। বড্ড খিদে পেয়েছে।

উনি একটু হেসে বলেন, আজ ভাত চাপাবার পর দেখি সিলিণ্ডারে গ্যাস নেই। তাই খেয়ে আসতে পারিনি।

সৌম্য সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলুন, আমরাই আপনাকে খাওয়াব।

তিথি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দাদা, আপনার বাড়িতে আর কেউ নেই?

—না, দিদি, এখানে আমরা দু'জনেই থাকতাম। আমার ছোট ভাই আছে ধানবাদে।

ঘর থেকে বেরিয়েই তিথি বলে, আপনার কোনো বোন নেই?

—আমার বোন গুয়াহাটিতে থাকে।

হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর সামনেই একটা রেস্তোরাঁয় ওরা ঢোকে। লাঞ্চ আওয়ার শুরু হতে এখনও দেরি আছে বলে রেস্তোরাঁয় বিশেষ লোকজন নেই। কোনার দিকে একটা টেবিলের দু'পাশে ওরা তিনজনে বসতেই সৌম্য বলে, দাদা, কী খাবেন? চাইনিজ নাকি.....

অমিতাভবাবু বলেন, হ্যাঁ, তোমরা আমাকে নিশ্চয়ই খাওয়াতে পার কিন্তু তোমাদের আমি খাওয়াবো।

তিথি বলে, দাদা, আমরা তো খেয়েদেয়েই অফিসে এসেছি।

উনি একটু হেসে বলেন, আমার মতো হতভাগা ছাড়া সবাই খেয়েদেয়ে অফিসে আসে। তবু বলছি, তোমরাও একটু কিছু খাও।

একটু থেমে বলেন, একলা একলা আমার খেতে ভাল লাগে না। মায়া বছর খানেক আগে চলে যাবার পর অনেকদিন একটু ভাত ফুটিয়ে নিতেও ইচ্ছা করেনি। আবার অনেকদিন রান্নাবান্না করেও একলা একলা খেতে পারিনি।

তিথি সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, দাদা, আমরাও খাব।

খাবার-দাবারের অর্ডার দেবার পর সৌম্য বলে, মায়াদি বিয়ের এত বছর পর এইরকম একটা চরম সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

অমিতাভবাবু একটু ম্লান হেসে বললেন, তোমার এ প্রশ্নের উত্তর মায়া দিতে পারেন! আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, ওর বাবা-মা আমাকে পছন্দ করেই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু বৌভাত-ফুলশয্যার দিন থেকেই আমি বুঝতে পারি, সে আমাকে চায় না।

তিথি অবাক হয়ে বলে, আপনি সেই দিনই বুঝতে পেরেছিলেন?

—হ্যাঁ, দিদি, বুঝতে পেরেছিলাম। তার কারণ সেই রাত্রে আমরা দু'জনে মুখোমুখি হবার পরই তোমাদের মায়াদি আমাকে বলে, বিয়ে করেছি ঠিকই কিন্তু আপনি আমাকে কোনোদিন বিরক্ত করবেন না।

—আশ্চর্য!

সৌম্য বলে, মায়াদি কী অন্য কাউকে ভালবাসতেন?

—তোমার এ প্রশ্নের জবাবও আমি দিতে পারব না। শুধু বলতে পারি, সে আমাকে কোনোদিনই ভালবাসতে পারেনি। আমিও জোর করে স্বামীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা রুচিসম্মত মনে করিনি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, এত বছর ধরে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করেছি বলেই তো আমাদের একটা সন্তানও হল না।

ওর কথা শুনে সৌম্য আর তিথি নির্বাক হয়ে যায়।

কয়েক মিনিট কেউই কোনো কথা বলে না। তারপর তিথি প্রশ্ন করে, দাদা, কত বছর আগে আপনাদের বিয়ে হয়েছিল?

—বারো বছর।

অমিতাভবাবু মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মায়ার বয়স তখন কুড়ি আর আমার উনত্রিশ।

এবার তিথি বলে, দাদা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

উনি হাসতে হাসতে জবাব দেন, আপনি আমাকে একটা কেন, হাজারটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন।

—হ্যাঁ, দাদা, সত্যি কয়েকটা কথা জানতে ইচ্ছা করছে।

—দিদি, আপনাদের অনেক কথাই বলতে পারি কিন্তু তার জন্য তো বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় চাই। আমার একটা অনুরোধ রাখুন আপনারা দু'জনে।

—বলুন।

অমিতাভবাবু এখটু হেসে বলেন, মায়া চলে যাবার ফলে আমি বেশ ভাল মাংস রান্না করতে শিখেছি। আপনি আর সৌম্য রবিবার সকাল সকাল আমার বাড়ি আসুন।আমার মজাদার বিবাহিত জীবনের সব কথাও বলব আর একসঙ্গে খাওয়া দাওয়াও করা যাবে।

উনি একট চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আপনারা এলে আমার এই নিরানন্দময় জীবনে অন্তত একটা দিন আনন্দে কাটবে।

কথাটার সঙ্গে এমন একটা বিষাদের সুর মিশে আছে যে তিথি সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি না জানিয়ে পারল না।

—কি সৌম্য, তুমি আসবে তো?

—নিশ্চয়ই আসব।

—তবে একটা কথা মনে রেখো, তোমাদের দু'জনকে যা বলব, তা যেন তোমাদের অফিসের কেউ না জানেন।

—না, না, কেউ জানবে না।

তিথি একটু চাপা হাসি হেসে প্রশ্ন করে, দাদা, আমাদের দু'জনকে আপনি কেন সব কথা খুলে বলবেন।

অমিতাভবাবুও একটু হেসে বলেন, সৌম্যকে প্রথম দিন থেকেই আমার ভাল লেগেছে। ও সত্যি আমাকে বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করে, আমিও ওকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালবাসি। আজ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনিও আমার আপনজন।

—শুধু আপনজন? ছোট বোন না?

—একশোবার আপনি আমার ছোট বোন।

—ছোট বোনের সঙ্গে কেউ আপনি আপনি করে কথা বলে?

অমিতাভবাবু এক গাল হেসে বললেন, সরি তিথি, আর কোনোদিন এ ভুল হবে না।

এবার উনি বাড়ির ঠিকানা ও পথ নির্দেশ ওদের দু'জনকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবার পরই ওরা তিনজনে বেরিয়ে আসেন। অমিতাভবাবু রাস্তা পার করেই হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এ যান আর ওরা দু'জনে পশ্চিম দিকে পা বাড়ায়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিথি বলে, অমিতাভদাকে যেমন ভাল লাগল, সেইরকমই দুঃখ হল। ওর চোখে-মুখে সততা ফুটে উঠেছে; আর কথাবার্তা শুনেই বেশ বোঝা যায়, উনি কত সৎ, কত ভাল।

—হ্যাঁ, অমিতাভদাকে আমারও খুব ভাল লাগে।

—এইরকম একজন মানুষকেও মায়াদি ভালবাসতে পারল না?

তিথি একটা চাপা দীর্ঘশ্ববাস ফেলে বলে, আমি মেয়ে হয়েও স্বীকার করতে বাধ্য, মেয়েরা যেমন ভাঙা সংসার জোড়া লাগাতে পারে, সবাইকে সুখী করতে পারে, আবার সেইরকমই মানুষকে দুঃখ দিতে, সব কিছু ছারখার করে দিতেও মেয়েদের জুড়ি পাওয়া যাবে না।

সৌম্য ওর কথা শুনে শুধু হাসে।

—হাসলেন কেন? আমি কি ঠিক বলিনি?

—এ সংসারে সব মেয়েরাই তো তিথি ব্যানার্জী হয় না।

—কেন ঠাট্টা করছেন?

—সত্যি ঠাট্টা করছি না।

সৌম্য মুহূর্তের জন্য থেমে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি বিয়ে করেও বিবাহিত জীবনের সব আনন্দ থেকেই বঞ্চিত কিন্তু তবু সব দুঃখ লুকিয়ে রেখে হাসি মুখে শ্বশুরমশাই ও জংলিকাকাকে সেবা-যত্নে রেখেছেন। সবার কি এই ঔদার্য বা ক্ষমতা থাকে?

—কে বলল, আমার দুঃখ আছে বা দুঃখ লুকিয়ে রাখি?

তিথি একটু হাসতে হাসতেই কথা বলে।

—অন্য কেউ না, আপনার দুটো চোখই সব কথা বলে দেয়।

—তাই নাকি?

—অবশ্যই।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল পাশে রেখে রাস্তা পার হয়েই তিথি বলে, আপনি আমার দুটো চোখ এত ভাল করে দেখলেন কবে?

—যখন যতবার আপনাকে দেখি, তখনই তো আপনার দুটো চোখ দেখি।

—আমি তো বুঝতে পারিনি।

—আমি তো চোখের ডাক্তার না যে আপনাকে জানিয়ে আপনার চোখ দেখব।

—তাহলে বলুন চুরি করে আমাকে দেখেন। কিন্তু আপনাকে দেখে তো বেশ গুডবয় মনে হয়।

সৌম্য একটু হেসে বলে, হাজার হোক আমি যুবক। তার উপর ব্যাচেলার। আপনার মতো পরমা সুন্দরীকে এত কাছে পেয়েও ভাল করে দেখব না, তা আপনি ভাবলেন কি করে?

তিথি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বলে, নিজের উদ্যোগে এলাম বলে অমিতাভদার মতো একজন ভাল মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। আপনার ভরসায় থাকলে বোধহয় কোনোদিনই এই মানুষটার সঙ্গে পরিচয় হত না।

—কোন দুঃখে আপনি আমার উপর ভরসা করবেন?

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সৌম্য বলে, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

—তর্ক আমি করি নাকি আপনি করেন?

—এ প্রশ্নের উত্তর দেব না। আগে বলুন, কবে আমাদের গ্রামে পদার্পণ করছেন? আপনারা না এলে আমি আর আপনাদের বাড়ি যাচ্ছি না।

—আপনি কি দাড়িপাল্লায় ওজন করে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেন?

—কখনোই না। কিন্তু আমি চারবার গেলে আপনাদের কি একবারও আমাদের বাড়িতে আশা করতে পারি না?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারেন।

তিথি মুহূর্তের জন্য একটু চিন্তা করে বলে. শুক্রবারই আপনাকে বলে দেব, আমরা শনিবার আসছি নাকি পরের সপ্তাহে আসছি। .'বিবার তো ওখানে যেতে হবে।

—অসংখ্য ধন্যবাদ।

—হ্যাংলার মতো জিজ্ঞেস করছি, দুপুরে দুমুঠো খেতে দেবেন তো?

—মেসোশাই আর জংলিকাকাকে নিশ্চয়ই খেতে দেব কিন্তু আপনি পাবেন না।

—আমার অপরাধ?

—যেদিন আমাদের হরিপালে আসবেন, সেদিন বলব।

ওরা অফিসে ঢুকতেই সবাই ওদের ঘিরে ধরলেন। সৌম্য পুরো ব্যাপারটা জানাতেই সবাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু মন্তব্য করলেন। প্রবীণরা বললেন, এসব আমরা ভাবতেও পারি না। বেঁচে থাকতে থাকতে আরো কত কি দেখব, তা ঈশ্বরই জানেন। মাঝবয়সীরা বললেন, আজকালকার মেয়েরা সব পারে। স্বামী তো দূরের কথা, কত মেয়ে নিজের সন্তানদের ফেলে এক ছোকরার সঙ্গে চলে যাচ্ছে।

মেয়েরাও চুপ করে রইলেন না। কেউ বললেন, আগেকার দিনে মেয়েরা বিশেষ লেখাপড়া শিখত না, চাকরি-বাকরি করত না বলেই বাধ্য হয়ে শ্বশুরবাড়ির সব অত্যাচার সহ্য করত কিন্তু এখনকার মেয়েরা তা কেন সহ্য করবে?

একজন বললেন, এক হাতে তো তালি বাজে না। বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে কোনো মেয়েই বিয়ের দশ-বারো বছর পর ডিভোর্স করে না।

দু'একজন এই কথা বলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, যে মায়া তাদের পর্যন্ত কিচ্ছু বলেনি। কিছু রহস্য না থাকলে মায়া এভাবে লুকোবে কেন?

বড়দা শুধু বললেন, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার তৃতীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সঠিক বিচার করা সম্ভব না। মোট কথা ব্যাপারটা খুবই দুঃখের।

সুখেনবাবু গম্ভীর হয়ে বলে, বড়দা, প্লিজ একটু ভগবানকে ডেকো।

বড়দা ফাইলে নোট লিখতে লিখতেই বলেন, কেন?

—বাড়ি ফিরে যেন অসামান্যা সুন্দরী, কল্পনাতীত গুণসম্পন্না আমার হৃদয় সম্রাজ্ঞীকে দেখতে পাই।

উনি একই নিঃশ্বাসে বলেন, এখন থেকেই বাকি জীবন একটা পাশবালিশ নিয়ে কাটাতে পারব না।

ওর কথায় সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল।

শুক্রবার না, পরের দিন বৃহস্পতিবারই তিথি অফিস ছুটির পর বাইরে বেরিয়েই সৌম্যকে বলল, আমরা শনিবার আসছি।

—রিয়েলি!

—ইয়েস স্যার, উই আর কামিং। তিথি-মৃত্তিকা-হিন্দোলবাবুরা বাড়ি থাকবে তো?

—আপনারা আসছেন শুনলে ওরা বোধহয় শুক্রবারও স্কুল-কলেজ যাবে না।

একটু চুপ করে থাকার পর তিথি বলে, ওরা সত্যি আমাকে ভালবাসে, তা আমি বুঝেছি। তাই মনে হয়, ওরা বোধহয় আমাকে উপবাস করতে দেবে না।

—কিন্তু ওরা তো আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাবে না।

—তা হয়তো যাবে না কিন্তু ওরা তো আমার ব্যাপারে আপনার মতো নির্মম বা উদাসীনও হতে পারবে না।

সৌম্য একটু হেসে বলে, খুবই কঠিন সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান শুধু ঐতিহাসিক হরিপালের ঐতিহ্যমণ্ডিত চৌধুরি পাড়ার কুরুক্ষেত্রেই হতে পারে।

সন্ধের পর বাড়ি ফিরে বারান্দায় উঠেই সৌম্য চিৎকার করে, তিথি-মৃত্তিকা-হিন্দোল, শিগ্‌গির আমার ঘরে এসো।

ঠিক রামচন্দ্রের বানর সেনাদের মতোই অন্ধ ভক্ত তিন ভাইপো-ভাইঝি সৌম্য ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই হাজির। অভাবনীয় কোনো সুসংবাদের প্রত্যাশায় তিনজনেই চাপা উত্তেজনায় মনে মনে টগবগ করছে। হিন্দোল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে, ভাল কাকু, আমাদের জন্য কী এনেছ?

মৃত্তিকা সঙ্গে সঙ্গে ওকে একটু শাসন করে, আঃ! ভাইমণি! আগে দ্যাখ ভাল কাকু কি বলে।

সৌম্য কাঁধের ব্যাগ টেবিলের উপর রেখে গায়ের জামা খুলে খাটের উপর বসেই হিন্দোলকে কোলে বসায়। তিথি-মৃত্তিকা সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশে বসে।

এবার সৌম্য আস্তে আস্তে বলে, যেদিন তোমাদের জামা টামা কিনতে কলকাতায় গিয়েছিলাম, সেদিন এক দাদুর বাড়ি গিয়েছিলাম.....

এইটুকু শুনেই হিন্দোল বলে, সেই তো ভালদাদুর গাড়ি চড়ে মোহনবাগান মাঠ-ভিক্টোরিয়া.....

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। সেই দুই দাদু আর সুন্দরী কাকিমা পরশু দিন

আমাদের বাড়ি আসবেন।

তিথি আর মৃত্তিকা একসঙ্গে বলে, ভেরি গুড নিউজ!

হিন্দোল বলে, আমি সারাদিন গাড়িতে থাকব।

সৌম্য দুই ভাইঝিকে বলে, মা, সব দায়িত্ব তোদের দু'জনের উপর। দেখিস, ওরা যেন সারাদিন ভালভাবে কাটাতে পারেন।

তিথি বলে, তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। 'আমারা দুই বোন সব ম্যানেজ করব।

—খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা....

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই তিথি বলে, এ ব্যাপারেও তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। এটা মা-ছোটমা-র ব্যাপার। তারপর আমরা তো আছি।

মৃত্তিকা বলে, ভাল কাকু, আর কিছু বলবে?

—না, আর কি বলব!

তিথি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চল, চল, আগে সবাইকে এই ভাল খবরটা জানাই।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজনে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যায়। দু'চার মিনিটের মধ্যেই দুই বৌদি সৌম্যর ঘরে এসে হাজির। ওরা কিছু বলার আগেই সৌম্য আপন মনে বলে, ঠাকুরপো, সত্যি কি ওরা পরশু আসবেন?

দুই বৌদিই হেসে ওঠেন। কাবেরী দেবী এক ধাপ এগিয়ে বলেন, আমাদের মতো গুরুজনদের সঙ্গে এভাবে ঠাট্টা করলে একটি চড় খাবে।

—তুমি যখন আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছো আর আমিও তোমার প্রেমের বন্যায় ভেসে প্রায় দামোদরের কাছে পৌঁছে গেছি, তখন দু'একটা চড় নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার।

ঠিক সেই সময় তিথি তিন কাপ চা নিয়ে হাজির।

—কাবেরী দেবী, দ্যাখো দ্যাখো, কে আমাকে ভালবাসে, কে আমার সুখ-দুঃখ বোঝে! শুধু শুধু কি আমি এদের তিনজনকে এত ভালবাসি।

তিথি সৌম্যর হাতে চায়ের কাপ দিয়ে বলে, লিকার রেডি ছিল, আমি শুধু দুধ-চিনি মিশিয়ে আনলাম।

—ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। কোনো জন্মে শুনিনি, একজন লিকার করে, অন্যজন দুধ-চিনি মেশায়।

এইসব হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই কথা হয়। তিথি, ব্যানার্জী সাহেব আর জংলিকাকু আসছেন শুনে ওরা দু'জনেই খুব খুশি।

কাবেরী বলে, ছেলেমেয়েদের কাছে তোমাদের তিথির প্রশংসা এতবার শুনেছি যে ওকে দেখার জন্য ছটফট করছিলাম। যাক, এবার ওকে দেখতে পাব ভেবেই ভাল লাগছে।

—ওরা কি শুধু তিথিরই প্রশংসা করেছে? ব্যানার্জী সাহেব আর জংলীকাকার প্রশংসা করেনি?

—হ্যাঁ, ঠাকুরপো, ওরা ঐ দুই দাদুরও খুবই প্রশংসা করেছে।

—তাহলে শুধু তিথির কথা কেন বলছিলে? মেসোমশাই আর জংলিকাকার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলে তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

ছায়া বলেন, আমি তো তিনজনের সঙ্গেই আলাপ করব বলে হাঁ করে বসে আছি। তবে তোমাদের ঐ জংলিকাকাকে দেখতে পাব ভেবে খুব ভাল লাগছে।

সৌম্য বলে, হ্যাঁ, বড়বৌদি, জংলিকাকার মতো একজন মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হওয়া সত্যি সৌভাগ্যের বিষয়। মেসোমশাই আর তিথি যে ওকে কী ভালবাসেন আর শ্রদ্ধা করেন, তা দেখে অবাক হয়ে যাবে।

ছায়া হাসতে হাসতে বলেন, আমাদের হিন্দোলবাবু তো ভালদাদুর হনুমান ভক্ত হয়ে গেছে।

—ওকে গাড়ি করে এতকিছু দেখালে ভক্ত হবে না?

শুক্রবার অফিস থেকে ফিরে সৌম্য ছায়াকে বলল, বড়বৌদি, কাল ওরা এগারোটা-সাড়ে এগারোটার মধ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করবেন।

—ওরা কি ট্রেনে নাকি গাড়িতে আসবেন?

—তিথিদেবী যখন রাস্তাঘাটের ডিরেকশন জেনে নিলেন, তখন নিশ্চয়ই গাড়িতে আসবেন।

—তার মানে তো ওরা খুব সকাল সকালই রওনা হবেন।

কাবেরী পাশে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করল, দিদি, ওদের সকালবেলার জলখাবারেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

—সে তো করবই।

যে তিথি-মৃত্তিকাকে অন্তত আধঘণ্টা ধরে মাথায় মুখে হাত দিয়ে সৌম্য সেবা করার পরই ওদের চোখ খোলে, সেই তারাই ছ'টা বাজতে না বাজতেই শনিবার তাদের ভাল কাকুকে ঘুম থেকে তুলে দেয়।

তিথি বলে, ভাল কাকু, তুমি নিচে গিয়ে চা খাও। আমরা ঘরটা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করব।

—আমার ঘর তো ঠিকই আছে। আবার কী করবি?

—অত কথা বলার সময় নেই আমার। তুমি প্লিজ নিচে যাও।

মৃত্তিকা একটু হেসে বলে, আমাদের ঘর দেখলেই বুঝবে দিদি কত ভাল ইন্টিরিয়র ডেকরেটর।

তিথি সঙ্গে সঙ্গে ওকে শাসন করে, বাজে বক বক না করে চটপট দুটো বুক শেলফ-এর বই পত্তরগুলোর ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার কর।

সৌম্য কোনো কথা না বলে পাশের ঘরে পা দিয়েই মুগ্ধ হয়ে যায়। মনে মনে বলে, মণিপুরি বেডকভারগুলো কবে কিনেছিলাম, তা'ও তো ভুলে গেছি। মেয়েরা সেগুলো এত বছর ধরে এত যত্ন করে রেখে দিয়েছিল? সত্যি মণিপুরি বেডকভার, টেবিল ক্লথ আর জানলা-দরজার পর্দাগুলো ঘরের চেহারা আকাশ-পাতাল বদলে দিয়েছে।

ও নিচে গিয়েই দুই বৌদি আর মাকে বলে, তোমরা একবার মেয়েদের ঘরটা দেখে এসো। তিথির রুচি দেখে অবাক হয়ে যাবে।

সৌম্য চা খেতে খেতেই ওরা তিনজনে উপর থেকে ঘুরে আসেন। সকলের মুখেই হাসি। সরলাবালা গর্বের হাসি হেসে বলেন, আমার তিথিয়া দিদিকে একজন বেশ নাম করা আর্টিস্টের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।

ছায়া একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, মা, ভুলে যাচ্ছেন কেন আপনার তিথিয়া দিদি একজন নাম করা লেখকের শিষ্যা?

কাবেরী বলে, তিথি এত ভাল হচ্ছে যে ওকে সত্যিকারের একটা ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতেই হবে।

সৌম্য গম্ভীর হয়ে বলে, ঠিক সময় ঠিক ছেলের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। ঠাকুরপোর সঙ্গে প্রেম করবে বলে আরেকজনের গলায় ও মালা দেবে না।

কাবেরী সঙ্গে সঙ্গে ওর একটা কান মলে দিয়েই শাশুড়িকে বলে, মা, আপনার এই ছোট ছেলেটাকে একটু শাসন করুন। এযে দিন দিনই অধঃপাতে যাচ্ছে।

ছায়া বলেন, মা কেন ঠাকুরপো-বৌদিদের ব্যাপারে নাক গলাবেন রে? তোদের দু'জনের ব্যাপার তোরাই মিটিয়ে নে।

মৃত্তিকা কি কারণে নিচে আসতেই সৌম্য জিজ্ঞেস করে, আমার ঘরের কাজ শেষ হয়েছে।

হন হন করে চলে যেতেই ও জবাব দেয়, না, না, হয়নি। এখন দরজা বন্ধ আছে।

এক মিনিটের মধ্যেই মৃত্তিকা আবার ঐ রকম ঝড়ের বেগেই দোতলায় উঠে গেল।

একটু পরেই বৃদ্ধ মনোরঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সবাইকে শুনিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, এখনই আদরিনী এসে জানিয়ে গেল, ললিতা সখী হুকুম করেছে, আমাকে এখুনি বাথরুম যেতে হবে।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, সবে খবরের কাগজখানা হাতে নিয়েছি,

এখনই আমি বাথরুম যাই কী করে?

সরলাবালা বলেন, আজ ও যা বলছে, তাই করো।

—যাব, যাব ; অন্য দিনের চাইতে আজ একটু আগেই চান-টান করে নেব।

পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে তিথি নিচে নেমে এসেই সৌম্যকে বলে, ভাল কাকু, তুমি উপরে যেতে পার।

এবার ও ছায়া ও কাবেরীর দিকে তাকিয়ে বলে, মা-ছোটমা, তোমাদের আলমারির চাবি দাও।

কাবেরী নিঃশব্দে আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে দিলেও ছায়া জিজ্ঞেস করেন, আলমারির চাবি দিয়ে কী হবে?

—দরকার আছে।

না, শুধু উনি না, একে একে এ বাড়ির প্রত্যেককেই ওর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। নিচের ঘরদোর পরিষ্কার করার পরই তিথি সবাইকে বলে, প্রত্যেকের জামাকাপড় বের করে রেখেছি। বাথরুম থেকে বেরিয়েই ঐ জামাকাপড় পরে নিও।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠেও নেমে এসে তিথি বলে, মা-ছোটমা, প্লিজ ন'টার মধ্যে সবাইকে ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিও।

ও উপরে উঠে যেতেই সৌম্য বলে, এই ত চাই! একেবারে ক্ষুরধার তরবারি!

ছায়া বলেন, এ তো দেখছি আরেক ইয়া ইয়া খান! এক নম্বরের ডিক্টেটর!

—বড় বৌদি, সমাজ-সংসারে নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলা রাখতে হলে এই রকমই ছেলেমেয়ে চাই।

—তুমি তো ওদের কোনো অন্যায়ই দেখতে পাও না।

সৌম্য একটু গম্ভীর হয়েই বলে, বড় বৌদি, ওরা যদি কোনো অন্যায় করে আমাকে বলো। মেয়ে দুটো তোমার পেটে জন্মালেও সেই পাঁচ-ছ' বছর বয়স থেকেই আমি ওদের দেখাশুনা করছি। আমি যতদূর জানি, ওরা কোনো অন্যায় করে না।

—তুমি বড্ড বেশি ওদের ভালবাস। তাইতো ওরা ভুল করলেও তুমি দেখতে পাবে না।

—বড় বৌদি, কোন মানুষ ভুল করে না বলতে পার? ওরা ভুল করতে পারে, কিন্তু কোনোদিন কোন অন্যায় করবে না। তা আমি জানি।

কাবেরী এতক্ষণ পর বলে, দিদি, আমিও ঠাকুরপোর মতো বিশ্বাস করি, ওরা ভুল করলেও অন্যায় করবে না।

দশটা নাগাদ তিথি নিউ মার্কেট থেকে কেনা সালোয়ার কামিজ পরে কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে সৌম্যর ঘরে ঢুকে বলল, ভাল কাকু, আমি একটু বেরুচ্ছি। ঠিক সময় এসে যাব।

—তুই এখন বেরুলে তো সব গণ্ডগোল হ য় যাবে।

—কিচ্ছু হবে না।

—তুই এখন কোথায় যাচ্ছিস?

—এখন বলব না। পরে বলব।

খানিকক্ষণ পর সৌম্য নিচে নামতেই ছায়া জিজ্ঞেস করলেন, ঠাকুরপো, তিথি গেল কোথায়?

—একটু জরুরি কাজ আছে বলল।

—এখন ওর বেরুবার সময় হল? যদি এর মধ্যে ওরা এসে পড়েন?

—ও ঠিক সময় এসে যাবে।

হিন্দোল সাড়ে দশটা থেকেই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে। কখন ভাল দাদু গাড়ি নিয়ে আসবে, সেই আশায় ও এক পা নড়ছে না।

এগারোটা বাজতেই সরলাবালা বললেন, তিথিয়া দিদি তো এখনও ফিরল না।

শান্ত মেয়ের ব্যাপারে কখনোই কিছু বলেন না। তিনিও হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, মেয়েটা এই সময় আবার কোন বন্ধুর বাড়ি গেল, তা কে জানে?

ঠিক সেই সময় হিন্দোল পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠে, আসছে! আসছে!

ছায়া, কাবেরী আর সৌম্য বারান্দা থেকে নিচে নামতে না নামতেই ও আবার চিৎকার করে ওঠে, বড়দিভাই ভাল দাদুর পাশে বসে আছে।

বাড়ির দরজায় গাড়ি থামতেই বড় তিথি নেমে এসে দু'হাত দিয়ে হিন্দোলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, হিন্দোলবাবু, সুন্দরী কাকিমাকে ভুলে গিয়েছ তো?

—মোটেও না।

এবার উনি ছায়া আর কাবেরীকে প্রণাম করে বলেন, বড় বৌদি-ছোট বৌদি, আমিও এক তিথি।

দু'জনেই একসঙ্গে বলেন, সে কথা আর বলে দিতে হবে না।

মিঃ ব্যানার্জী গাড়ি থেকে নামতেই ওরা তিনজনেই ওকে প্রণাম করে।

উনি ওদের আশীর্বাদ করেই বলেন, তোমরাও তো আমার মেয়ে। আমি তোমাদের নাম ধরে ডাকব।

ছায়া বলেন, একশ'বার নাম ধরে ডাকবেন।

সৌম্য বলে, জংলীকাকা, গাড়িতে বসে আছেন কেন? নেমে আসুন।

—তোমরা সাহেব আর বৌমাকে নিয়ে ভিতরে যাও। আমি আসছি।

সরলাবালা বড় তিথিকে দেখেই বলেন, তুমি তো সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী! তোমাকে দেখে যে চোখ ফেরানো যায় না।

পাশেই সৌম্যর বাবা-দাদারা দাঁড়িয়ে। তাই লজ্জায় ও কোনো কথা বলতে না পারলেও ছোট তিথি বেশ গলা চড়িয়েই বলে, আমরা কী শুধু শুধু সুন্দরী কাকিমা বলি?

ব্যানার্জী সাহেব মনোরঞ্জনবাবুকে প্রণাম করতে যেতেই বাধা পান। উনি প্রণাম না করে সোজা দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলেন, দাদা, আপনি আমার চাইতে এগারো বছরের বড় আর বৌদি তিন বছরের বড়। এসব হিসেব-নিকেশ না জেনে কি দিবাকর ব্যানার্জী শুধু শুধু মাথা নোয়াচ্ছে?

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয় প্রণামের পর্ব শেষ হতেই ব্যানার্জী সাহেব ওর পুত্রবধূকে বললেন, মা জননী, তুমি যার সঙ্গে খুশি গল্প কর। আমি এখন দাদা-বৌদির সঙ্গে গল্প করব। আমাকে ডিসটার্ব করবে না।

—বাবা, ভয় দেখাবেন না। আমিও এখন দাদা-ছোড়দার সঙ্গে গল্প করব। আপনিও হরদম 'মা জননী' 'মা জননী' করে ডেকে আমাকে ডিসটার্ব করবেন না।

ওর কথায় সবাই হাসেন।

মৃত্তিকা বলে, সুন্দরী কাকিমা, আগে আপনি আমাদের ঘরে চলুন।

—তোমাদের তিন ভাইবোনের সঙ্গেই তো সারাদিন কাটাব বলে এসেছি। আগে একটু দাদা-ছোড়দার সঙ্গে গল্প করি।

ছায়া বলেন, আগে তোমরা তিনজনে একটু কিছু মুখে দাও। তারপর.....

—জংলীকাকা থাকতে আমরা এতক্ষণ না খেয়ে আছি, ভাবলেন কী করে? এখন আমরা কেউই কিচ্ছু খাব না।

ব্যানার্জী সাহেব বললেন, ছায়া মা, এখন সত্যি আমরা কিচ্ছু খেতে পারব না।

ছায়া বলেন, আপনার সেই কোন সকালে বাড়ি থেকে.....

—না, মা, বাড়ি থেকে আমরা খেয়ে আসি নি। পথে আমরা খেয়েছি।

ছোট তিথি পাশে এসে বলে, মা, ভাল দাদু তোমাকে ডাকছেন।

—উনি কোথায়?

—ঐ তো ডাইনিং রুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ছায়া মেয়েকে আর কাবেরীকে সঙ্গে নিয়ে ডাইনিং রুমে যেতেই জংলীকাকা বড় বড় দুটো হট কেস ওর হাতে দিয়ে বলেন, বড় বৌমা, আমি একটু রান্না-বান্না করতে ভালবাসি। তাই তোমাদের জন্য একটু রান্না করে এনেছি। রাগ করো না মা!

—তাই বলে দুটো হট কেস ভর্তি.....

—মা, এত অবাক হবার মতো কিছু আনিনি।

কাবেরী বলে, জংলীকাকা, দিদিও তো সবার জন্য রান্না করেছেন। তারপর আপনি এত এনেছেন.......

ছোট তিথি বলে, তোমরা না খাও ভাল দাদুর রান্না আমরা তিন ভাইবোন তিন দিন ধরে খেয়ে শেষ করে দেব।

জংলীকাকা এক গাল হেসে বলেন, ব্যস! এক মিনিটে সব সমস্যার সমাধান। নাতি-নাতনিরা ছাড়া আমাদের সমস্যা কেউ সামলাতে পারে না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, চল তিথি দিদি, আমি তোমাদের তিন ভাইবোনকে নিয়ে গ্রামটা এক চক্কর ঘুরে আসি।

ছোট তিথি ওর হাত ধরে বলে, চলুন, ভাল দাদু, আমরা ঘুরে আসি।

—মৃত্তিকা দিদি আর হিন্দোলবাবু কোথায়?

—ওরা নিশ্চয়ই গাড়ির মধ্যে বসে আছে।

ওরা চলে যেতেই ছায়া কাবেরীকে বলেন, দ্যাখ তো জংলীকাকা কী এঁনেছেন।

প্রথম হট কেস খুলে দেখেশুনে ও বলে, এটাতে শুধু বিরাট বিরাট গলদা চিংড়ির মালাইকারী।

ছায়া একটু হেসে বলেন, এবার ওটা দ্যাখ।

দ্বিতীয় হট কেস দেখে কাবেরী বলে, এটাতে কাটলেট আছে, কিন্তু কিসের কাটলেট, তা বুঝতে পারছি না।

—এক টুকরো মুখে দিয়ে দ্যাখ না।

কাবেরী একট টুকরো মুখে দিয়ে বলে, দিদি, তুমিও একটু মুখে দাও। দারুণ সুন্দর চিংড়ির কাটলেট।

—দেখে তো মনে হলো অন্তত তিরিশ-চল্লিশটা আছে। এক টুকরো কেন? দু'জনে দুটো খাই।

কাটলেটের এক টুকরো মুখে দিয়েই ছায়া বলেন, সত্যি খুব সুন্দর!

খেয়েদেয়ে কাবেরী বলে, দিদি, চল, তিন ভাইকে তিনটে কাটলেট খাইয়ে আসি।

—তিথিও তো ওদের ওখানে আছে। ওকে দিবি না?

—নিয়ে যাচ্ছি, যদি খায়, খাবে।

দুই দাদার সঙ্গে বড় তিথি জমিয়ে গল্প করছিল। এমন সময় দুই বউ কাটলেটের প্লেট নিয়ে হাজির।

ছায়া একটু হেসে বলেন, আচ্ছা তিথি, কলকাতার সমস্ত বাজারে যত চিংড়ি মাছ পাওয়া গেছে, সবই তোমরা কিনেছিলে?

—বড় বৌদি, বিশ্বাস করুন, এসব জংলীকাকার ব্যাপার। আমি আর বাবা গাড়িতে আসতে আসতে জানতে পারলাম।......

শান্ত বলে, কিন্তু তিথি, টাকা তো তুমি বা মেসোমশাই দিয়েছে। তোমরা কিচ্ছু জান না, তা কী করে হয়।

—দাদা, বাবার আর আমার সই করা চেক বই জংলীকাকার কাছেই থাকে। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক সবকিছুই উনি সামলান। আমরা কোনো কিচ্ছু জানতেও পারি না।

—উনি এত বিশ্বাসী?

কাবেরী বলে, দাদা আপনি জানেন না, জংলীকাকাকে তিথি ঠিক দেবতার মতো ভক্তি করে, ভালবাসে।

ছায়া বলে, আমাদের তিনটে ছেলেমেয়ে একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য ওকে কাছে পেয়েই এমন অন্ধ ভক্ত হয়ে গেছে যে ভাবা যায় না।

কাবেরী বলে, উনি তো ওদের ভাল দাদু আর মেসোমশাই হচ্ছেন নতুন দাদু!

এত কথার পর বড় তিথি বলে, জংলীকাকাকে দেখার আগে জানতাম না, এমন সাধারণ মানুষ এত ভাল হয় বা গুণী হয়।

পবিত্র একটু হেসে বলেন, উনি যে গুণী তা এই কাটলেট খেয়ে স্বীকার করতেই হবে।

ছায়া বলেন, দুপুরবেলায় খেতে বসে আরো একটা সারপ্রাইজ আছে।

পবিত্র বলে, বৌদি, কী.....

বড় তিথি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দাদা, জংলীকাকার গাড়ির আওয়াজ শুনলাম। আমি গেটের কাছে যাই। ওকে এনে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

—তুমি একলা কেন যাবে? দাঁড়াও, পাশের ঘব থেকে সমুকে ডেকে দিই।

কাবেরী বলে, দাদা, আপনাকে যেতে হবে না। আমি ঠাকুরপোকে নিয়ে তিথির সঙ্গে যাচ্ছি।

ওরা তিনজনে দরজার সামনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই জংলীকাকা গাড়ী থামালেন। সবার আগে ছোটতিথি গাড়ি থেকে নেমেই কাঁধের ঝোলা থেকে ক্যামেরা বের করেই ভাল দাদুর সম্বর্ধনার ছবি তুলতে শুরু করায় সবাই অবাক।

জংলীকাকা গাড়ি থেকে নেমেই হাসতে হাসতে বলেন, তিথি দিদি, আমি কি ভি-আই-পি যে তুমি সাহেবের ছবি তোলার আগেই আমার ছবি তুলছো?

—আপনি আমাদের তিন ভাইবোনের হিরো!

কাবেরী ওর হাত ধরে বলে, আসুন। বাড়ির সবাই আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য হাঁ করে বসে আছেন।

জংলীকাকাকে নিয়ে ওরা সবাই বারান্দায় উঠতে না উঠতেই সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ব্যানার্জীসাহেব সৌম্যর মা-বাবাকে দেখিয়ে ওকে বলেন, এই হতভাগা, দাদা-বৌদিকে প্রণাম কর।

জংলীকাকা ওদের প্রণাম করতেই ব্যানার্জীসাহেব হাসতে হাসতে বলেন, পুলিশের চাকরি থেকে রিটায়ার করলাম কিন্তু হতচ্ছাড়া চোরের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছি না।

জংলীকাকা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে সরলাবালাকে বলেন, জানেন বৌদি, এককালে চুরি করতাম বলেই সাহেবের এত ভালবাসা পাচ্ছি।

—তোকে কচু ভালবাসি!

—বৌদি, সাহেবকে বলুন তো পকেট থেকে একটা টাকা বের করতে। সাহেবের পকেট গড়ের মাঠ।

উনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের পকেটে হাত দিয়ে এক বাণ্ডিল নোট বের করে বলেন, আর এই দেখুন আমার পকেটে কত টাকা। সাহেবের আর বৌমার আলমারির চাবিও তো আমার প্যান্টের পকেটে।

ছোট তিথি পটাপট ছবি তুলতে তুলতে একটু থেমে বলে, ভাল দাদু, আপনার কাছে নতুন দাদু আর সুন্দরী কাকিমার টাকাকড়ি-গহনাগাটি-সই করা ব্যাঙ্কের চেক বই থাকে বলেই তো আপনার সঙ্গে এত ভাব করেছি।

ওর কথায় সবাই হাসেন।

ছায়া বলেন, জংলীকাকা, আপনার সাহেব শ্বশুর-শ্বাশুড়ি-ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প করছেন, আপনার বৌমা দুই দাদার সঙ্গে কথা বলছে বলে আমরা দুটো বউ বোবা হয়ে বসে আছি। চলুন, আপনি আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেবেন।

জংলীকাকা বলেন, তুমি তো এই সরকারের প্রাইম মিনিষ্টার। তোমার সঙ্গে থাকাই তো ভাল।

জংলীকাকাকে নিয়ে ওরা চলে যেতেই ব্যানার্জীসাহেব একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বুঝলে শান্ত, দীর্ঘ কর্মজীবনে সামান্য সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার থেকে অ্যাডিশনাল আই-জি হয়ে কত লক্ষ বিচিত্র মানুষের দেখা পেয়েছি, তা বলতে পারব না। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য এই জংলীর মত মানুষ আমি দেখিনি।

চারপাশের সবাই চুপ।

—শান্ত, জীবনে একটা চরম সত্য উপলব্ধি করেছি। যারা ভালবাসা পায় না, তারাই সংসারে খারাপ হয়। জংলীর মত পাকা চোরকে ভালবেসে, ষোলো আনা বিশ্বাস করে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ঠকিনি।

ওর পুত্রবধূ বলেন, জানেন দাদা, আমাদের বাড়ির দোতলায় পাশাপাশি দুটো ঘর। তার একটাতে আমি থাকি, অন্যটায় জংলীকাকা।....

ব্যানার্জী সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আমার মা জননী পরমা সুন্দরী ও যুবতী। জংলী ছাড়া কাকে ওর পাশের ঘরে থাকতে দেব?

মৃত্তিকা ওর একটা হাত ধরে বলে, নতুন দাদু, এবার আপনি আমাদের ঘরে চলুন। আমরা আপনাদের টেনে আনলাম আর আপনি এই দুটো বুড়ো-বুড়ীর সঙ্গে বকবক করছেন?

ব্যানার্জী সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, হ্যাঁ ছোড়দি, সত্যি তোমরা আমাকে টেনে এনেছ। এই বুড়ো-বুড়ীদের সঙ্গে বকবক করা অন্যায় হয়েছে।

ওরা চলে যেতেই বড় তিথি শান্ত-পবিত্রকে বলে, দাদা-ছোড়দা, আমি একটু মাসীমা-মেসোমশায়ের ঘরে যাই?

শান্ত বলেন, হ্যাঁ যাও।

পবিত্র বলে, আমাদের যে আলোচনা হচ্ছিল, তা তো একদিনে শেষ হবার না। সুতরাং যাবে ছাড়া কী করবে।

—এর পর একদিন সারাদিন ধরে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব।

শান্ত বলেন, আর কি তুমি আসবে?

—আপনি আসতে বললে নিশ্চয়ই আসব।

—বড়দা বলে যখন ডেকেছ তখন ছোট বোনকে আসতে বলব না, তাই কখনো হয়!

বড় তিথি এক গাল খুশির হাসি হাসে।

সরলাবালা ওর একটা হাত ধরে বলেন, এসো মা।

ঘরে ঢুকেই উনি আবার বলেন, সমুর কাছে শুনেছিলাম, তুমি ওদের অফিসে কাজ কর। ও তোমার চাইতে তোমার শ্বশুরমশাই আর জংলীকাকার কথাই বেশি বলেছে। তিন নাতি-নাতনিই তোমার কথা বললেও বড় নাতনির কাছে তোমার রূপ-গুণের প্রশংসা শুনতে শুনতে তোমাকে না দেখে আর থাকতে পারছিলাম না।

—ওর তো বয়স বেশি না। তাই একটু বাড়াবাড়ি করে বলেছে।

—তা বোলো না মা। ওর বয়স বেশি না হলেও যেমন বুদ্ধিমতী, সেই রকম বিচক্ষণ মেয়ে। অনেক হিসেব-নিকেশ করে ও কথা বলে।

মনোরঞ্জন বলেন, জানো মা, বড় বৌমা নাতনিদের পেটে ধরলেও ওরা পাঁচ-ছ' বছর বয়স থেকেই আমার ছোট ছেলের কাছে থাকে। ও নিজের মনের মতো করে ওদের গড়ে তুলেছে।

—হ্যাঁ, শুনেছি।

সরলাবালা বলেন. আমার নাতনিরা তো তাদে্র কোনো প্রয়োজনের কথা মা-বাবাকে বলে না। ওদের যত কিছু দরকার-অদরকার আবদার প্রাইভেট কথা—সবকিছুই ভাল কাকুকে বলবে।

—হ্যাঁ, সে কথাও ওরা আমাকে বলেছে।

মনোরঞ্জন বলেন, নাতনিরা যে ভাল হয়েছে, তার ষোলো আনা কৃতিত্ব সমুর।

এবার সরলাবালা প্রশ্ন করেন, তুমি কি জানো, সুম খুব ভাল গল্প লেখে। সব বড় বড় কাগজেই ওর লেখা ছাপা হয়।

—হ্যাঁ জানি, উনি লেখেন। ওর লেখাও আমি পড়েছি।

—ওর লেখা তোমার কেমন লাগে?

—বেশ ভাল লাগে। বাবাও ওর লেখা খুব পছন্দ করেন।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, উনি বড্ড কম লেখেন। ওর আরো বেশি লেখা উচিত।

মনোরঞ্জন বলেন, বারো-তেরো ঘণ্টা বাড়ির বাইরে থাকলে ছেলেটা লিখবে কখন?

—মেসোমশাই, তা বললে হবে না। ওর যখন ক্ষমতা আছে, তখন কেন আরো লিখবেন না?

বড় তিথি একটু থেমেই বলে, আমার তো মনে হয়, উনি যদি সিরিয়াসলি লেখালেখি করেন, তাহলে এক কালে সত্যি নাম করবেন।

—আমাদের সঙ্গে তো ও কথাবার্তা বলারই সময় পায় না। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, নাতি-নাতনিরাই ওকে ঘিরে থাকে।

সরলাবালা বলেন, তোমার সঙ্গে রোজই দেখা হয়। তুমিই ওকে বলো।

—উনি আমার কথা শুনবেন কেন?

—কেন শুনবে না? তুমি তো ওর ভালর জন্যই বলবে।

মনোরঞ্জন বলেন, হ্যাঁ, মা, তুমি একটু বলো। তাহলে ও ঠিকই লিখবে।

—আপনারা যখন বলেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই বলব কিন্তু উনি আমার অনুরোধ রাখবেন কিনা কে জানে।

সৌম্য এতক্ষণ উপরে কাটিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকতেই জংলীকাকা বলেন,

তোমরা অনেক ভাগ্য করে এই দুটো বউকে এ বাড়িতে আনতে পেরেছ।

—জংলীকাকা, আমরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করি, অনেক ভাগ্য করে আমরা বড় বৌদিকে পেয়েছি কিন্তু অন্য বউটি সম্পর্কে এমন কথা আমি বলতে পারি না।

এই কথা শুনে জংলীকাকা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সৌম্য বলে যায়, বাড়ির সবাই অবশ্য অন্য বউয়েরও প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিন্তু আমি তো জানি, উনি কি মতলবে এ বাড়িতে এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কাবেরী ওর চুলের মুঠি ধরে বলে, পিঠে দুটো দুম দাম.....

—জংলীকাকা, আপনি যার প্রশংসা করলেন, তার আসল রূপ নিজের চোখেই দেখুন।

উনি একটু হেসে বলেন, সৌম্য, ভাগ্য ভাল না হলে কী তোমাদের এই মধুর সম্পর্ক হয়?

—ভাগ্য ভাল? আপনি বলছেন কী? এ তো ইমার্জেন্সির ইন্দিরা!

ঠিক সেই সময় বড় তিথি ও ঘরে পা দিয়েই বলে, কে ইমার্জেন্সির ইন্দিরা?

সৌম্য বলে, এই যে আমাদের কাবেরী! এখুনি উনি আমার চুলের মুঠি ধরে.....

—যাক, শুনে খুশি হলাম।

—খুশি?

—হ্যাঁ, খুশি। এ বাড়ির সবাই তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যতদিন না বউ আসছে, ততদিন শাসন করার জন্য তো একজন চাই।

কাবেরী উল্লাসে ফেটে পড়ে বলে, ঠিক বলেছ।

ছায়া বড় তিথির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, তুমি এতক্ষণ এ বাড়ির সব ক'জন বুড়ো-বুড়ির সঙ্গে কাটিয়ে খুব ভাল মেয়ে হলে। আমাদের সঙ্গে গল্প করবে কখন?

—আপনি বড়দা-ছোড়দাকে বুড়োদের দলে ফেলবেন না।

—তোমার বড়দা কচি খোকা।

কাবেরী চাপা হাসি হেসে প্রশ্ন করে, তোমার ছোড়দাকে বেশ জ্যাঠা-জ্যাঠা বলে মনে হল না?

—জ্যাঠা না, দাদু মনে হল।

এবার ও ছায়ার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, খাওয়া-দাওয়ার পর আপনাদের দু'জনের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেব। এখন একটু উপরে মেয়েদের কাছে যাই।

—হ্যাঁ, যাও।

মেয়েরা ওকে দেখেই লাফিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যানার্জীসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের সুন্দরী কাকিমার সঙ্গে কথা বলো। আমি এবার শান্ত-পবিত্রর কাছে যাই।

বড় তিথি ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, বাঃ! ভারী সুন্দর সাজানো-গোছানো।

মৃত্তিকা বলে, আপনার আদরের তিথিই তো আমাদের ইণ্টিরিয়র ডেকরেটর।

—সিম্পল বাট ভেরি টেস্টফুলি ডেকরেটেড।

ছোট তিথি বলে, ক্রেডিট গোজ টু আওয়ার বিলাভেড ভাল কাকু।

—কেন?

—জানলা-দরজার পর্দা, টেবিল ক্লথ, বেড কভার—সবই তো ভাল কাকু পছন্দ করে কিনেছে।

—ঠিক আছে, ওকে চল্লিশ নম্বর দিচ্ছি।

—মাত্র চল্লিশ!

—তোমার ভাল কাকু চল্লিশ, তুমিও চল্লিশ আর মৃত্তিকা পাবে কুড়ি।

—ও কেন কুড়ি পাবে?

—ও যদি সব কিছু নোংরা করত? যদি দেয়ালে আজেবাজে ছবি লাগাতো বা বন্ধুদের ঠিকানা লিখে রাখত?

ছোট তিথি বলে, ভাল কাকুর পার্ট টাইম মেয়ে হয়ে তা পারবে না।

বড় তিথি হাসতে হাসতে বলে, ভাল কাকু! ভাল কাকু! ভাল কাকু! সবই ভাল কাকু।

মৃত্তিকা বলে, আমরা ভাল-মন্দ যাই শিখি না কেন, সবই ভাল কাকুর কাছে শিখেছি।

—তোমাদের ভাল কাকুর ঘর কোথায়?

—পাশেই।

দুই বোন সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যায়।

ও ঘরে পা দিয়েই মৃত্তিকা বলে, ভাল কাকু, তুমি এখানে শুয়ে?

—কী করব মা? বাবা-মা দাদা-বৌদি আর তোদের নিয়েই তো সবাই মেতে আছে। আমি আর.....

ও কথায় কান না দিয়ে বড়তিথি ঘরখানা একবার দেখে নিয়ে বলে, সত্যি অপূর্ব!

—কী অপূর্ব।

—আপনার ঘরখানা।

—ঘর তো আমার না, ঘরের মালিক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সরকার। দলিলে নাম না থাকলেও বাস্তবে আসল মালিক শ্রী শান্ত সরকার। ওরা দু'জনেই মহানুভব। তাই আমাকে আর মেয়ে দুটোকে এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

—বাঃ! বেশ আছেন। একে বাড়ির আদুরে ছোট ছেলে, তার উপর তিনটে পাক্কা মোসাহেব পেয়েছেন। জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিচ্ছেন।

—হতভাগ্য কেরানিকে নিয়ে কেন বিদ্রুপ করছেন?

—ভুলে যাবেন না, আমিও কেরানিগিরি করি।

সৌম্য চাপা হেসে বলে, সে তো শখে।

হঠাৎ বড় তিথি গম্ভীর হয়ে বলে, এই ঘরে থেকেও আপনি লেখেন না কেন? এই রকম পরিবেশে থাকলে তো গাধা-ঘোড়াও কিছু লেখালেখি করতে চেষ্টা করবে।

সৌম্য একটু চাপা গলায় বলে, মেয়েরা সত্যি ঘরখানাকে পড়াশুনার উপযোগী করে রাখে।

মৃত্তিকা বলে, ভাল কাকু, একটু সরে বসো। আমাদের বসতে দাও।

—তোরা আমার কাছে বসার আগে সুন্দরী কাকিমাকে চেয়ারটা টেনে দে।

বড় তিথি বলে, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি মেয়েদের ঘরে যাচ্ছি।

—এ ঘর পছন্দ হল না?

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, বসুন, বসুন। এই জানলা দিয়ে দেখুন কেমন মেঘ করেছে।

হঠাৎ নিচে থেকে পবিত্রর গলা শোনা গেল, তিথি-মৃত্তিকা, মা ডাকছেন।

মৃত্তিকা গলা চড়িয়ে বলে, মা, আসছি।

ছোট তিথি বলে, সুন্দরী কাকিমা, তুমি একটু ভাল কাকুর সঙ্গে কথা বলো। আমরা একটু ঘুরে আসি।

ওরা চলে যেতেই সৌম্য বলে, যদি মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়?

—পথে যাতে বিপদে পড়ি, সেইজন্য চলে যেতে বলবেন তো?

—আপনাকে চলে যেতে বলার অধিকার আমার নেই। তাছাড়া বাবা-মা থেকে শুরু করে হিন্দোল পর্যন্ত সবার কাছে আপনি এত প্রিয় পাত্রী হয়েছেন যে আমি যেতে বললেও ওরা আপনাকে যেতে দেবে কেন?

—সামান্য এই সময়ের মধ্যেই আমি সবার প্রিয় পাত্রী হয়ে গেলাম?

—মা-বাবা তো মন্ত্রমুগ্ধ। বড়দা বললেন, বহুকাল পরে একজনের সঙ্গে কথা বলে সত্যি আনন্দ পেলাম। ছোড়দা বললেন, সী ইজ এক্সট্রিমলি লজিকাল অ্যান্ড র‍্যাশনাল। আর দুই বৌদি তো আপনার কথা ছেলেমেয়েদের কাছে শুনেই ক্লীন বোল্ড!

হঠাৎ শূন্য উদাস দৃষ্টিতে দূরের মেঘলা আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ও যেন আপনমনেই বলে, একজন মানুষের ভালবাসা পেলাম না বলে আমার জীবনের এক দিক অন্ধকার হলেও আমি প্রাণ মন দিয়ে অন্য সবার ভালবাসা চাই, পাইও।

সৌম্য আস্তে আস্তে বলে—

রাত যিতনী ভী সঙ্গীন হোগি
সুবহ্ উতনা হী রঙীন হোগি।

একটু হেসে বলে, বুঝলেন, রাত যত অন্ধকার দুর্যোগময় হবে, সকাল তত সুন্দর তত মনোরম হবে।

তিথি ব্যানার্জী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বলে, আপনি বলছেন, এই অন্ধকার কেটে যাবে?

—একশ' বার কেটে যাবে।

—আমাকে অনেকেই ভালবাসেন, স্নেহ করেন কিন্তু কেউ এরকম আশার কথা শোনায়নি। আপনাকে সত্যি কী বলে ধন্যবাদ জানাব, তা জানি না।

শনিবার রাত্তির থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হল। রাত দু'টো আড়াইটের সময় ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে এমন জোরে বৃষ্টি শুরু হল যে সৌম্যকে উঠে দক্ষিণ দিকের জানলা বন্ধ করতে হল। পাশের ঘরে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল, তিথি-মৃত্তিকা ঠাণ্ডায় কুকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে। ওদের গায়ে চাদর দিয়ে আবার নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙল তিথির ডাকাডাকিতে, ভালো কাকু সাতটা বাজে। তোমাকে তো বেরুতে হবে।

হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়েই সৌম্য বলে, মা, ক'টা বাজেরে?

—প্রায় সাতটা।

—ইস্!

তিথি একটু হেসে বলে, তুমি এমন অঘোরে ঘুমুচ্ছিলে যে ডাকতে কষ্ট হচ্ছিল।

সৌম্য একটু হেসে ডান হাত দিয়ে ওর গাল টিপে বলে, সাধে কি তোকে মা বলি?

—নাও, নাও, চটপট চা খেয়ে বাথরুমে যাও। তুমি তো বেরুবে।

—হ্যাঁ, মা।

সৌম্য চা খেয়ে নিচের বারন্দায় পা দিতে না দিতেই দুই বৌদি সামনে হাজির। কাবেরীর পরনে নীল শাড়ি দেখেই ও সুর করে গেয়ে ওঠে—

চলে নীল শাড়ি
নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

দুই বৌদির মুখ হাসিতে ভরে যায়।

সৌম্য হাসতে হাসতেই ছোটবৌদির দিকে তাকিয়ে বলে, বুঝলে সখী, তুমি এই প্রেমিকের মন আর হৃদয়ানুভূতি নিঙড়ে নিঙড়ে চলেছ।

কাবেরী ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলে, দিদি, এই ছেলেটা সত্যি বখে গেছে।

ছায়া কিছু মন্তব্য করার আগেই সৌম্য বাথ-রুমে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বলে, তোমার মতো যুবতী যদি ঢলঢল ভাবে সারাদিন চোখের সামনে নেচে বেড়ায়, তাহলে ছোঁড়ারা কেন বখে যাবে না?

ও ঝড়ের বেগে চলে যেতেই ছায়া বলেন, আমাদের দু'জনের কপালেই তো দুটো বেরসিক জুটেছে। ছোট ঠাকুরপোর জন্যই আমরা অন্তত আনন্দে থাকি।

কাবেরী বলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর দুই ভাইকে দেখে তো মনেই হয় না ওরা এক বাপ-মায়ের ছেলে।

যাই হোক কোনোমতে সেজেগুজে নিচে নেমে এসে দুটো পরোটা গলায় দিয়ে ছাতি খুলে উঠোনে পা দিতেই উপর থেকে তিথি চিৎকার করে, ভালো কাকু, একটা রিক্সা নিয়ে নিও। তা না হলে আটটা আঠাশের ট্রেন..

—হ্যাঁ, মা, নেব।

মা বলেন, সাবধানে যাস।

—কোনো চিন্তা নেই মা।

ছায়া চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে কাবেরী প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এসে বারান্দার ধারে এসে বলে, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

ঐ উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়েই সৌম্য সুর করে বলে—

কঠিন মাটিতে বধূ হেঁটে যায়

ব্যথা বাজে মোর বুকে।

সবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ছায়া বৃদ্ধা সরলাবালার দিকে তাকিয়ে বলেন, মা, আপনার এই ছেলেটা সত্যি ভারী মজাদার।

—হ্যাঁ, ও একটু আলাদা।

তিথি ব্যানার্জীকে সৌম্য বলেছিল, দশটা পনের-কুড়ির মধ্যেই কে. সি. দাশের দোকানের সামনে পৌঁছব। আপনি দেরি করবেন না।

একটু থেমে বলেছিল, বান্ধবী বা ভাবী স্ত্রীর জন্য গাছের তলায়, সিনেমা হলের সামনে অপেক্ষা করার অভ্যাস তো নেই, তাই..

—আছে কি নেই, তা আমি কী করে জানব? তবে আমি দেরি করব না, তা

বলে দিতে পারি।

ন'টা চুয়ান্নর বদলে ট্রেন হাওড়া এল প্রায় সওয়া দশটায়। তারপর বৃষ্টির মধ্যে বাস ধরে কার্জন পার্কে নেমে কে. সি. দাশের দোকানের সামনে পৌঁছল পৌনে এগারটার পর। সৌম্য তিথি ব্যানার্জিকে না দেখতে পেয়েই ভাবল. নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে চলে গেছে। কিন্তু...

মনে নানা রকম চিন্তা আসে। বৃষ্টির জন্য কী বাড়িতেই থেকে গেলেন? নাকি...

হঠাৎ সামনে একটা গাড়ি থামতেই সামনের বাঁ দিকের দরজা খুলে গেল। স্টিয়ারিং-এ বসে মুখ নিচু করে তিথি বলে, আসুন, আসুন।

সৌম্য গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করেই জিজ্ঞেস করে, আপনি এখন এলেন?

—অনেকক্ষণ এসেছি।

—কিন্তু..

—আমি উল্টো দিকে গাড়ি পার্ক করে এদিকে নজর রাখছিলাম।

—ও!

সৌম্য সলজ্জভাবে বলে, ট্রেন এল কুড়ি মিনিট লেট করে। তারপর বাস ধরে...

গাড়ি চালাতে চালাতেই তিথি বলে. আমিও এইরকমই আন্দাজ করেছিলাম।

—আমি তো ভাবছিলাম, আপনি হয়তো অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে চলেই গেছেন. হয়তো আমার উপর খুব রেগেই গিয়েছেন।

—এত সামান্য ব্যাপারে বিরক্ত বা রাগ আমার হয় না।

—যাক বাঁচা গেল।

গাড়ি সেন্ট্রাল এভিন্যু দিয়ে ছুটেছে। একে রবিবার, তার উপর এই বৃষ্টি! পথে লোকজন বিশেষ নেই, গাড়িও কম। সৌম্য জিজ্ঞেস করে, আজ গাড়ি নিয়ে বেরুলেন?

—বাবা আর জংলিকাকা বললেন, এখন না হয় ট্যাক্সি পেয়ে যাবে কিন্তু ফেরার সময় যদি তা'ও না পাও, তাহলে মুশকিলে পড়বে। তুমি গাড়ি নিয়েই যাও।

ও একটু থেমে বলে. তাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি।

—ভালোই করেছেন। ট্যাক্সিও তো রাস্তায় বিশেষ নেই।

দু'এক মিনিট পর তিথি বলেন, শহরের মধ্যে গাড়ি চালাতে আমার বিশেষ ভালো লাগে না। লং ড্রাইভে গাড়ি চালিয়ে যেমন আরাম, সেইরকমই আনন্দ।

—মাঝে মাঝে দূরে কোথাও গাড়ি নিয়ে যান?

—কোথায় আর যাই? বছর চারেক আগে একবার গাড়ি নিয়ে উড়িষ্যা ঘুরেছিলাম। তারপব আর গাড়ি নিযে যাওয়া হয়নি।

—যান নি কেন?

—হাজার হোক বাবা প্রেসারের রুগি। হাইওয়েতে আমি গাড়ি চালালে ওর বড্ড বেশি টেনশান হয়। আবার হাইওয়েতে গাড়ি চালাতে জংলিকাকা ভয় পায়।

গাড়ি সেন্ট্রাল এভিন্যু ছেড়ে বিবেকানন্দ রোড ধরেছে। মালিকতলার দিকে চলেছে। সামনের উইন্ড স্ক্রীনে দুটো ওয়াইপার জল সরিয়ে দিচ্ছে। ভিতরের দিকে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি চালাতে চালাতেই তিথি বাঁ হাতে কাপড় নিয়ে পরিষ্কার করছিল। এখন সৌম্যই করছে।

সৌম্য বলে, এইরকম বৃষ্টির দিনে ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি নিয়ে লং ড্রাইভে যাবার আনন্দই আলাদা।

—দারুণ!

তিথি একটু থেমে বলে, এসপ্ল্যানেডে যখন আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তখন তো একবার ভাবছিলাম, অমিতাভদার বাড়ি থেকে খাবার-দাবার টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়ব।

—এখনও কী সেরকম ইচ্ছে করছে।

—না।

—কেন?

—তাহলে উনি আনন্দ পেলেও সুখ-দুঃখের কথা সেভাবে বলতে পারবেন না। আমাদেরও হয়তো তখন ঐসব শুনতে ভালো লাগবে না।

—ঠিক বলেছেন।

সৌম্য একটু হেসে বলে, আপনি বেশ চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করেন, ভেরি ব্যালান্সড্ গার্ল!

তিথি পাশ ফিরে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, গার্ল না, লেডি।

গাড়ি ভি. আই. পি. রোড দিয়ে চলছে। কিছুক্ষণ কেউই কোনো কথা বলে না। উল্টোডাঙ্গার মোড়ে পৌঁছতেই সৌম্য জিজ্ঞেস করল, মেসোমশাইকে বলেছেন, এসপ্লানেড থেকে আমাকে তুলে নিয়ে অমিতাভদার ওখানে যাবেন?

—আপনি বৌদিদের বলেছেন, আমরা এসপ্লানেডে মিট করে দাদার ওখানে যাব?

সৌম্য একটু হেসে বলে, এটা কী আমার প্রশ্নের জবাব হল?

—হ্যাঁ, হল।

—তার মানে?

তিথি পাশ ফিরে ওর দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলে,

আপনি খুব ভালো জানেন, শুধু আমি আর আপনি যাচ্ছি, একথা কারুর পক্ষেই বাড়িতে বলা সম্ভব নয়।

ভি. আই. পি. রোড দিয়ে গাড়ি ছুটে চলে।

স্টীয়ারিং বাঁ দিকে ঘুরিয়েই তিথি বলে, লেক টাউন এসে গেছি। গলিটা খেয়াল রাখবেন।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই গাড়ি অমিতাভদার বাড়ির সামনে হাজির। অমিতাভদা মহা খুশি। বললেন, ভাবছিলাম, এই বৃষ্টির মধ্যে তোমরা আর আসবে না। কোথায় হরিপাল, কোথায় টালিগঞ্জ আর কোথায় আমি থাকি!

তিথি বলে, আজ বৃষ্টি, কাল শীত বলে কী ভাইবোনের বাড়িতেও আসা-যাওয়া বন্ধ থাকবে?

—না, তা না। ভাবছিলাম, হয়তো ট্যাক্সি করে আসবে কিন্তু বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই ভাবলাম, অন্য কেউ।

গাড়ির প্রত্যেকটা দরজা লক করতে করতেই কথা হয়। গাড়ি থেকে নামার আগে তিথি পিছন দিক থেকে একটা টিফিন ক্যারিয়ার আর কে. সি. দাশের প্যাকেট বের করতেই সৌম্য লজ্জিত বোধ করে। বুঝতে পারে, একেবারে খালি হাতে আসা ঠিক হয়নি।

তিথি বাড়ির ভিতরে ঢুকেই অমিতাভদার হাতে টিফিন ক্যারিয়ার দিয়ে বলে, দাদা, আপনার জন্য আমি নিজে একটু পায়েস করেছি। জানি না কেমন লাগবে।

উনি একটু হেসে বলেন, ছোট বোন ভালোবেসে পায়েস করে এনেছে আর আমার ভালো লাগবে না, তাই কখনো হয়?

সৌম্য বলে, দাদা, ওর হাতের পায়েস অসম্ভব ভালো হয়।

তিথি সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলেন, একদিন দুর্ঘটনাক্রমে ভালো হয়েছিল বলে তো রোজ রোজ ভালো হতে পারে না।

তিথি এবার কে. সি. দাশের মিষ্টির প্যাকেটটা সামনে রেখে অমিতাভদাকে বলে, এটা সৌম্যবাবু এনেছেন। আমার মনে হয়, ওর পছন্দ খারাপ লাগবে না।

—না, না খারাপ লাগবে কেন?

অমিতাভদা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তোমরা দু'জনে বসো। আগে তিন কাপ কফি করে আনি।

তিথি বলে, আমি বসে থাকব আর আপনি কফি করবেন, তাই কখনো হয়? আসুন, আমাকে একটু দেখিয়ে দিন।

—তুমি এসো কিন্তু তোমাকে করতে হবে না। দুধ গরম আছে। দু'মিনিটে আমার

হয়ে যাবে।

ওদের দু'জন ভিতরের দিকে পা বাড়াতেই সৌম্য বলে, আমিই বা একলা একলা শালগ্রাম শিলার মতো বসে থাকি কেন? আমি অন্তত চিনি নাড়তে পারব।

তিথি পিছন ফিরে একটু হেসে বলে, আপনি তো বাড়ির আদুরে ছোট ছেলে। চিনি নাড়তে কষ্ট হবে না তো?

—ভিটামিন খেয়ে এসেছি। বোধ হয় এ গুরু দায়িত্ব সামলাতে পারব।

অমিতাভদা দুধের পাত্র গরম করতে দিয়েই বলেন, আমি দুধ গরম করে দিচ্ছি, তিথি কফি মেশাবে আর সৌম্য চিনি মেশাবে। কফি করার মতো পরিশ্রমের কাজ কী একজনের পক্ষে সম্ভব?

তিনজনে তিন কাপ কফি নিয়ে সামনের ঘরে এসে বসেই কফির কাপে চুমুক দেন।

সৌম্য বলে, আঃ! লাভলি! অমিতাভবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, দেখেছেন দাদা, শুধু ঠিক মতো চিনি মেশাবার জন্যই কফিটা দারুণ হয়েছে।

তিথি হাসতে হাসতে বলে, সত্যি আপনার গুণের শেষ নেই।

কফি খেতে খেতেই অমিতাভবাবু বলেন, তোমরা কিন্তু যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করবে না। সন্ধ্যের আগে তোমাদের ছাড়ছি না।

সৌম্য সঙ্গে সঙ্গে বলে, না, না, দাদা, অত দেরি করব না। আমাদের তারকেশ্বর লাইনে ট্রেন কম। তার উপর এই বৃষ্টি। দু'একটা ট্রেন ক্যানসেল হলেই সর্বনাশ।

তিথি বলে, দাদা আমরা চারটে নাগাদ উঠব। সন্ধে হয়ে গেলে বাবা চিন্তা করবেন।

—আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে। খাওয়া-দাওয়া কখন করবে?

সৌম্য বলে, আমি গ্রামে থাকি। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কি ঠিক-ঠিকানা আছে? সন্ধ্যের আগে দু'মুঠো পেলেই হল।

তিথি তির্যক দৃষ্টিতে সৌম্যর দিকে একবার তকিয়েই বলে, দাদা, দেড়টা-দুটো নাগাদ খাব, কী বলেন?

—ঠিক আছে।

তারপর এ-কথা সে কথার পর মায়াদির প্রসঙ্গ ওঠে।

অমিতাভবাবু গভীর হয়ে বলেন, তাহলে শোনো আমাদের কথা।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমাদের অফিসে মানদা সরকার বলে একজন অফিসার ছিলেন। ওর আন্ডারেই আমি কর্মজীবন শুরু করি। উনিই আমাকে

কাজকর্ম শেখান।...

আবার একটু থেমে বলেন, মানদাবাবু অসম্ভব ভালো মানুষ ছিলেন। আমাকে ঠিক ছেলের মতোই স্নেহ করতেন। মায়ার বাবা আর উনি একসঙ্গে কলেজে পড়তেন।

সৌম্য বলে, মায়াদির বাবা কী করতেন?

—উনি আই. সি. আই-তে কাজ করতেন। প্রচুর মাইনে পেতেন, মানদাবাবুর মতোই ভালো মানুষ ছিলেন। উনি অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় অফিস লাইব্রেরী থেকে একটা ভালো ইংরেজি উপন্যাস বা নাটক নিয়ে আসতেন। দু'-আড়াই ঘণ্টা পড়াশুনা না করে উনি খেতেই বসতেন না। সংসারের ব্যাপারে বিশেষ নাক গলাতেন না।

তিথি প্রশ্ন করে, সংসার কে সামলাতেন? মায়াদির মা?

—হ্যাঁ।

—মায়াদিরা ক' ভাইবোন?

—ওরা তিন বোন, কোনো ভাই নেই।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, মানদাবাবুর কাছে আমার কথা জানার পর মায়ার বাবা আমার মায়ের কাছে এসে হাজির। তারপর মা আমার ছোট ভাইকে নিয়ে মায়াকে দেখতে যান। ওদের খুব পছন্দ হয়। সে সময় মায়ার মা নানা অছিলায় যখন তখন শুধু আমাদের বাড়িতেই আসতেন না, আমার অফিসেও আসতেন।

সৌম্য হেসে বলে, দাদা, এ তো মারাত্মক কথা শোনালেন।

—এখন উনি বাতে পঙ্গু, শয্যাশায়ী। কিন্তু আগে উনি কী অহঙ্কারী, কী মেজাজের ছিলেন, তা তোমরা ভাবতে পারবে না। মায়ার বাবা যেমন ভাবভোলা সাধাসিধে মানুষ ছিলেন, উনি আগে ঠিক তার বিপরীত ছিলেন। মায়ার তিন বোন ঠিক মায়ের মতই হয়েছে।

সৌম্য বলে, মায়াদি যে বেশ অহঙ্কারী, তা আমরা ভালো করেই জানি। উনি আমাদের মতো কেরানিগিরি করলেও কেরানিদের দু'চোখে দেখতে পারেন না।

—যাই হোক বিয়ের পর আমার শ্বশুরমশাই-ই একদিনই আমাকে বললেন, তোমার দুই বড় শালী নিজেদের পছন্দ মতো ছেলেদের বিয়ে করে এখন পস্তাচ্ছে। আমার ছোট মেয়েও আর একটু হলে ঐ ভুল করতে চলেছিল বলেই তোমার মতো ভদ্র সভ্য শিক্ষিত ছেলের হাতে ওকে তুলে দিলাম।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিথি বলে, মায়াদি বোধ হয় ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করতে পারল না বলেই রাগে দুঃখে ফুলশয্যার দিন আপনাকে ঐরকম একটা অদ্ভুত

কথা বলতে পেরেছিলেন, তাই না?

অমিতাভবাবু একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ তাইতো মনে হয়। তবে বিয়ের পরেও তো মায়া ঐ পলাশের সঙ্গে নিয়মিত মেলামেশা করত।...

জামা-কাপড় পরতে পরতেই অমিতাভবাবু বলেন, মায়া, তুমি কি এখুনি বেরুবে? নাকি আমি রওনা হব?

—শাড়িটা বদলেই বেরুব। পাঁচ-সাত মিনিটেই আমার হয়ে যাবে।

ঠিক সেই সময় মোটর সাইকেল চড়ে পলাশ হাজির। ওকে দেখেই মায়া বলে, পলাশদা, তুমি আমাকে একটু অফিস পৌঁছে দেবে। বাসে ঠেলাঠেলি করে যেতে ভালো লাগে না।

—তা দিতে পারি কিন্তু বেশি দেরি করতে পারব না। আমাকে সাড়ে দশটার মধ্যে দোকানে পৌঁছতে হবে।

—না, না, বেশি দেরি হবে না। তুমি বসো।

এবার মায়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি যাও। পলাশদা আমাকে পৌঁছে দেবে।...

অমিতাভবাবু তিথির দিকে তাকিয়ে বলেন, বুঝলে দিদি, সপ্তাহে অন্তত দু'তিন দিন আমাদের অফিস বেরুবার সময় পলাশ এসে হাজির হত আর তোমাদের মায়াদি ওর সঙ্গে বেরুত।

উনি একটু মাথা নেড়ে ম্লান হেসে বলেন, পলাশের সঙ্গে বেরুলে ও কিন্তু মাঝে মাঝেই অফিস কামাই করত কিন্তু সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে আমাকে কখনই কিছু জানাত না।

সৌম্য জিজ্ঞেস করে, আপনি কী করে জানতে পারতেন যে, উনি অফিস যাননি?

—বেশ কিছুকাল আমি লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। তাইতো আমাকে প্রায়ই হাইকোর্ট আর ব্যাঙ্কশাল কোর্টে যেতে হত। ছুটির সময় পর্যন্ত ওদিকে থাকলে...

—বুঝেছি।

তিথি প্রশ্ন করে, আপনি মায়াদিকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন?

—না।

—কেন?

—যে লুকোতে চায়, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে লাভ?

—তাই বলে স্বামী হিসেবে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অমিতাভবাবু বলেন, তখন আমার মা জীবিত, আমার কাছেই থাকেন, অশান্তি আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া মা দুঃখ পাবেন বলে চুপ করে থাকতাম।

—কিন্তু যেভাবেই হোক আপনি তো তাকে জানিয়ে দিতে পারতেন যে, তার এই লুকিয়ে প্রেম করার ব্যাপারটা আপনি জানতে পেরেছেন।

—পারতাম বৈকি।

—তবে বলেন নি কেন?

উনি একটু হেসে বলেন, দেখ দিদি, এই যে তুমি আজ আমার এখানে সারাদিন কাটাবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ কিন্তু যদি এখানে না এসে অন্য কারুর কাছে যেতে বা কাটাতে, তাহলে তোমার শ্বশুরমশাই তো জানতেও পারতেন না।

—সে তো বটেই।

—তোমার উপর আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে বলেই তো তিনি তোমাকে হাসি মুখে আসতে দিয়েছেন। এই আস্থা বিশ্বাসই সংসারের সব চাইতে বড় সম্পদ। যেখানে সেই আস্থা বিশ্বাস নেই বা তার অপব্যবহার হয়, সেখানে কী জোর করে শ্রদ্ধা-ভালবাসা পাওয়া যায়?

সৌম্য বলে ঠিক বলেছেন দাদা।

অমিতাভবাবু একটু হেসে বলেন, দিদি, পলাশের ব্যাপারটা শুনেই তুমি ঘাবড়ে গেলে? আসল ব্যাপারটা শুনলে তো তুমি মুর্চ্ছা যাবে।

—আসল ব্যাপার মানে?

—মানে শেষ পর্যন্ত ও যাকে বিয়ে করল, তার ব্যাপার।

তিথি অবাক হয়ে বলে, মায়াদি ঐ পলাশবাবুর জন্য আপনাকে ডিভোর্স করেন নি?

অমিতাভবাবু মাথা নেড়ে একটু হেসে বলেন, না, দিদি, সে পলাশ না, তার নাম অসিত সরকার।

—তার সঙ্গেও কি মায়াদির অনেক দিনের পরিচয় ছিল?

—থাকলেও আমি জানি না।

উনি একটু থেমে বলেন, আমার মনে হয়, ডালহৌসি পাড়াতেই দু'জনের আলাপ।

তিথি আবার প্রশ্ন করে, উনি কী করেন?

—একটা ব্রিটিশ ফার্মে অফিসার। তোমাদের অফিসের কাছেই ওর অফিস।

—আপনি ওকে দেখেছেন?

—আলিপুর কোর্টে মায়ার সঙ্গে দেখেছি। ভদ্রলোক বেশ হ্যান্ডসাম, মারুতি গাড়ি চড়েন। দেখেই মনে হয় বেশ সাকসেসফুল লোক।

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আমাদের ডিভোর্স তো সেদিন হল কিন্তু তার আগে থেকে মিঃ সরকারের সঙ্গে ওর কি রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা জানলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।

সৌম্য বলে, কী রকম?

—তুমি আগে বলো, তোমাদের মায়াদি মাঝে মাঝেই ছুটি আর রেলের পাস নিতেন কিনা।

সৌম্য একটু হেসে বলে, আমাদের সেক্সনে বছরে এক-আধবার সাত-দশ-পনের দিনের ছুটি অনেকেই নেয় নানা পারিবারিক কারণে কিন্তু তিন-চারজনের বেশি কেউই বছরে এক সেট পাসও নেন না।...

—কেন?

—সবাই বলেন, রেলের ভাড়া না লাগলেও হোটেল-টোটেলের খরচা কী কম।

—তুমি তো ব্যাচেলার। তুমি বছরে ক'বার পাস নিয়ে বাইরে যাও?

সৌম্য একটু হেসে বলে, এই ক'বছরের মধ্যে আমি একবারই পাস নিয়ে বেড়াতে গেছি।

—তোমাদের মায়াদি ক'বার ছুটি আর পাস নিতেন।

—কোন কারণে শুক্রবার বা সোমবার ছুটি থাকলেই অন্তত পি. টি. ও. নিয়ে বাইরে কোথাও যেতেন।

ও একটু থেমে বলে, আমাদের সেক্সনের মধ্যে একমাত্র মায়াদিই প্রত্যেকটা পাস-পি. টি. ও. নিয়ে বাইরে যেতেন।

বেশ জোর করে একবার নিঃশ্বাস ফেলে অমিতাভবাবু বলেন, হ্যাঁ, মায়া মাঝে মাঝে বেড়াতে যেত।

তিথি জিজ্ঞেস করে, দাদা, আপনিও সঙ্গে যেতেন?

—না, দিদি, আমি কোনোদিনই ওর সঙ্গে কোথাও যাইনি। ও সব সময় বলত, হয় দিদি-জামাইবাবু না হয় মাসতুতো দাদা-বৌদিদের সঙ্গে যাচ্ছি।

অমিতাভবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, এক মিনিট অপেক্ষা করো। আমি ও ঘর থেকে আসছি।

হ্যাঁ, উনি দু'এক মিনিটের মধ্যেই কতকগুলো কাগজপত্র হাতে নিয়ে ফিরে এসেই ওদের সামনে বিছিয়ে দিয়ে বলেন, দেখো তো এগুলো কী।

দু'একটা কাগজপত্র হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেই তিথি বলে, এ তো পুরী

আর রাঁচির হোটেলের বিল আর রসিদ।

—উপরের নামটা কী দেখেছ?

প্রত্যেকটা বিলের উপর মিসেস মায়া ঘোষ দস্তিদার অ্যান্ড হাসব্যান্ড দেখেই সৌম্য আর তিথি অবাক হয়ে যায়।

সৌম্য জিজ্ঞেস করে, এগুলো আপনি পেলেন কোথায়?

—মায়ার তোষকের নিচে।

তিনজনের কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। তিনজনেই আপন মনে কী যেন ভাবেন। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কাটার পর তিথি মুখ তুলে অমিতাভবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, মায়াদি এরকম কাণ্ড করল কেন?

—দিদি, ও কেন এই কাণ্ড করল, তার সঠিক জবাব শুধু সেই দিতে পারে, তবে আমি তোমাকে সাধারণ চিন্তা-ভাবনার কথা বলতে পারি।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, কর্মক্ষেত্র এক সঙ্গে কাজকর্ম করতে করতে অনেক ছেলে মেয়েদেরই ভাব-ভালোবাসা হতে পারে ও হয়, বিয়েও হয়। আবার প্রতিদিন এক সঙ্গে যাতায়াত করতে করতে বা অফিস পাড়ায় দেখা হতে হতেও অনেক ছেলেমেয়ে প্রেমে পড়ে, বিয়ে করে। এসব বিয়েতে মা-বাবাদের সম্মতি থাকুক বা না থাকুক, এর মধ্যে কোনো অন্যায় বা অস্বাভাবিকতা নেই।

সৌম্য আর তিথি এক মনে ওর কথা শোনে।

—তবে দিদি, বিয়ের পর সবাই আশা করে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেমন ভাব-ভালবাসা দরদ থাকবে, সেই রকমই সততা আর নিষ্ঠা থাকবে। স্ত্রী যেন কোনো কারণেই মনে না করেন যে, তার স্বামী অফিস যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুরনো বা নতুন প্রেমিকার কাছে সারাদিন কাটিয়ে ফিরে আসেন।

ওরা দু'জনেই সম্মতিতে মাথা নাড়ে।

—আবার স্বামীও কখনই না ভাবেন, তার স্ত্রী বাড়িতেই থাকুন বা অফিসেই চাকরি করুন, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

তিথি বলে, ঠিকই তো।

—দিদি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোনো একজন নিত্য নতুন মোহের আকর্ষণে ভেসে যান, সেখানে কি বিয়ে টিকতে পারে নাকি সংসারে সুখ-শান্তি থাকতে পারে?

অমিতাভবাবু প্রায় না থেমেই একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে যান, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী নতুন পরিচয়, নতুন আবিষ্কার, নতুন আনন্দ আর মোহে ডুবে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে বিচিত্র ভালোবাসা, দরদ আর সহমর্মিতা। এই পর্যায়েই একটি সন্তান এসে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়। তার অকারণ হাসি, খেলা, প্রথম

হামাগুড়ি দেওয়া, উঠে দাঁড়িয়েই থপ্ করে পড়ে যাওয়া দেখে কি কম চাঞ্চল্য উত্তেজনা আনন্দ হয়?

তিথি এক গাল হেসে বলে, হ্যাঁ, দাদা সত্যিই তাই।

উনি প্রশান্ত হাসি হেসে বলেন, এই চাঞ্চল্য উত্তেজনা বা সুখ-দুঃখের খেলা নিয়েই তো দুনিয়ার সংসারী মানুষ বেঁচে থাকে কিং এই পৃথিবীর কিছু মানুষ বোধ হয় সম্পদ আর সম্ভোগ ছাড়া কিছুই বোঝেন না।

উনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েই বলেন, চলো, চলো খেতে যাই। পৌনে তিনটে বাজে, সে খেয়াল আছে?

অমিতাভদাদার ব্যর্থ বিবাহিত জীবনে বেদনা বিধুর কাহিনী শুনতে শুনতে সৌম্য আর তিথি খিদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। দু'জনেই স্থবিরের মতো বসে ছিল। উনি রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই ওরা দুজনেও ভিতরের দিকে পা বাড়ায়।

খাওয়া-দাওয়া ভালোই হল। সৌম্য বলল, যেমন মাংস, তেমনই পায়েস! একেবারে মেড ফর ইচ আদার!

ওর কথা শুনেই ওরা দু'জনে হেসে ওঠে।

খেয়ে-দেয়ে উঠে আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করেই তিথি উঠে দাঁড়ায়। বলে, দাদা, প্রায় পাঁচটা বাজে। এবার রওনা হতে হবে।

—হ্যাঁ, দিদি, নিশ্চয়ই যাবে। আর কতক্ষণ তোমাদের আটকে রাখব! মাঝখানে বৃষ্টি বেশ কমেছিল কিন্তু এখন তো বেশ জোরেই হচ্ছে।

উনি দু'হাত দিয়ে তিথির দুটো হাত ধরে বলেন,মাঝে মাঝেই দাদাকে একটু দেখে যেও। খুব খুশি হব।

—হ্যাঁ, দাদা, নিশ্চয়ই আসব, একশো'বার আসব কিন্তু আমাকে একটা কথা দিতে হবে।

—বলো, কী কথা দিতে হবে।

—আপনি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করবেন। আপনি খাওয়া-দাওয়া না করলে আমি খুব দুঃখ পাব।

অমিতাভবাবু মুহূর্তের জন্য ওর চোখের পর চোখ রেখে একটু হেসে বলেন, এই না হলে দিদি? আমি কথা দিচ্ছি, আমি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করব। দাদা কি ছোট বোনকে দুঃখ দিতে পারে?

এবার উনি সৌম্যর দু'কাঁধে দুটো হাত রেখে বলেন, শনি-রবিবার হলেই চলে এসো। খুব আনন্দ পাব।

—নিশ্চয়ই আসব, তবে এবার থেকে কয়েকটা শনি-রবিবার আমাকে বাড়িতেই

থাকতে হবে। অনেক কাজ আছে। এইসব ঝামেলা মিটলেই আসব।

—হ্যাঁ, তাই এসো।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়েই তিথি এক গাল হেসে অমিতাভবাবুকে বলে, দাদা, আমি কিন্তু যখন তখন আপনার অফিসে বা বাড়িতে এসে হাজির হব।

—সে তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।

গলি থেকে বেরিয়ে মেন রোডে পৌঁছেই তিথি বলে, দাদাকে যত দেখছি, তত বেশি ওর প্রতি শ্রদ্ধায় ভালবাসায় মাথা নুয়ে আসছে। কী আশ্চর্য স্নেহপ্রবণ মানুষ।

সৌম্য বলে, ঠিক বলেছেন। ওর মতো মানুষ সচরাচর দেখাই যায় না।

লেক টাউন ছেড়ে ভি. আই. পি. রোডে উঠেই তিথি বলে, আসছে কয়েকটা শনি-রবিবার বাড়ি থেকে বেরুবেন না?

—না।

—বাড়ির কোনো কাজে ব্যস্ত থাকবেন?

—বাড়ির কাজ ছাড়াও আমাদের জি. ডি. স্কুলের এক মাস্টার মশায়ের শরীর খুবই খারাপ। তাই তাঁর কাছেও যাওয়া দরকার।

তিথি কোনো কথা বলে না। আপন মনে গাড়ি চালায়। পাঁচ-সাত মিনিট পর সৌম্য বলে, শুনলেন তো, অফিসে আসা-যাওয়া করতে করতে মায়াদির জীবনে কী ঘটেছে।

—শুনব না কেন?

—আপনি তো মায়াদির চাইতেও হাজার গুণ সুন্দরী। আপনিও কোনো জালে জড়িয়ে পড়েছেন নাকি?

তিথি পাশ ফিরে এক ঝলক ওকে দেখে নিয়েই চাপা হাসি হেসে বলে, আজ এতদিন পর এই প্রশ্ন করছেন? এই ক'মাসে কত কী ঘটে গেল!

—এই সুখবরটা তো আমাকে জানাবেন।

—আপনাকে জানাব কেন?

—অন্য কোনো কারণে না, অন্তত একটা গল্প তো লিখতে পারি।

—এটা গল্পের সাবজেক্ট না, উপন্যাস লিখতে হবে।

—তাহলে উপন্যাস লেখারই চেষ্টা করব।

—ঠিক আছে, ভেবে দেখব।

আবার নীরবতা। তিথি বেশ আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে। দু'পাঁচ মিনিট পর সৌম্য প্রশ্ন করে, গাড়ি এত আস্তে চালাচ্ছেন কেন?

—এইরকম বৃষ্টিতে জোরে চালালেই গাড়ি স্কীড করবে।

তিথি একটু থেমে বলে, আমি মরলে কেউ কাঁদবে না কিন্তু আপনার কিছু হলে তো আপনাদের বাড়ির সবাই আমাকে খুন করে ফেলবে।

—আমার ব্যাপারে ঠিকই বলেছেন কিন্তু আপনার শরীরে একটা আঁচড় লাগলেই তো আপনার প্রেমিক আত্মহত্যা করবেন।

—সে কথা এখনই বলতে পারছি না।

—কেন?

—কত গভীর তার ভালোবাসা, তা তো এখ-ও বুঝে উঠতে পারি নি।

—উনি কি শিক্ষানবীশী প্রেমিক?

তিথি সে কথার জবাব না দিয়ে হেসে ওঠে। .

কাঁকুড়গাছির মোড় থেকে মানিকতলার দিকে গাড়ি ঘুরতেই সৌম্য জিজ্ঞেস করে, এদিকে ঘোরালেন কেন?

—আপনাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সৌম্য বলে, না, না, তার দরকার নেই। আমি মানিকতলা থেকেই বাস ধরে নেব। আপনি অযথা হাওড়া পর্যন্ত যাবেন কেন?

—বাসে ওঠা-নামা করার সময়ই আপনি ভিজে যাবেন। হাওড়া ঘুরে যেতে আমার তো কোনো অসুবিধে নেই।

—আপনার অনেক দেরি হয়ে যাবে। অযথা আমার জন্য..

—আমি বাবাকে বলে এসেছি দেরি হবে।

সৌম্য চাপা হাসি হেসে বলে. তাহলে একটা উপকার করবেন?

—বলুন।

—আমাকে হরিপালে পৌঁছে দিয়েই বাড়ি যান।

তিথি পাশ ফিরে ওকে একবার দেখেই কোনো মতে হাসি চেপে বলে, পারব না।

হাওড়া স্টেশনের সামনে গাড়ি পৌঁছতেই সৌম্য বলে, অশেষ ধন্যবাদ। আপনাদের জন্য দুটো দিন খুবই আনন্দে কাটালাম।

—আপনাদের চাইতে আমি তো দশ গুণ বেশি আনন্দ পেয়েছি। আমি তো এ ধরনের আনন্দের স্বাদ পাই না।

মুহূর্তের জন্য থেমে তিথি আবার ওর দিকে মুখ তুলে বলে, ভাবতে পারেন ছুটির দিনগুলো আমাব কীভাবে কাটে?

ওর বেদনা বিধুর মুখখানা দেখে সৌম্যও কয়েক মুহূর্তের জন্য বিষণ্ণ না হয়ে পারে না। তারপর একটু হেসে বলে, বলেছি তো, সব অন্ধকার কেটে যাবে।

তিথি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়।

—প্লীজ মন খারাপ করবেন না। সাবধানে গাড়ি চালাবেন।

সৌম্য গড়ি থেমে নামতেই তিথি জিজ্ঞেস করে, কাল অফিস আসছেন তো?

—নিশ্চয়ই।

ছ'টা চল্লিশের তারকেশ্বর লোকাল ছাড়ার তখনও একটু দেরি আছে। চেনা-শোনা কাউকে পায় কিনা, তাই দেখতে দেখতে সৌম্য আস্তে আঁস্তে ট্রেনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ কোন একটা মেয়ে 'সমুদা' 'সমুদা' বলে ডাকে। ও থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখে বকুল জানলার ধারে মুখ রেখে হাত নাড়ছে।

সৌম্য কয়েক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে ঐ কম্পার্টমেণ্টে উঠে ওর পাশে বসেই বলে, তুই রবিবারে বেরিয়েছিস যে?

—আমাদের ডিপার্টমেণ্টে একটা সেমিনার ছিল।

বকুল একটু থেমেই বলে, তাছাড়া আরো দুটো-একটা কাজ ছিল ইউনিভার্সিটিতে।

—ছুটির দিনে ইউনিভার্সিটিতে আবার কী কাজ?

—আত্রেয়ী আর সৃষ্টি বলে আমার দুই বন্ধু হস্টেলে থাকে। ওদের কাছ থেকে যে তিনটে বই এনেছিলাম, তা ফেরত দিলাম, আর...

—আর কী?

—দীপালি কাকিমার উর্মির জন্য একটা কবিতা আর একটা লেখা আনলাম।

বকুল একটু হেসে বলে, কাদের কাছ থেকে কবিতা আর লেখা এনেছি শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

সৌম্যও এটু হেসে বলে, কে কবিতা দিলেন আর কে লেখা দিলেন?

চোখ দুটো উজ্জ্বল করে বকুল বলে, নবনীতা দেব সেন কবিতা দিয়েছেন আর ডক্টর স্বপন মজুমদার 'শব্দকোষ স্রষ্টা হরিচরণ' নামে একটা খুব সুন্দর লেখা দিয়েছেন।

—তুই তো দারুণ দুটো লেখা যোগাড় করেছিস।

—আমি তিন-চার মাস ধরে ওদের পিছনে পড়ে আছি। রোজ একবার করে দু'জনকেই তাগাদা দিতাম। শেষ পর্যন্ত না দিয়ে পারলেন না।

—যাই হোক খুব ভালো কাজ করেছিস। উর্মির মতো পত্রপত্রিকায় মাঝে-মধ্যে একটু গুণী, নামী লেখক-লেখিকার লেখা ছাপা হওয়া খুবই দরকার।

ট্রেন ছেড়ে দিয়ে লিলুয়া এসে গেছে। একজন হকারকে চা বিক্রি করতে দেখেই বকুল বলে, সমুদা, চা খাবে তো?

—হ্যাঁ খাব।

বকুল দু'ভাঁড় চা নিয়ে একটা সৌম্যকে দিয়েই ব্যাগ থেকে টাকা বের করে। সৌম্য বাঁ হাত দিয়ে ওর হাত চেপে ধরে বলে, তুই কি রোজগার করিস যে টাকা বের করছিস?

সৌম্য চায়ের দাম দিয়ে ভাঁড়ে চুমুক দেয়। বেলুড় আসতে না আসতেই দু'জনের চা খাওয়া শেষ হয়। বেলুড়-বালি পার হতেই কম্পার্টমেন্টে বেশ ভীড় হয়ে গেল। তিনজনের সীটে চারজন বসার পর একটা বাচ্চার জন্য আরও বেশি চাপাচাপি করে বসতে হল সবাইকে। বকুল একটু হেসে চাপা গলায় সৌম্যকে বলে, এইরকম ভীড়ের ট্রেনে অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে চাপাচাপি করে বসতে যে কী অস্বস্তি হয়, তা তোমাকে বলতে পারব না।

—তোদের বয়সী মেয়েদের পক্ষে অস্বস্তিবোধ করাই তো স্বাভাবিক।

—তাছাড়া সব প্যাসেঞ্জার তো সমান হয় না। এমন অনেক প্যাসেঞ্জার পাশে বসে যাবা ন্যাকামী করে এমনভাবে হাত-পা নাড়েন যে ইচ্ছে করে ঠাস করে গালে এক চড়...

সৌম্য চাপা হাসি হেসে বলে, সবাই কী তোর সমুদার মতো ভদ্র-সভ্য হয়?

—সেইজন্যই তো তোমাকে এত ভালোবাসি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে তির্যক দৃষ্টিতে একবার সৌম্যকে দেখে নিয়ে বলে, তবে এখন আর তুমি আমাকে সেই আগের মতো ভালোবাসো না।

সৌম্য হাসতে হাসতে বলে, এখন এই আলোচনা থাক।

—থাক কেন? আমি কী তোমাকে প্রেম নিবেদন করছি?

শ্রীরামপুরে কম্পার্টমেন্টের অধিকাংশ যাত্রী নেমে যেতেই সৌম্য বলে, তুই কয়েক মাস পরই এম. এ. পরীক্ষা দিবি। অথচ এখনও তোর বুদ্ধি-সুদ্ধি হল না।

—তার মানে?

—ঐ ভীড়ে ভর্তি কম্পার্টমেন্টে এত ভালোবাসার কথা কেউ বলে?

—তুমি কী আগের মতো আমাকে ভালোবাসো যে বলব না?

—কে বলল, আজকাল আমি তোকে ভালোবাসি না?

—কে আবার বলবে? আমি নিজে কি বুঝতে পারি না?

বকুল এক নিঃশ্বাসেই বলে, গত তিন-চার মাসের মধ্যে তুমি আমার সঙ্গে ক'মিনিট কথা বলেছ, বলতে পারো?

সৌম্য কিছু বলার আগেই ও ঠোঁট উল্টে বলে, তুমি ডেকে পাঠাবে, তোমার সঙ্গে প্রাণভরে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করব যেমন ভাবতে পারি না,

সেইরকম তুমি নন্দনে একটা ভালো বই দেখাবে, তারও স্বপ্ন দেখি না।

—দ্যাখ, দু'দিনেই আমি তোর সব অভিমান দূর করে দিচ্ছি।

কামারকুণ্ডুতে এসে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল কিন্তু সেদিকে বকুলের খেয়াল নেই। ও একটু হেসে বলে, দিদি যখন শ্রীরামপুর কলেজে পড়ে, তখন যে সে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তা আমি জানি। অবশ্য তার জন্য আমি দিদিকে দোষ দিই না। তোমার মতো ছেলেকে কোন মেয়ে ভালোবাসতে চাইবে না?

সৌম্য ওর কথা শুনে অবাক হয়। বলে, তুই যে এই ধরনের কথা বলতে পারিস, তা তো আমি ভাবতেও পারি না।

—দেখ সমুদা, আমি কচি বাচ্চা না। চব্বিশ বছর বয়স হল। তিন মাস পরেই এম. এ. ফাইনাল পরীক্ষা দেব।

—তুই যে কচি বাচ্চা নেই, তা তো বুঝতেই পারছি।

বকুল হাসতে হাসতেই বলে, মা যখন একুশ বছরের, তখন দাদা হয় আর তার চার বছর পরেই দিদির জন্ম।

—তুইও তো বিয়ে-থা করে এতদিনে মা হতে পারতিস, কে তোকে বাধা দিয়েছে?

—যা হতে পারিনি, তা নিয়ে আলোচনা করে কী লাভ?

দু'চার মিনিট ও চুপ করে থাকে। ট্রেনও ছাড়ে। তারপর হাসতে হাসতে বলে, জানো সমুদা, আগে আগে দিদি ভাবত, তুমি আর আমি প্রেমে পড়েছি বলেই তুমি দিদিকে পাত্তা দাওনি।

—কী সব পাগলের মত কথা বলছিস!

—একটুও আজেবাজে কথা বলছি না। যা সত্যি তাই বলছি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তোমরা তো জানো না এ সব ব্যাপারে মেয়েরা কী ভয়ঙ্কর জেলাস হয়।

—হয় হোক। তুই তো জেলাস হস্‌নি, তাহলেই হল।

নালিকুল আসতেই আবার মুষলধারে বৃষ্টি আর ঝড় শুরু হয়। বকুল বলে, দেখছি তোমার ছাতি নেই। সেমিনারে যাচ্ছি বলে আজ আমিও ছাতি নিয়ে যাই নি।

—স্টেশনে নেমে একটা রিক্সা নিয়ে নেব।

—ট্রেন থেকে নেমে রিক্সায় উঠতে উঠতেই তো ভিজে এক সার হয়ে যাব! তাছাড়া এই বৃষ্টিতে রিক্সা পাওয়া যাবে কিনা কে জানে।

—না পাওয়া গেলে কী আর করা যাবে! হেঁটেই যেতে হবে।

একবার আকাশের দিকে তাকিয়েই বকুল বলে, বৃষ্টি দু'এক ঘণ্টার মধ্যে থামবে

বলে মনে হয় না।

—হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।

এইসব কথা বলতে না বলতেই হরিপাল এসে যায়। ওরা দু'জনেই নেমে পড়ে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বোধহয় ঝড়েই গাছ ভেঙে পড়ে কোথাও লাইন ছিঁড়ে গেছে।

স্টেশন চত্বর ছেড়ে রাস্তায় পা দিয়েই বকুল বলল, আলো নেই বলে বেঁচে গেলাম।

সৌম্য অবাক হয়ে বলে, সে কিরে?

—হ্যাঁ, সমুদা, ঠিকই বলছি।

ও একটু থেমে বলে, আজ ইউনিভার্সিটিতে ছেলেদের বিশেষ ভীড় থাকবে না বলে কায়দা করে জীনস্-এর প্যান্টের উপর লক্ষ্ণৌ-চিকনের পাঞ্জাবি পরে বেরিয়েছি। আলো থাকলে লোকজনের সামনে হাঁটতে পারতাম না।

—তোদের এই ধরনের পোশাক-আসাকের জন্যই ছেলেগুলো বাঁদরামী করতে উৎসাহ পায়।

বকুল আর কথা বলে না। সৌম্য এদিক-ওদিক এগিয়ে-পিছিয়ে ঘুরে-ফিরেও একটা রিক্সা দেখতে পেল না। বলল, নারে বকুল, কোথাও রিক্সা দেখছি না। চল, আমরা এগিয়ে যাই। হয়তো খানিকটা এগিয়ে গেলেই পেয়ে যাব।

—হ্যাঁ, তাই চলো।

একটু এগিয়েই সৌম্য বলে, এদিকে বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। তাই বোধহয় দোকানগুলোও আটটা বাজতে না বাজতেই বন্ধ হয়ে গেছে।

—এই বৃষ্টিতে কে কেনাকাটা করতে আসবে?

—তা যা বলেছিস।

ওরা আস্তে এগিয়ে যায়। রাস্তায় খানাখন্দের তো অভাব নেই। তাই সাবধান পা ফেলে। পথ প্রায় ফাঁকা। মাঝে-মধ্যে দু'একজনকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে। জি. ডি. স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছতেই পাশ দিয়ে ছাতা মাথায় উল্টোদিকে যেতে যেতে এক ভদ্রলোক বলেন, কে শঙ্কর নাকি?

—না আমি সৌম্য।

—ও সমু! আমি পরেশকাকু। উনি এগিয়ে গিয়েও একটু থামেন।

সৌম্য বলে, আপনি এই বৃষ্টির মধ্যেও বেরিয়েছেন?

—গিয়েছিলাম ললিতের বাড়ি তাস খেলতে। তখন তো ভাবতেও পারিনি, এতক্ষণ ধরে বৃষ্টি চলবে।

—কখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে?

—তখন তো পাঁচটাও বাজেনি। তার উপর সন্ধে থেকেই আলো নেই।

উনি না থেমেই প্রশ্ন করেন, তোর সঙ্গে কী তোর বড় ভাইঝি?

—না কাকু, এ হচ্ছে বকুল। চেনেন কী?

—আমাদের পারুলের বোন নাকি অন্য কেউ?

—অন্য কেউ না, এ পারুলের বোন বকুল।

—কলকাতায় কী তোরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলি?

—আমি গিয়েছিলাম এক সহকর্মীর বাড়ি নেমতন্ন খেতে। বকুল গিয়েছিল ইউনিভার্সিটির এক সেমিনারে। হঠাৎ ট্রেনে ওর সঙ্গে দেখা।

—ও! আচ্ছা।

বকুল বলে, এই লোকগুলোকে বঙ্গোপসাগরের জলে ছুঁড়ে ফেলা দরকার। ইনি সারাজীবন পুলিশের টিকটিকির চাকরি করেছেন তো। চিরকাল পরের পিছনে কাঠি দিয়েছেন। রিটায়ার করার পরও সন্দেহ করার বাতিক ছাড়তে পারলেন না।

সৌম্য একটু হেসে বলে, এইসব লোকের কথায় রাগ করে নাকি? এদের কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে...

আঃ! বলে বকুল পড়ে যেতেই সৌম্য দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কোনোমতে ওকে সামলায় ঠিকই কিন্তু অত বড় মেয়ের বুকে অমন করে হাত দেবার জন্য যেমন শিহরণবোধ করে, সেইরকমই লজ্জিত হয়। নিজেই নিজেকে মনে মনে বলে, আমি কি ইচ্ছে করে এভাবে জড়িয়ে ধরেছি? ও হঠাৎ চিৎকার করল বলেই ধরতে হল। তাছাড়া আমি না ধরলে তো পড়ে যেত।

এসব তো যুক্তি-তর্কের ব্যাপার। বকুল কিছু খারাপ ভাবল কিনা, তা'ও চিন্তা করে। যাইহোক সৌম্যর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরয় না।

দু'চার মিনিট কেউই কোনো কথা বলে না। তারপর বকুল বলে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে না ধরলে অন্তত আমার পা মচকে যেত।

—মচকে গেলেই ভালো হত।

—কেন?

—অন্তত তোর মতো বুড়ো ধাড়ী মেয়েকে আমায় টেনে তুলতে হত না।

—টেনে তুলে কী অপরাধ করেছ?

—অপরাধ করেছি কিনা জানি না কিন্তু তোর মতো মেয়েকে যেভাবে জড়িয়ে ধরে তুলেছি, সেটাও তো দু'জনের পক্ষেই অস্বস্তিকর।

—তুমি তো ইচ্ছে করে জড়িয়ে ধরো নি।

ও একটু থেমে বলে, সমুদা, তুমি জান না ভীড়ের ট্রামে-বাসে-ট্রেনে কত লোক আমাদের মতো মেয়েদের পাশে পেলে কী ধরনের অসভ্যতা করে।

—একটু-আধটু জানি বৈকি।

বকুল একটু কাছে এসে ওর একটা হাত ধরে বলে, তোমাকে কি আমি শুধু শুধু ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি।

—আর কিছু করিস না?

বকুল ঐ কথা শুনে থমকে দাঁড়ালেও সৌম্য কয়েক পা এগিয়ে যায়।

বকুল গুরুগম্ভীর হয়ে বলে, সমুদা, শুনে যাও।

সৌম্য দু'চার পা পিছিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, কী বলবি?

—মনে করো না, আমি দিদির মতো তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি আর তোমাকে নিয়ে রাত কাটাবার জন্য পাগল হয়ে উঠছি, কিন্তু তবুও আমি সবার সামনেই তোমাকে বলতে পারি, আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ।

ঐ বৃষ্টি, ঐ অন্ধকার কিন্তু তবুও খুশিতে ভরে ওঠে সৌম্যর মন। ডান হাত দিয়ে ওর মাথা ধরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, তা আমি জানি। আমিও কি তোকে কম ভালোবাসি।

বকুল বাঁ হাতের মধ্যে ওর ডান হাত নিয়ে বলে, আমি জানি সমুদা।

সামনের দিকে পা বাড়িয়েই ও বলে, ইদানিং আমার সম্পর্কে তোমাকে উদাসীন থাকতে দেখে দুঃখে আর অভিমানে আজ অনেক কথা বলে ফেললাম, তুমি রাগ করনি তো?

—তোর উপর কি আমি রাগ করতে পারি?

একটু চুপ করে থাকার পরই চৌধুরিপাড়ার মোড়ে এসে বকুল বলে, তুমি তো আলালের ঘরের দুলাল। এতক্ষণ ধরে বৃষ্টিতে ভিজে তোমার আবার না কিছু হয়।

—যদি কিছু হয়, তুই সেবা করে আমাকে ভালো করবি।

—যতদিন তিথি ব্যানার্জিকে ঘরে না আনছ, ততদিন নিশ্চয়ই...

সৌম্যর মাথায় যেন বজ্রপাত হয়। থমকে দাঁড়ায়। কয়েক মুহূর্ত যেন কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। তারপর বলে, পাগলের মতো কী আজেবাজে বকছিস!

—আজ আমরা তিন বন্ধু কে. সি. দাশের দোকানে মীট করে এক সঙ্গে ইউনিভার্সিটি যাই। দশটা বাজার পাঁচ-দশ মিনিট আগে পৌঁছে দেখি, শিবপুর থেকে শর্মিষ্ঠা এসে গেছে। আমরা দু'জনে যখন বসে আছি, তখনই দেখলাম, তিথি ব্যানার্জি মিষ্টি কিনে উল্টোদিকে পার্ক করা গাড়িতে...

সৌম্য আর ধৈর্য ধরতে পারে না। বলে, তারপর আমি পৌঁছবার পর পরই...

—হ্যাঁ।

—সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলি, আমাদের বিয়ে হচ্ছে?

বকুল সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, আমাদের বন্ধু অর্চনা তোমাদের দু'জনকে চলে যেতে দেখেই আমাদের কী বলল জান?

—কী?

—আমরাও কবে ঐরকম হ্যান্ডসাম স্বপ্নের নায়ককে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাব রে?

এতক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শীত করলেও সৌম্য ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে, তিথি ব্যানার্জিকে যখন আমাদের বাড়িতে দেখেছিস, তখন তার শ্বশুরমশাইকেও দেখেছিলি কী?

—হ্যাঁ, দেখেছিলাম।

—আজ আমাদের এক সহকর্মীর বাড়ি আমাদের সেক্শনের সবার নেমন্তন্ন ছিল। মিসেস ব্যানার্জি আমাকে তুলে নেবার পর কলেজ স্ট্রিট-আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে আরো তিনজনকে...

—সরি! আমি তো এসব জানতাম না, তাই হঠাৎ..

কথাটা শেষ না করেই বকুল ওর দুটো হাত ধরে বলে, সমুদা, প্লীজ রাগ করো না। আমি কথা দিচ্ছি, আমি আর কোনোদিন...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিন্তু এই ব্যাপারটা যদি পাঁচজনের কানে যায়, তাহলে...

—আমি কথা দিচ্ছি, কেউ কিছু জানবে না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমি কি তোমাকে অন্যের কাছে ছোট করতে পারি?

সৌম্য আপনমনে একটু হেসে বলে, সেটাও যে জানি না, তা নয়।

দু'চার মিনিটের মধ্যেই বকুল বাড়ির সামনে পৌঁছে যায়। ভিতরে ঢোকার আগে বলে, বাড়িতে গিয়েই গরম কফি খেও। তাহলে বোধহয়..

—আর তোকে হিতোপদেশ দিতে হবে না। আমি যাচ্ছি, বড্ড শীত করছে।

সৌম্য বাড়িতে পৌঁছেই কাপড়-চোপড় বদলে গরম কফি খায়। ভালো লাগে কিন্তু শুরু হল হাঁচি। বড় বৌদির কথামতো গরম গরম দুটো রুটি খেয়েই শুয়ে পড়ে। মৃত্তিকা একটা মোটা চাদর দিয়ে ওর গলা পর্যন্ত ঢেকে দেয়।

পরের দিন সকালে সৌম্য চোখ মেলে দেখে, মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর তিথি হাত-পা টিপে দিচ্ছে। ওদের পাশে দাঁড়িয়ে দুই বৌদি ওর দিকে তাকিয়ে আছেন।

খুব আস্তে আস্তে সৌম্য বলে, তিথিয়া মাদার, এখন ক'টা বাজে রে?

—ন'টা পাঁচ।

—কাল রাত্তিরে আমার জ্বর হয়েছিল, তাই না?

তিথি না, ওর ঠাকুমা বলেন, কাল মাঝরাত্তির থেকেই জ্বরের ঘোরে এমন কষ্ট পাচ্ছিলি যে, তখন থেকেই ওরা দুই বোন সারারাত তোর কাছে ছিল।

ছায়া ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে হাত দিয়ে বলেন, আমরা তো আজ সকালে উঠে জানলাম...

সৌম্য চাদরের ভিতর থেকে হাত বের করে কোনোমতে তিথির মুখখানা ধরে বলে, ইস্! তোরা সারারাত ঘুমোস নি?

তিথি একটু হেসে বলে, ওটা কোনো ব্যাপার না। এখন কেমন লাগছে?

—উঠতে ইচ্ছে করছে না।

কাবেরী বলল, ভাই, একবার একটু কষ্ট করে উঠে বসো। বিছানায় বসে বসেই মুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে ওষুধ খাবার পর আবার শুয়ে থেকো।

উঠতে ইচ্ছে না করলেও সৌম্য কোনোমতে বিছানায় বসে বসেই মুখ-টুখ ধুয়ে এক গেলাস দুধ খাবার পর আবার শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বকুল ঘরে ঢোকে।

ওকে দেখেই সৌম্য বলে, কীরে, তুই? ইউনিভার্সিটি যাস নি?

বকুল কিছু বলার আগেই তিথি বলে, নতুন পিসি তো ভোর ছ'টা থেকে প্রায় ঘণ্টা খানেক তোমার পাশেই ছিল।

সৌম্য কোনো কথা বলে না। শুধু বকুলের দিকে একবার তাকায়।

বকুল তিথিকে বলে, তুই মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে একটু শুয়ে থাক। আমি এখানে আছি।

তিথি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ঠাম্মা, তুমিও ওঠো। সকাল থেকে তোমার পেটেও তো কিছু পড়েনি।

—বকুলকে একলা ফেলে যাব? ছোট বৌমাও তো ডাক্তারের কাছে গেল। তা না হলে...

তিথি ঠাকুমার হাত ধরে টান দিয়ে বলে, ভালো কাকুর জ্বর তো অনেক কম। নতুন পিসি একলা থাকছে বলে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

বকুল তিথির মতোই সৌম্যর খাটে বসে ওর মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দেয়।

সৌম্য ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, মাথায় বিশেষ যন্ত্রণা করছে না কিন্তু সমস্ত শরীরে বিষের মতো ব্যথা!

—আমি তোমার গা টিপে দিচ্ছি। তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।

—এখন আর ঘুম আসবে না, অনেক ঘুমিয়েছি।

—আচ্ছা ঘুমোতে হবে না। তুমি চুপ করে শুয়ে থেকো।

সৌম্য পাশ ফিরে চোখ বুজে শুয়ে থাকে। পাঁচ-সাত মিনিট পর চোখ খুলে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, কাল তোকে খুব বকেছি, তাই না?

বকুল একটু হেসে বলে, তুমি আবার কখন বকুনি দিলে? আমিই তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করলাম।

কোনোমতে মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে সৌম্য বলে, ওকে কি ঝগড়া করা বলে? তুই কোনোদিনই আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবি না।

বকুল একটু হেসে বলে, তুমি বকুনি না দিলে শুধু শুধু আমি ঝগড়া করব কেন?

সৌম্য আর কথা বলে না। আগের মতোই চোখ বুজে শুয়ে থাকে। বকুল কখনো ওর মাথা টিপে দেয়, আবার কখনো চুলে বিলি কাটে, মুখে হাত বুলিয়ে দেয়।

একটু পরেই তিথি খেয়েদেয়ে উপরে এসে বকুলকে জিজ্ঞেস করে, ভালো কাকু কি ঘুমিয়েছে?

—তাইতো মনে হচ্ছে।

—দু'বার ওষুধ পড়েছে। মনে হয়, বিকেলবেলার মধ্যেই জ্বর-টর চলে যাবে।

—হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়, তবে পরশুর পরই সব অস্বস্তি চলে যাবে। এই ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা তিনদিন না ভুগিয়ে ছাড়ে না।

একটু পরেই বকুল ওকে বলে, ভোরবেলায় তোরা দুই বোন যেভাবে চায়ে ভেজানো নরম বিস্কুট মুখে দেবার পর সমুদাকে ওষুধ খাওয়ালি, তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

তিথি একটু হেসে বলে, ভালো কাকুর শরীর খারাপ হলেই তো আমরা দুই বোন ওকে ঠিক ছোট্ট বাচ্চার মতো আদর করে খাওয়াই।

ও একটু থেমে বলে, মা, ছোট মা ঐ সময় মুখে কিছু দিতে এলে ভালো কাকু ঠিক রেগে যেত কিন্তু আমাদের তো কখনই কিছু বলবে না। আমরা কিছু বললে ভালো কাকু কখনই না বলতে পারে না।

—তোরা ভাগ্য করে এমন কাকু পেয়েছিস!

—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

—তুই একটু শুতে যা। আমি তো আরো কিছুক্ষণ আছি।

—ভালো কাকুকে একলা রেখে চলে যেও না। মা এলে যেও।

—না, না, যাব না।

পরের দিনই সৌম্য অনেকটা সুস্থবোধ করে, তবে ঠিক করে বৃহস্পতিবারের

আগে অফিস যাবে না। তিথি বলে, ভালো কাকু, আমার একটা কথা শুনবে?

সৌম্য ওর কথার জবাব না-দিয়ে হাসতে হাসতে বড়বৌদির দিকে তাকায়।

ছায়া মেয়েকে বলেন, ভালো কাকু তোর কথা শুনবে না, তাই কখনও হয়।

তিথি বলে, ভালো কাকু, তুমি আরো দুটো দিন ছুটি নিয়ে একেবারে সোমবার জয়েন করো। তা না হলে হয়তো আবার...

—তুই অ্যাপ্লিকেশন লিখে দে। আমি সই করে দিচ্ছি। তারপর কেষ্টদাকে দিলেই...

—আর বলতে হবে না।

ছায়া হাসতে হাসতে মেয়েকে বলেন, আমাকে এইরকম একটা কাকু যোগাড় করে দিতে পারিস?

—পারব না কেন? আমি আজই কুমারটুলিতে অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি।

বিছানায় আধা শোয়া হয়ে বইপত্তর পড়তে পড়তেই সৌম্য মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে পূব দিকের জানলার দিকে তাকিয়ে রাধাচূড়া গাছের ফাঁক দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। বার বার মনে পড়ে গত রবিবারের কথা। সারদিন ধরে তিথি ব্যানার্জির সান্নিধ্যের কথা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওর লাবণ্যময় মুখখানা আর উজ্জ্বল দুটো চোখ।

সৌম্য আপনমনেই একটু হাসে। কী জানি এক অজানা সঙ্গীতের মিহি মিষ্টি সুরের মূর্ছনা বেজে ওঠে মনের মধ্যে। দেহ বন্দি থাকলেও মন যেন উড়ে যায় এক অচিন দেশের আনন্দ নগরীতে।

এসব ভাবতে ভাবতেই স্বয়ং তিথি ব্যানার্জি যেন ওর সামনে হাজির হয়। সৌম্য লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

কফির দুটো পেয়ালা ছোট্ট টেবিলের উপর রাখতে রাখতেই কাবেরী মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলে, এতক্ষণ ধরে কাকে ধ্যান করছিলে?

ঠিক সেই মুহূর্তে ছায়া এক কাপ কফি হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বলেন, কে আবার ধ্যান করছিল?

কাবেরী সামান্য একটু দৃষ্টি ঘুরিয়ে সৌম্যকে দেখিয়ে বলে, এ বাড়িতে যে রোমান্টিক হিরো আছে, সে ধ্যান করছিল।

ও ছায়ার পাশের মোড়ায় বসেই বলে, আমি দুহাতে দুকাপ কফি হাতে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু শ্রীমানের সেদিকে খেয়ালই নেই। উনি আকাশের দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী সুন্দরীর ধ্যানে মগ্ন।

ছায়া কফির পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে বলেন, ও কি প্রেমে পড়েছে যে সুন্দরীর ধ্যান করবে?

কাবেরী চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, পড়েছে মানে? প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সৌম্য কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলে, বড় বৌদি, এ তুমি বুঝবে না। যার প্রেমে পড়েছি, সে ছাড়া আর কে বুঝবে আমার গো'ন প্রেমের কথা, আমার মনের অবস্থা?

ছায়া একটু হেসে বলেন, কী জানি বাপু, তোমাদের কথাবার্তা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

কাবেরী সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের উপর হাত রেখে বলে, দিদি, আমি তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, সৌম্যকুমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

—প্রেমে পড়েছে তো বিয়ে করছে না কেন?

—দিদি, এ ছেলে বড় গভীর জলের মাছ। আরো একটু খেলাধূলা না করে বিয়ে করবে না।

ও প্রায় না থেমেই বলে, আজকাল ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে না। দীর্ঘদিন লীলাখেলার পর ওরা মালাবদল করে।

সৌম্য তির্যক দৃষ্টিতে একবার কাবেরীকে দেখেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলে, দেখছ বড় বৌদি, প্রেমের ব্যাপারে আমার স্বপনচারিণীর কী অভাবনীয় জ্ঞান!

কাবেরী বলে, থাক, থাক আর শাঁক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করতে হবে না।

হঠাৎ নিচে থেকে মৃত্তিকা চিৎকার করে, মা তোমরা নিচে এসো। ঠাম্মা ডাকছে।

ওরা দুজনে কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়েই নিচে যান।

সৌম্য টেবিল থেকে কাগজপত্র এনে অসমাপ্ত গল্পটা বার দুয়েক পড়েই ঠিক করে, আবার নতুন করে শুরু করবে। সম্ভব হলে রবিবারের মধ্যেই শেষ করে সোমবার অফিস ছুটির পর কোনো না কোনো কাগজের অফিসে পৌঁছে দেবে।

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর ও লেখালেখির বিষয়ে চিন্তা করে। বেশ কিছুদিন লেখালেখি বন্ধ রাখা ঠিক হয়নি। লেখালেখির সময় অবচেতন মনে চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে কিন্তু নিয়মিত না লিখলেই চরিত্রগুলো কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ে, হারিয়ে যায়। লেখালেখির মেজাজটাও চলে যায়।

সন্ধ্যের পর চণ্ডী আর কেষ্টদা আসেন ওকে দেখতে।

কেষ্টদা বলেন, কদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে এত দেরি হচ্ছিল যে কিছুতেই

আর তোকে দেখতে আসার সময় পাচ্ছিলাম না। তবে যাবার সময় ট্রেনে রোজই বকুলের সঙ্গে দেখা হয় বলে খবরটা পাচ্ছিলাম।

সৌম্য বলে, হ্যাঁ, ও রোজ দুবেলা আমাকে দেখে যায়।

চণ্ডী বলল, বকুল বলছিল, রবিবার তোরা দুজনে স্টেশনে নেমে রিক্সা না পেয়ে পুরো পথ ভিজতে ভিজতে এসেছিস। এতটা পথ ঐ তুমুল বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে এলে শরীর তো খারাপ হবেই।

—কিন্তু ঐ বৃষ্টির মধ্যে না এসেও তো কোনো উপায় ছিল না।

—কোনো দোকানে তো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারতিস।

—আর বলিস না! একে ঐ বৃষ্টি, তার উপর লোডশেডিং। তাছাড়া রবিবার বলে স্টেশনের আশেপাশের কোনো দোকানই খোলা ছিল না।

চণ্ডী একটু হেসে বলে, এবার বিয়ে কর। এই বয়সে কি ভাইঝি-বৌদিদের সেবা ভালো লাগে?

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমি বৌদিদের সেবা নেব না বলেই তো অসুখে পড়ি না।

সৌম্য হেসে বলে, তোর শরীর খারাপের খবর পেলে তো কেষ্টদার শালী ছুটে আসবে।

কেষ্টদা হাসে।

চণ্ডী বলে, সে তো সব সময় আসতে চায় কিন্তু কেষ্টদা এমন একটা মেয়ে পুলিশকে বিয়ে করেছে যে তার ভয়ে ও আসতে পারছে না।

কেষ্টদা বলে, আচ্ছা চণ্ডী, তুই এ পর্যন্ত কত মেয়েকে ভালোবেসেছিস?

—আমি তো শত শত সুন্দরী যুবতীকে ভালোবেসেছি, কিন্তু গোল হবে হবে বলেও শেষ পর্যন্ত সব বল গোলপোস্টের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সবাই হেসে ওঠে।

চণ্ডী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এই ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক আর সহ্য হচ্ছে না!

ওদের জন্য চা-টা নিয়ে সৌম্যর ঘরে পা দিয়েই ছোট বৌদি জিজ্ঞেস করে, চণ্ডী ঠাকুরপো, কী সহ্য হচ্ছে না?

—ছোট বৌদি, আমার দুঃখের কথা আর জানতে চেও না। শুনলে তুমি কেঁদে ফেলবে।

কেষ্টদা ছোট বৌদির দিকে তাকিয়ে বলে, চণ্ডী শত শত মেয়ের প্রেমে পড়লেও কোনো মেয়ে এগিয়ে আসছে না বলে...

ঐটুকু শুনেই ছোট বৌদি বলে, কিচ্ছু ভেবো না ভাই! আমি কথা দিচ্ছি, তোমার

বন্ধুর বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই তোমাকেও বিয়ের পিঁড়িতে বসাবো।

চণ্ডী বলে, ছোট বৌদি, এগ্রিড! বিয়ে তখনই দিও কিন্তু এখন ফুলশয্যা আর হনিমুন করার ব্যবস্থা করে দাও।

সবাই আবার হাসিতে ফেটে পড়ে।

পরের দিন সকালেই এই বিয়ে পাগল চণ্ডীকে নিয়েই একটা গল্প লেখা শুরু করল সৌম্য।...

বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশী পরিচিতদের বিয়েতে চণ্ডী সব সময়ই চুনট করা শান্তিপুরী ধুতি গরদের পাঞ্জাবি পরে শরীরের এখানে ওখানে সুগন্ধ ছড়িয়ে যায়। স্বপ্নমাখা চোখ দিয়ে দেখে অবিবাহিত মেয়েদের। আলাপ-পরিচয়ের পর হাসি-ঠাট্টায় জমিয়ে দেয় আসর। ছন্দা-নন্দা-বন্দনারা হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। হ্যান্ডশেক করে। আমন্ত্রণ জানায় দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে ওখানে যাবার।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চণ্ডী বলে, এত কাণ্ডের পরও দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে আসতে হবে? একটু আলাদা প্রাইভেটলি শুধু তুমি আর আমি দেখা করতে পারি না?

দীপা পড়ন্ত শাড়ির আঁচল বুকের উপর তুলে দিতে দিতে বলে, অব কোর্স পারি। তবে পার্ক স্ট্রিটের ভালো রেস্তোরাঁয় খাওয়াতে হবে।

—হোয়াই পার্ক স্ট্রিট? উই উইল হ্যাভ ডিনার অ্যান্ড ডান্স অ্যাট গ্র্যান্ড।

মেয়েরা হাততালিতে ফেটে পড়ে।

দীপা হাসি চেপে বলে, তারপর বাস আর লোকাল ট্রেন ঠেঙিয়ে এই শেওড়াফুলি আসতে পারব না। গ্র্যান্ডে রাত কাটিয়ে সকালে ফিরব।

ওর কথা শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ে অন্য মেয়েরা।

আনন্দে উত্তেজনায় চণ্ডী বিদ্যুৎ গতিতে দীপার একটা হাত টেনে নিজের বুকে চেপে ধরে বলে, ডার্লিং! আই ক্যান ডাই ফর ইউ।

দিন পনেরো পর এই নতুন বৌদি আর দীপকদা এসে ওর হাতে একটা নেমন্তন্নর চিঠি দেয়। চণ্ডী খামের ভিতর থেকে কার্ড বের করে—বন্ধু, আসছে ১লা (১৫ই জানুয়ারি) আমার আবাল্য বন্ধু প্রদীপ্তকে বিয়ে করছি। সেই আনন্দ-মিলন সন্ধ্যায় তোমাকে আসতেই হবে।

—তোমাদের দীপা

চণ্ডী ম্লান হাসি বলে, দীপকদা, এর চাইতে আমার ফাঁসির হুকুমের অর্ডার নিয়ে এলে তো আমি অনেক শান্তি পেতাম।

নতুন বৌদি বলে, হতাশ হচ্ছো কেন? আমি শিগ্‌গিরই তোমার ব্যবস্থা করছি।

বছর বছর কত দীপা আসে আর চলে যায়। তারপর কেষ্টদার বিয়েতে ওর শালী সায়ন্তনীর একটু স্পর্শ, একটু সান্নিধ্য ওকে পাগল করে দেয়। রাত গভীর হবার পর বাসর ঘরের মজলিশে চণ্ডী তো ওর একটা হাত ধরে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে
প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি
হিয়া মোর কান্দে
পরান পিরীতি লাগি
থির নাহি বান্ধে।।...

আরো, আরো কত কি! তবু সায়ন্তনীও শরতের মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে অন্য হৃদয়-রাজ্যে চলে যায়।

তারপর?

তারপর আর কি! হতাশা দীর্ঘশ্বাস। আশাভঙ্গ, স্বপ্নভঙ্গের বোঝা বুকে নিয়েই কেটে যায় দিনের পর দিন। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

সেদিন কৈলাস পাঠাগারে যাবার পথে চণ্ডাল কালীকে প্রণাম করে দু'পা এগুতে না এগুতেই নীতা চণ্ডীকে দেখেই বলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

চণ্ডী একটু হেসে বলে, তোর সঙ্গে তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সকাল-বিকাল দেখা হচ্ছে। আবার কী কথা আছে?

নীতা আঁচলটা একটু টেনে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, তোমার না হয় শখ-আনন্দ নেই কিন্তু আমি তো সত্তর বছরের বুড়ি হইনি। আমার তো শখ আনন্দ থাকতে পারে। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, সামনের ফাল্গুনের মধ্যে তুমি বিয়ে না করলে আমি কিন্তু সারা জীবনেও বিয়ে করব না।

এই কাহিনীই আরো একটু বিস্তৃতভাবে লিখে সোমবার অফিসের পর আনন্দবাজারে দিয়ে এল সৌম্য।

সোমবার অফিসেও ভারী মজা হল। বড়দা বললেন, তোমাদের হরিপালের কেষ্টবাবুর কাছে শুনলাম, এর আগের রবিবার কলকাতা থেকে ফেরার সময় খুব

বৃষ্টিতে ভিজেই অসুস্থ হয়ে পড়।

উনি একটু থেমে বলেন, রবিবার কি সিনেমা-থিয়েটার দেখতে কলকাতা এসেছিলে?

—না, বড়দা, সিনেমা-থিয়েটার দেখতে আসিনি।

তিথি ব্যানার্জি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, তবে কি বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে কলকাতা এসেছিলেন?

ওর কথায় মেয়েরা হেসে ওঠেন। রেখাদি ব্যাগ থেকে পান-জর্দার কৌটো বের করতে করতে মিসেস ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে বলেন, সৌম্য আমাদের সবার সামনে কি এসব প্রাইভেট ব্যাপার ফাঁস করে দেবে?

সৌম্য রেখাদির দিকে তাকিয়ে বলে, এবার কি আসামী জেরার জবাব দিতে পারে?

তিথি চাপা হাসি হেসে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।

সৌম্য ওর দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি এক বান্ধবীর জন্যই সেদিন কলকাতা এসেছিলাম।

কে যেন প্রশ্ন করেন, বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলে?

—না, না, সিনেমায় যাইনি। বৃষ্টির মধ্যে আমরা দুজনে কলকাতা চষে বেড়িয়েছি।

ত্রিদিববাবু বলেন, ওরে সৌম্য, তুই তো হিন্দি ফিল্মের হিরো-হিরোইনদের রেকর্ডও ভেঙে দিলি দেখছি।

—ত্রিদিবদা, কী করব বলুন। একে লাবণ্যময়ী পরমাসুন্দরী বান্ধবীর অনুরোধ, তার উপর শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা। বোধহয় স্বয়ং বুদ্ধদেবও এ সুযোগ ছেড়ে দিতেন না।

ওর কথায় সবাই হেসে ওঠেন কিন্তু শুধু সৌম্য ছাড়া কেউই খেয়াল করে না, মুহূর্তের জন্য তিথির চোখ-মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কথাটা বলে ফেলেই সৌম্যর খেয়াল হয়, অনুভব করে, মুহূর্তের দুর্বলতায় এই ধরনের চাপল্য প্রকাশ না করাই উচিত ছিল। মনে মনে একটু লজ্জিত হয়। বোধহয় অনুতপ্তও। সারাদিনেও ও একবারের জন্যও তিথির দিকে চোখ ফেরায় না, ফেরাতে পারে না। এমনকি ছুটির পর মুখোমুখি হবার ভয়ে পৌনে পাঁচটাতেই বড়দার অনুমতি নিয়ে ও বেরিয়ে যায়।

রাত্রে শুয়ে শুয়েও সৌম্য কত কী ভাবে। রূপে, গুণে, চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য তিথি ব্যানার্জিকে নিশ্চয়ই ভালো লাগে। আরো ভালো লাগে ওর মুখের হাসি,

কথাবার্তা আর সান্নিধ্য। কিন্তু...

ভদ্রমহিলা বিবাহিতা। বিয়ের পর পরই ওর স্বামী বিদেশ চলে যান। তারপর আর দেশে ফেরেন নি, কিন্তু যে কোনোদিনই তো ফিরতে পারেন। যত আকর্ষণই থাক, যত মাধুর্যই থাক, এইরকম মহিলার সঙ্গে কি এত মেলামেশা ভালো? নাকি কাম্য? নাকি শোভনীয়?

না, কখনই না।

তিথি ব্যানার্জি ওর সহকর্মী। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে হৃদ্যতা বন্ধুত্ব থাকতে পারে কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। অন্তত সীমা থাকা একান্তই কাম্য।

সৌম্য সন্ন্যাসী না। সে চিরকুমার থাকতেও চায় না। দু-এক বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই ওকে বিয়ে করতে হবে। যে মেয়ের সান্নিধ্যে আর মাধুর্যে ওর জীবন ভরে উঠবে, সেই রকম মেয়েকেই ও বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে সে শ্রীময়ী হবে, লাবণ্যময়ী হবে।

সত্যি কথা বলতে কি সৌম্য প্রথম দিন তিথি ব্যানার্জিকে এক পলকের জন্য দেখেই স্বপ্নলোকের মানস-রাজ্যে উড়ে যায়। মনে মনে বলে, এই তো আমার স্বপনচারিণী। এরই জন্য বোধহয় যুগ যুগান্তর ধরে পৃথিবীর সমস্ত গ্রাম-গঞ্জে শহরে-নগরে অরণ্য-পর্বতে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। না, তাকে পাইনি। হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি আমার চিরদিনের চিরপরিচিত চিরনির্ভর হরিপালে। তবু তো মনে শান্তি পাইনি। আত্মীয়-স্বজন পরিচিতদের চোখের আড়ালে বার বার ছুটে গেছি আমাদের চণ্ডালী কালীর কাছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের কয়লাঘাটার রেলের অফিসের এই প্রায়ান্ধকার ঘরেই আমার মানসীর দেখা পেলাম! কী আশ্চর্য!

সৌম্য বোধহয় এক মুহূর্তের ভগ্নাংশ সময়ের জন্য চোখ বন্ধ করে, মনে মনে চণ্ডালী মাকে প্রণাম করে বলে, মা, তুমি সত্যিই করুণাময়ী।

পর মুহূর্তে বজ্রপাত!

সিঁথিতে ঐ অতি সামান্য সিঁদুরের স্পর্শ দেখেই সৌম্য মানসলোকের আনন্দধাম থেকে ছিটকে পড়ে মাটির পৃথিবীতে।

সেই দিন সেই মুহূর্তেই ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, না, না, ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবে না। কখনই না।

তবু তিথি ব্যানার্জি যখনই অফিসের মধ্যে পা দেয়, তখনই যেন বসন্তের দমকা হাওয়ায় ও ভেসে যায় ; মুহূর্তের জন্য ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত ভুলে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ওকে দেখে। না দেখে পারে না।

শুধু কি তখন?

সারাদিন আসানসোল বা ধানবাদ মুঘলসরাই বা হাওড়ার ফাইল নিয়ে কাজ করার ফাঁকেও ও বার বার ওকে এক ঝলক দেখে নেয়।

তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। দেখাশুনা মেলামেশা অনেক হয়েছে। সামাজিক লঙ্ঘন রেখা উপেক্ষা করতে পারবে না জেনেও সৌম্য যেন মনের মধ্যে মধু-লোভী ভ্রমরের গুঞ্জন শুনতে পায়। সারাদিনের ক্লান্তির পর জনাকীর্ণ তারকেশ্বর লোকালে বসেও কখনো কখনো দূরের নীল আকাশের মধ্যেও যেন মাঝে মাঝে ঐ লাবণ্যময়ীর মুখখানা ভেসে ওঠে। রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলেও তো ঐ একজনের চিন্তায় আর ঘুম আসে না।

তবু সৌম্য জানে, তিথি ব্যানার্জিকে নিয়ে এইসব মানস বিলাসের অধিকারও ওর নেই। মোহের ঘোরে এগিয়ে গেলে ফল শুভ হবে না।

সেই স্তব্ধ মৌন অন্ধকার রাত্রেই শুয়ে শুয়ে সৌম্য প্রতিজ্ঞা করে, এসব চাঞ্চল্য, মোহ বিসর্জন দিয়ে সে মন প্রাণ দিয়ে লিখবে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সারাদিন বাড়ি বসে লিখবে।

পরের দিন অফিসে পৌঁছেই ও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে যোগেনবাবুর পাশে বসে বলে, বড়দা, একটা জরুরি প্রাইভেট কথা ছিল।

যোগেনবাবু পাশ ফিরে চাপা গলায় বলেন, হ্যাঁ বলো।

—কতকগুলো জরুরি কাজের জন্য মাস খানেকের ছুটি দরকার।

উনি অবাক হয়ে বলেন, মাস খানেক?

—হ্যাঁ, বড়দা।

সৌম্য মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, সম্ভব হলে কাল থেকেই আমি ছুটি চাই। জরুরি দরকার না হলে আমি কখনই আপনাকে এভাবে অনুরোধ করতাম না।

যোগেনবাবু একটু ভেবে বলেন, তুমি তো কোনোদিনই এভাবে ছুটি চাওনি। তাই না বলব না। তুমি অ্যাপ্লিকেশন দাও, একটু পরেই সাহেবের কাছে যাচ্ছি। দেখি, উনি কী বলেন।

সৌম্য ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, বড়দা, প্লীজ, ছুটির কথা আগে থেকে এ ঘরের কাউকে বলবেন না। আমার ছুটি শুরু হবার পরই বলবেন।

বড়দা একটু হেসে বলেন, ঠিক আছে, বলব না।

ঠিক সেই সময় রেখাদি আর তিথি ঘরে ঢোকে। রেখাদি নিজের টেবিলের দিকে এগুতে এগুতেই বলেন, কী ব্যাপার সৌম্য? সাত সকালেই বড়দার সঙ্গে কী এত আলোচনা হচ্ছে?

সৌম্য ওখান থেকে উঠে নিজের টেবিলের দিকে পা বাড়িয়েই বলে, বড়দার এক বাল্যবন্ধুর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে আমার বড়দার কাছে। তাই...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই তিথি বলে, তাহলে আমরা বিয়ের ভোজ খাচ্ছি কবে?

—আমাদের বাড়িতে তো কোনো ভোজ হয় না। শুধু খিচুড়ি খাওয়ানো হয়।

রেখাদি বলেন, দোহাই সৌম্য, বিয়েতে যেতে বলিস না। খিচুড়ি খাবার জন্য হরিপাল যেতে পারব না।

—বাঁচালেন রেখাদি।

যোগেনবাবু এগারটা নাগাদ ফাইলপত্র নিয়ে সাহেবের কাছে গিয়েই সৌম্যর ছুটির দরখাস্তও রেখে আসেন। বেলা আড়াইতে নাগাদ সাহেব ওকে ডেকে পাঠিয়ে দু-একটি ফাইলের ব্যাপারে কিছু তথ্য নেবার পর বলেন, দেখছি সৌম্যবাবু এক মাসের ছুটি চেয়েছেন আর আপনিও লিখেছেন, ওকে দেওয়া যেতে পারে।

—হ্যাঁ স্যার।

—ওকে এতদিন ছুটি দিলে আপনার অসুবিধে হবে না?

—স্যার, অসুবিধে হলেও আমি ম্যানেজ করে নেব।

যোগেনবাবু একটু থেমে বলেন, পুরনোদের মধ্যে সৌম্য ছুটি নেয় না বললেই চলে। তাছাড়া ওর অনেক ছুটি পাওনাও আছে।

সাহেব সৌম্যর দরখাস্তের উপব খচ্ খচ্ করে লিখে দিলেন, লিভ গ্রান্টেড উইথ ফুল পে।

যোগেনবাবু নিচে নেমে ঘরে ঢুকতেই সৌম্যর দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন, হয়ে গেছে। তারপর নিজের চেয়ারে বসেই বলেন, সৌম্য, আজ পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই পালিও না। ঐ মথুরানাথ দাস কোম্পানির ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে বলে সাহেব তোমাকে পাঁচটা নাগাদ ডাকবেন।

সৌম্য শুধু বলে, ঠিক আছে।

পাঁচটা নাগাদ অন্য সবাই চলে যেতেই সৌম্য যোগেনবাবুর কাছে যায়। বলে, বড়দা, সাহেব কী জানতে চান?

উনি একটু হেসে বলেন, ঘোড়ার ডিম জানতে চান। তোমার কাছে যে কটা ফাইল আছে, আমাকে দিয়ে যাও।

সৌম্য ফাইলগুলো এনে দিতেই উনি জিজ্ঞেস করেন, এবার বলো তো এত লম্বা ছুটি নেবার কারণ কী?

—লেখালেখি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে নানা কারণে, অথচ অনেকেই আমার লেখা সম্পর্কে বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছে। ছুটি নিচ্ছি শুধু লিখব বলে।

যোগেনবাবু একটু হেসে বলেন, এতদিন এই শুভবুদ্ধির উদয় হয়নি কেন?

—সত্যি বড়দা, খুব ভুল করেছি।

—তুমি ভালো করে লেখো। আমাদের মতো শুধু কেরানিগিরি করে জীবনটাকে নষ্ট করো না।

—হ্যাঁ বড়দা, ভালো করে লেখারই চেষ্টা ক'বব, তবে কেরানিগিরিও আমি ছাড়ব না।

যোগেনবাবু বাড়ি যাবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই একটু হেসে বলেন, ভুলে যাও কেন বিমল মিত্রও তো একদিন রেলের চাকরি করেছেন ; উত্তমকুমারও এই সামনের পোর্ট কমিশনারের অফিসে কেরানি ছিল।

দরজার দিকে এগুতে এগুতে উনি বলেন, এতকালে তুমিও যে ওদের মতো বিখ্যাত হবে না, তা কে বলতে পারে?

—না, না, বড়দা, ওদের সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। অত বিখ্যাত হবার যোগ্যতা আমার নেই।

—হবে কি হবে না, তা তুমিও জানো না আমিও জানি না। তবু আমরা আশা করব না কেন?

যোগেনবাবু হাঁটতে হাঁটতে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, তুমি বিখ্যাত হলে আমরাও তো গর্ব করে তোমার কথা দশজনের কাছে বলতে পারব।

সৌম্য আর কোনো কথা না বলে ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে আপনি আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন আপনাদের সম্মান রাখতে পারি।

ও সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া রওনা হয় না। যোগেনবাবুকে বাসে তুলে দেয়। উনি বাসে ওঠার আগে বলেন, ছুটির মধ্যে কোনো কারণে এদিকে এলে একবার দেখা করে যেও।

—না, বড়দা, ছুটির মধ্যে কলকাতা এলেও অফিসে আসব না। যদি শনি-রবিবার আসি, তাহলে আপনার বাড়িতে গিয়েই দেখা করব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো, খুব খুশি হব।

না, তখনও সৌম্য হাওড়া স্টেশন যাবার জন্য লঞ্চ ধরতে যায় না। কিছুক্ষণ আপনমনেই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবার পর রাজভবনের দক্ষিণ দিকে তিলকের স্ট্যাচুর পাশে বসে। না, তিথি ব্যানার্জিকে না, বার বার মনে মনে রোমন্থন করে

যোগেনবাবুর কথাগুলো। প্রতিটি কথায় যেমন স্নেহ, সেইরকমই মমত্বর প্রকাশ। রেলের অফিসে দরখাস্ত দেবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছুটি মঞ্জুর। কল্পনাই করা যায় না। শুধু এই মানুষটির জন্যই এই অসম্ভব সম্ভব হল।

ও আরো কত কি ভাবে। শুধু লেখালেখির জন্য না, তিথি ব্যানার্জি থেকেও একটু দূরে সরে থাকার জন্যও এইরকম লম্বা ছুটি নেওয়া খুবই দরকার ছিল।

তাছাড়া আরো একটা কারণে এই ছুটি নেওয়া ভালো হয়েছে। তিথি ব্যানার্জিও রক্ত-মাংসের মানুষ। আর দশজনের মতো সেও নিশ্চয়ই সুখে-শান্তিতে আনন্দ-খুশিতে জীবন কাটাতে চায়। চায় প্রিয়জনের সান্নিধ্য ভালবাসা। সৌম্য জানে, এটা অন্যায় না, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু উনি যেন নিঃসঙ্গতার বেদনা চাপা দেবার জন্য দিন দিনই ওর সান্নিধ্যের জন্য বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

সৌম্য নিজেকেও দূরে সরিয়ে রাখেনি। চেষ্টাও করেনি কিন্তু আজ ও বুঝতে পেরেছে, এভাবে মেলামেশা করলে ভবিষ্যতে দুজনকেই চোখের জলের বন্যা বইতে দিতে হবে। এই দীর্ঘ ছুটি, দীর্ঘদিনের অদর্শন ভালোই হবে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়। চারদিকে আলো ঝলমল করে ওঠে। সৌম্য একবার হাতের ঘড়ি দেখে। একটু পরই ছ'টা দশের ট্রেন ছাড়বে। এর পর ছ'টা চল্লিশ। না, তবু ও ওঠে না। বসে থাকে। চারপাশের মানুষ দেখে। কেউ ত্বরিত পদক্ষেপে বাড়ি ফেরার বাস ধরার জন্য চলেছেন, কেউ শ্লথ গতিতে হাঁটছেন চীনাবাদাম চিবুতে চিবুতে। আবার দু'চারজন বন্ধু বা সহকর্মীকেও হাসি-ঠাট্টা করতে করতে পাশ দিয়ে যেতে দেখছে। আবার কেউ কেউ বান্ধবীকে নিয়ে ঘাসের উপর বসে মনের কথা বলছে। কোনো মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুরের স্পর্শ আছে, কারুর নেই। যাদের সিঁথিতে সিঁদুর আছে, তারা কি স্বামীর সঙ্গে গল্প করছে? নাকি অফিসের সহকর্মীর সান্নিধ্যে কিছু সময় কটিয়ে নিজের বিবাহিতা জীবনের কোনো অপূর্ণতার বেদনা দূর করার চেষ্টা করছে? এদের মধ্যে কেউ মায়াদি না তো?

চার-পাঁচজন মহিলাকে কথাবার্তা বলতে বলতে সামনে দিয়ে যেতে দেখেই সৌম্য সেদিকে ঘাড় ঘোরায়। কিছুদূর এগিয়েই ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে কী যেন দেখেন। তারপর ওরা তিলকের স্ট্যাচুর দিকেই আবার এগিয়ে আসেন। সৌম্য দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়।

হঠাৎ একজন মহিলা প্রায় ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, সৌম্য, তুই এখানে?

সৌম্য সঙ্গে সঙ্গে মহিলার দিকে তাকিয়েই গলা চড়িয়ে বলে, সোহিনী তুই!

—হ্যাঁ আমি।

সোহিনী কোনো ভূমিকা না করেই ধপ্ করে ওর পাশে বসেই বন্ধুদের বলে,

বসো বসো। আলাপ করিয়ে দিই।

সৌম্যও ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, প্লীজ আপনারা বসুন।

ওরা বসতে না বসতেই সোহিনী এক গাল হেসে বলে, যার গল্প আমরা দল বেঁধে পড়ি, এ হচ্ছে সেই সৌম্য সরকার।

সৌম্য সোহিনীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, তুই এমনভাবে বলছিস যেন আমি একজন বিখ্যাত লেখক।

একজন মহিলা বলেন, বিখ্যাত না হলেও সুনাম তো অর্জন করেছেন।

—সে আমার কৃতিত্ব না, সোহিনীর প্রোপাগাণ্ডার জোরে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সোহিনী জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে সৌম্য, কোথায় চাকরি করছিস?

ও মুহূর্তের জন্য না থেমেই আবার বলে, কাকে বিয়ে করলি?

—আগে বল, তুই কেন বিয়ে করিসনি। তারপর আমার কথা বলব।

সৌম্য প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে, অর্পণকে আর কতদিন ঘোরাবি?

সোহিনী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সৌম্যর হাতের উপর একটা হাত রেখে বলে, ঐ দুঃস্বপ্নের কথা আর জিজ্ঞেস করিস না। ইউনিভার্সিটিতে যে সোহিনীকে দেখেছিস, সে মরে গেছে।

—তার মানে?

একজন একটু বয়স্কা মহিলা বললেন, খুবই দুঃখের ব্যাপার।

সৌম্য আর ধৈর্য ধরতে পারে না। সোহিনীর হাত চেপে ধরে বলে, প্লীজ বল, কী হয়েছে।

সোহিনী একটু শুকনো হাসি হেসে বলে, এম. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুতে না বেরুতেই কলকাতা টেলিফোনের এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রেগন্যান্ট হলাম। তারপর সিজারিয়ান করতে হবে শুনে তাড়াহুড়ো করে ও অফিস থেকে আসার সময় প্রায় মেডিকেল কলেজের সামনেই বাস চাপা পড়ে মারা গেল।

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ইমার্জেন্সীতে যখন ওর ডেডবডি এসে পৌঁছল, ঠিক তখনই লেবার রুমে আমার ছেলের জন্ম হল।

—ইস!

শুনেই সৌম্যর মাথা ঘুরে যায়।

সোহিনী বলে যায়, স্বামী মরে গেলেও অনেক উপকার করে গিয়েছে। কলকাতা টেলিফোনে কেরানির চাকরি ছাড়াও ইন্সওরেন্সের প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার টাকা

পেয়েছি। এ ছাড়াও অফিস থেকেও প্রায় কুড়ি হাজার পেয়েছি।

ও একটু বিচিত্র হাসি হেসে বলে, অদৃষ্ট ভালো না হলে হাইকোর্ট পাড়ার এক টাইপিস্টের মেয়ে এত টাকা পায়?

দু'চার মিনিট সৌম্য কোনো কথা বলতে পারে না। তারপর জিজ্ঞেস করে, ছেলের কী নাম রেখেছিস?

—উচিত ছিল দুঃখীরাম নাম দেওয়া কিন্তু নাম রেখেছি তথাগত।

ও একটু থেমে বলে, ও যাতে দুঃখ জয় করতে পারে, তাই ঐ নাম রেখেছি।

—তথাগত কত বছরের হল?

—আগামী রবিবার ওর তিন বছর পূর্ণ হবে।

সৌম্য কাঁধের ঝোলা থেকে ছোট্ট একটা নোটবই আর বলপেন বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, তোর ঠিকানাটা লিখে দে।

সোহিনী ঠিকানা লিখে নোটবই বলপেন ফিরিয়ে দিতেই ও বলে, তুই আমহার্স্ট স্ট্রিটে থাকিস?

—হ্যাঁ। ওটাই আমার শ্বশুরবাড়ি।

—তোর শ্বশুরবাড়িতে কে কে আছেন?

—শুধু শ্বশুরমশাই ; আর দুই ননদই মধ্যপ্রদেশে থাকে।

—শাশুড়ি নেই?

—উনি বহুকাল মারা গিয়েছেন।

—আমি যদি রবিবার বিকেলের দিকে আসি তোর কোনো আপত্তি নেই তো?

সোহিনী এক গাল হেসে বলে, তুই সত্যি আসবি?

সৌম্যও একটু হেসে বলে, ইউনিভার্সিটিতে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতাম বলে কি তোর ছেলের জন্মদিনেও যেতে নেই?

ওর দুটো হাত ধরে সোহিনী বলে, নিশ্চয়ই আসবি, খুব খুশি হব।

ও সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে, তুই কি এখনও সেই তারকেশ্বরের ওদিকেই থাকিস?

—হ্যাঁ, হরিপালেই থাকি। আর হ্যাঁ, আমি কিন্তু আমার তিনটে ছেলেমেয়েকেও সঙ্গে আনব।

সোহিনী অবাক হয়ে বলে, তুই কবে বিয়ে করলি যে এরই মধ্যে তিনটে ছেলেমেয়ে হয়ে গেল?

—বিয়ে তো করিনি।

—তবে...

—ওরা ভাইপো-ভাইঝি হলেও ওরাই আমার ছেলেমেয়ে, ওরাই আমার মা-বাবা, ওরাই আমার ভূত-ভবিষ্যত।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের নিশ্চয়ই আনবি। ওরা এলে খুব ভালো হবে।

আধা ফাঁকা তারকেশ্বর লোকালে বসে সৌম্য শুধু সোহিনীর কথাই ভাবে। মনে করে ইউনিভার্সিটির হাসিখুশি ভরা দিনগুলোর কথা। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সন্ধ্যায় দেখা ওর বিষণ্ণ বেদনা:' ভরা মুখখানা।

পরের দিন সকালেই সৌম্য নোট বই আর খাতাপত্তর দেখে ছক কষে নেয় লেখালেখির। তারপর দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করার পরই শুরু করে লেখালেখি। বেলা পড়ে এলে নীচে যায়, চা খায় ; বাবা-মা দাদা-বৌদিদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। সন্ধে ঘুরে যাবার পর পরই আবার নিজের ঘরে এসে রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত লেখে। রাত্রের খাওয়ার আগে-পরের সময়টুকু কাটায় তিথি-মৃত্তিকা-হিন্দোলের সঙ্গে।

দিনের পর দিন সৌম্য এইভাবেই লেখালেখি করে। বন্ধুদের সঙ্গে দু'এক ঘণ্টা গল্পগুজব করতেও বাইরে যায় না। সপ্তাহে এক-আধদিন রাত সাড়ে দশটা - এগারোটায় আবার লিখতে বসে।

ওকে সত্যি লেখার নেশায় ধরেছে। যখন লেখে না, তখনও যেন ও কত কি চিন্তা করে। বোধহয় আপনমনেই কাহিনীর বিন্যাস বা চরিত্রগুলোকে নিয়ে মগ্ন থাকে। বাড়ির সবাই যেমন বিস্মিত, তেমনই খুশি।

এইভাবেই পুরো দুটো সপ্তাহ কেটে যায়।

সেদিন বিকেলের দিকে চা খেতে খেতে বৌদিদের সঙ্গে গল্পগুজব করে আবার লিখতে বসেই দেখে, পেপার ওয়েটের নীচে ছোট্ট একটা চিরকুট।...ভাল কাকু, তোমার সঙ্গে জরুরী প্রাইভেট কথা আছে। —তোমার তিথিয়া মাদার।

সৌম্য কাগজের টুকরোটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আপনমনে একটু হাসে। ও জানে, তিথিয়া মাদার ওর গলা জড়িয়ে ধরে এমনভাবে আবদার করবে যে ও কিছুতেই না বলতে পারবে না। শুধু এই তিথি না, তিনটে ছেলেমেয়ের কারুরই আবদার ও অগ্রাহ্য করতে পারে না। তবে সৌম্যর স্থির বিশ্বাস আছে, ওরা কোন অন্যায় আবদার করতে পারে না। অন্যায় বা অহেতুক আবদার করার মত প্রশ্রয় ওরা কোনদিনই পায়নি।

তিন ভাইবোনের আবদার করার ধরনও ভারী ভাল লাগে সৌম্যর।

হিন্দোলবাবু কোলের উপর বসে দু'হাত দিয়ে সৌম্যর গলা জড়িয়ে গাল ফুলিয়ে আদো আদো ভাবে বলবে, জানো ভালো কাকু, কী হয়েছে?

—কী হয়েছে বাবা?

—আমার ব্যাটের একটা দিকের খানিকটা কাঠই নেই। খুব জোরে মারলেও বল কিছুতেই বাউন্ডারিতে যাচ্ছে না।

সৌম্য চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, সেকি সোনা বাবা? এ কথা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?

—বলব কখন? তুমি তো সব সময়ই ব্যস্ত।

—কিন্তু ব্যাট ভেঙে যাওয়া তো সিরিয়াস ব্যাপার। এই কথাটা তোমার আগেই বলা উচিত ছিল।

ও প্রায় না থেমেই বলে, কাল-পরশুই তোমাকে এমন একটা ব্যাট এনে দেব, যা দিয়ে বল মারলে প্রত্যেকটা বল বাউন্ডারি পার হয়ে যাবে।

হিন্দোল অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, ভাল কাকু, ঠিক ঐ রকম ব্যাটই আমার চাই।

মৃত্তিকা আবদার করার ধরণ অন্য। সে হঠাৎ সৌম্যর পাশে শুয়ে কিছুক্ষণ একথা সে-কথা বলার পর বলবে, জানো ভাল কাকু, আজ অভিনন্দা কী বলেছে?

—কী বলেছ মা?

—আমার তো দিদির মত অত সালোয়ার-কামিজ নেই। তাই যে দু'তিনটে আছে, সেগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিকেলে পরে বন্ধুদের বাড়ি যাই।

ও একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, তাই তো আজ অভিনন্দা বলছিল, তোর কী আর সালোয়ার কামিজ নেই যে...

সৌম্য একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সত্যি তোমার মাত্র দু'তিনটে সালোয়ার-কামিজ?

—হ্যাঁ, ভাল কাকু।

—তোমার অনেকগুলো ভাল ভাল ফ্রক তো আছে।

—তা তো আছে কিন্তু চোদ্দ-পনের বছরের মেয়েরা সব সময় ফ্রক পরলে কী ভাল লাগে?

সৌম্য কোন মতে হাসি চেপে বলে, আমি ভুলেই যাই যে আমার মৃত্তিকা মাদার আর ছোট নেই ; সে এখন চোদ্দ বছরের হলো। এই বয়সের মেয়েরা সব সময় ফ্রক পরলে সত্যি ভাল লাগে না।

—ভাল কাকু, প্লীজ আমাকে একটা সালোয়ার-কামিজ কিনে দেবে?

—আমার তো সব সময় সবকিছু মনে থাকে না। তাই যখন দোকানে যাব, এক সঙ্গে দু'তিনটে কিনে দেব। সেই ভাল না?

—হ্যাঁ, ভাল কাকু, তাহলে তাই কিনে দিও।

যাইহোক তিথির ঐ ছোট চিরকুট পড়ে সৌম্য তখনই আর লিখতে বসে না। বিছানায় বসে দু'একটা বই'এর পাতা উল্টোয়। দু'চা'র মিনিট পরই তিথি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, ভাল কাকু, তুমি কী পড়ছ?

—না রে তিথিয়া।

তিথি এসে ওর গা ঘেষে বসে। সৌম্যর একটা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ওর কাঁধের উপর মাথা রেখে বলে, ভাল কাকু, তোমাকে আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখতে হবে।

সৌম্য একটু চাপা হাসি হেসে বলে, আগে শুনি কী রিকোয়েস্ট রাখতে হবে।

—ভাল কাকু, প্লীজ তুমি না বলো না।

—তিথিয়া মাদার, তোমার রিকোয়েস্ট না জেনেই কী করে কথা দিই, তুমিই বলো।

—তুমি না বললে শুধু আমি না, আরো অনেকে দুঃখ পাবেন।

—সেকি?

ও একটু থেমে বলে, তিথিয়া, তুমি তো জানো, অনেককে তো দূরের কথা, আমি একজনকেও দুঃখ দিতে চাই না।

—জানি বলেই তো বলছি, তুমি প্লীজ না বলবে না।

তিথি এক হাত দিয়ে সৌম্যর মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়ে ওর চোখের উপর চোখ রেখে বলে, তুমি না বললে আমি তো দূরের কথা, ভাল দাদু-নতুন দাদু-সুন্দরী কাকিমা পর্যন্ত খুব দুঃখ পাবেন।

সৌম্য মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলে, না, না, আমি ওদের দুঃখ দিতে পারি না। এবার বলো তো, ব্যাপারটা কী।

—গত বছর তো আমাদের কলেজের অ্যানুয়াল সোস্যালই হয়নি। পুরো টাকাটাই চিফ্ মিনিস্টার্স ফ্লাড রিলিফ ফান্ডে দেওয়া হয়েছিল। তাইতো এবার দু'দিন দারুণ গানের প্রোগ্রাম হবে।

—কোন' কোন আর্টিস্টরা আসবেন?

চোখ দুটো বড় বড় করে চাপা খুশির হাসি হেসে তিথি বলে, ইন্দ্রানী সেন, হৈমন্তী শুক্লা, আরতি মুখার্জি, লোপামুদ্রা মিত্র, সৈকত মিত্র আর ইন্দ্রনীল সেন প্রথম দিন আসবেন।

—ও মাই গড!

বেশ গর্বের সঙ্গে তিথি বলে, রবিবার আসবেন দ্বিজেন মুখার্জি, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জি আর রামকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সৌম্য এক গাল হাসি হেসে বলে, রিয়েলী অভাবনীয়।

ও সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে, ফাংশান কবে হবে?

—এইতো সামনের শনি-রবিবার।

তিথি প্রায় না থেমেই বলে, দু'দিনই ফাংশান শেষ হতে হতে রাত দশটা বাজবেই।...

—সে তো বাজবেই।

—তাইতো বাড়ি থেকে যাতায়াত করলে আমার কিছুই শোনা হবে না। আবার সামনের বছর আমার পার্ট টু পরীক্ষা। তখন নিশ্চয়ই এ বছরের মত এনজয় করতে পারব না।

—তাহলে কী করা উচিত?

তিথি একটু হেসে বলে, সুন্দরী কাকিমাও আমার সঙ্গে ফাংশানে যেতে চায়।..

—কিন্তু উনি তো স্টুডেন্ট না।

—আমি তো দুটো কার্ড পাবো।

ও না থেমেই বলে যায়, সুন্দরী কাকিমা আর দুই দাদুই বলেছেন, আমাকে ঐ দু'দিন ওদের ওখানে থাকতে। সুন্দরী কাকিমা গাড়ি নিয়ে যাবেন। তাইতো রাত্রে ফিরতেও কোন প্রবলেম হবে না।

সৌম্য কোন মতে হাসি চেপে বলে, ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করেছ?

—ওরা বলেছেন বলেই তো বলছি।

তিথি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তুমি পারমিশান না দিলে আমার আর সুন্দরী কাকিমার এতগুলো ভাল ভাল আর্টিস্টের গান শোনাই হবে না।

—তোমরা সবাই যখন দুঃখ পাবে, তখন আমার পারমিশান দেওয়াই উচিত, তাই না তিথিয়া?

—হ্যাঁ, ভাল কাকু।

—কিন্তু তোমাকে দু'দিন বাড়ির বাইরে থাকতে দিলে যদি বাড়ির সবাই আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়?

—সুন্দরী কাকিমার কাছে থাকব শুনলে কেউ কিছু বলতে পারে না?

—ঠিক তো?

—একশ'বার ঠিক।

—আমাকে কেউ বকবে না তো?

তিথি একটু হেসে বলে, আমাদের ব্যাপারে তোমার ডিসিশনের উপর কেউ কিছু বলতেই পারে না।

—তাহলে আর আমি আপত্তি করব কেন? ইউ মাস্ট এনজয় দিস্ উইক-এন্ড উইথ ব্যানার্জি ফ্যামিলী।

তিথি আনন্দে উত্তেজনায় লাফ দিয়ে উঠেই দু'হাত দিয়ে সৌম্যকে জড়িয়ে ধরেই চিৎকার করে, ভাল কাকু ইজ এ ভেরি গুড বয়।

ও সঙ্গে সঙ্গেই লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে যায়।

একটু পরেই ছায়া আর কাবেরী ওর ঘরে এসে হাজির। কোন ভূমিকা না করেই কাবেরী সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলে, দেখো ঠাকুরপো, তিথি আঠারো বছরের হলো। ওকে দু'দিন বাড়ির বাইরে থাকতে দেওয়া কী ঠিক?

—যে মেয়েটা তাকে লেখা ছেলেদের প্রেমপত্র পর্যন্ত আমাকে দেখায়, তাকে বিশ্বাস করে একটু-আধটু স্বাধীনতা না দেওয়া অন্যায়। তাছাড়া তার ফলও ভাল হয় না।

কাবেরী সঙ্গে সঙ্গে এক গাল হেসে বলে, আমি এমনি এমনি তোমাকে ঐ কথা বলছিলাম।

ছায়া বলেন, তিথি কাল কলেজের পর মুর এভিনিউ গিয়েছিল। ওখানে সবাই ওকে দু'দিন ওদের কাছে থেকে ফাংশান দেখার কথা বলার পর বাড়ি এসে আমাকে সব বলেছিল কিন্তু আমি ওকে বলেছিলাম, ভাল কাকু পারমিশান দিলে নিশ্চয়ই থাকবে।

কাবেরী বলে, মুর এভিনিউয়ের বাড়িতে সব থেকেও যেন কত কি নেই। তাইতো ওরা সবাই আমাদের তিনটে ছেলেমেয়েকে কাছে পেলে যেন হাতে স্বর্গ পান।

সৌম্য বলে, তিথিয়া মাদার ওখানে থাকলে যেমন খুবই আদর-যত্নে থাকবে, সেইরকমই সবাই আনন্দ পাবে। তাইতো আমি আপত্তি করলাম না।

দুই বৌদি একই সঙ্গে বলে, ভালই করেছ।

পরের দিন কলেজ থেকে ফিরেই তিথি সৌম্যকে বলে, আমি সুন্দরী কাকিমাকে ফোন করেছিলাম।

—উনি অফিস যান নি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অফিসে গিয়েছেন। আমি আমি অফিসেই ফোন করেছিলাম।

সৌম্য কোন মন্তব্য করে না।

তিথি এক গাল হাসি হেসে বলে, সুন্দরী কাকিমা হ্যাজ কনভেড হার গ্রেটফুল থ্যাংকস্ টু ইউ।

—ইজ ইট?

—হ্যাঁ, ভাল কাকু।

—ইউ ক্যান টেল হার দ্যাট আই হ্যাভ গ্রেটলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হার কাইন্ড সেন্টিমেন্টস্।

—আই উইল।

পরের দিন থেকেই তিথি তার দু'দিনের কলকাতা সফরের উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করে ; সেই সঙ্গে আনন্দ আর উত্তেজনা। উত্তেজনা চরমে উঠল শুক্রবার। সৌম্য লেখালেখির মাঝখানেই ওকে দেখে আর মনে মনে হাসে। খুশিও হয়। তিনটে ছেলেমেয়ে আনন্দে খুশিতে ভরপুর থাকবে, এইত ওর কাম্য।

রাত্রে যথারীতি সৌম্য তিথি-মৃত্তিকা-হিন্দোলের সঙ্গে খেতে বসে। ছায়া পরিবেশন করেন। কাবেরী পাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ খেতে খেতে সৌম্য বলে, তিথিয়া মাদার, কাল তুই এয়ার ইন্ডিয়ার কোন ফ্লাইটে লন্ডন রওনা হবি?

ওর কথা শুনে দুই বৌদি হেসে ওঠেন।

তিথি বলে, আঃ! ভাল কাকু! ঠাট্টা করবে না।

সৌম্য ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমিই বলো বড় বৌদি, তিথিয়া মাদারের উদ্যোগ-আয়োজন আর উত্তেজনা দেখে মনে হচ্ছে না ও কাল লন্ডন যাচ্ছে?

তিথি বলে, লন্ডন যাবার চাইতে হাজার গুণ বেশি এনজয় করব এই দু'দিন।

—লেট আস্ হোপ সো।

পরের দিন সৌম্য নিজেই ওকে দশটা পঁচিশের লোকালে তুলে দেয়। তার আগে ওকে দু'শ টাকা দিয়ে বলে, এটা রেখে দে তিথিয়া। দরকার মত খরচ করিস।

সৌম্য বাড়ি ফিরেই লিখতে বসে। সারাদিন পাগলের মত লেখে। বৌদিরা মাঝে মাঝে চা-কফি দিয়ে গেলেও খেতে ভুলে যায়। দুপুরের ভাত খায় বিকেল পাঁচটায়। ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করেই আবার লিখতে বসে। সন্ধ্যের পর ছায়া একবার কফি দিতে এলেই ও বলে, বড় বৌদি, আজ আর কাল রাত্রে কখন খাব ঠিক নেই। তুমি বা ছোট বৌদি ছেলেমেয়েকে একটু দেখেশুনে খাইয়ে দিও।

—হ্যাঁ, দেব।

শনিবার রাত দেড়টা পর্যন্ত লিখে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেও রবিবার যখন জীবনের প্রথম উপন্যাস শেষ করে, তখন রাত্রি প্রায় শেষ। সওয়া চারটে বাজে। আনন্দে খুশিতে সৌম্য গেয়ে ওঠে—

অনেক দিনের মনের মানুষ

যেন এলে কে

কোন ভুলে-যাওয়া

বসন্ত থেকে।...

ওর গান শুনেই পাশের ঘর থেকে ছায়া এসে সৌম্যর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, কোন লেখা শেষ হলো বুঝি?

—হ্যাঁ, বড় বৌদি, জীবনের প্রথম উপন্যাস আ[illegible] এইমাত্র শেষ করলাম।

—খুব খুশির খবর শোনালে ছোট ঠাকুরপো। এ উপন্যাস পড়ে নিশ্চয়ই সবার ভাল লাগবে।

—কেন বড় বৌদি?

—তুমি যেভাবে মন-প্রাণ দিয়ে এই উপন্যাস লিখলে তা কখনই ব্যর্থ হতে পারে না।

ছায়া দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বলেন, ছোট ঠাকুরপো, তোমাকে আমি মায়ের পেটের ছোট ভাইয়েব মতই ভালবাসি, স্নেহ করি। আমি বলছি, এই উপন্যাসই তোমাকে বিখ্যাত করে দেবে।

সৌম্য ওর পায় হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে, আমার উপন্যাস পাঠকরা ভাল বলবে কিনা বলতে পারি না ; তবে তোমার এই প্রাণভরা আন্তবিক আশীর্বাদের জন্যই বোধহয় উতরে যাবে।

সৌম্যর খাবার-দাবার সমেত ট্রে হাতে তুলে নিয়েই ছায়া বলেন, এ খাবার তোমাকে খেতে হবে না। আমি এখুনি তোমাকে পরোটা করে দিচ্ছি।

—তুমি কী পাগল হয়েছ? এখন তুমি পরোটা করবে?

ছায়া দরজার বাইরে পা দিয়েই পিছন ফিরে একটু হেসে বলেন, তোমাকে গরম পরোটা না খাইয়ে আমি শান্তি পাবো না। এই সময় তো আর কখনো ফিরে আসবে না ভাই।

বড় বৌদির কথা শুনে সৌম্য মুগ্ধ হয়ে যায়। মনে মনে অনুভব করে, কত গভীর স্নেহ আর মমত্ব থাকলে শেষ রাত্রের সুখনিদ্রা হাসি মুখে ত্যাগ করা যায়। সম্পদ সম্ভোগ না, এইসব টুকরো টুকরো আনন্দ আর তৃপ্তি সংসারকে মাধুর্যময় করে তোলে। শহরের মানুষ সবুজ ঘাসের উপর দিয়েও হাঁটে না, দিদি-বৌদি পিসি-মাসীদের স্নেহ-ভালবাসার স্বাদও বিশেষ পায় না।

ওর হঠাৎ মনে হয়, এইজন্যই বোধহয় শহুরে মানুষরা এত আত্মকেন্দ্রিক।

সৌম্যকে খেতে দিয়ে পাশের চেয়ারে বসে ছায়া বলেন, এই উপন্যাস লেখার

জন্য তুমি সত্যি অমানুষিক পরিশ্রম করলে। বাড়ির সবাই তো দূরের কথা, আমাদের পাড়া পড়শি থেকে শুরু করে তোমার বন্ধুবাও অবাক হয়ে গেছে।

—বিশ্বাস করো বড় বৌদি, আমার একটুও কষ্ট হয়নি। কখনই মনে হয়নি আমি পরিশ্রম করছি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আসল কথা হচ্ছে আনন্দ, আত্মতৃপ্তি, মনের শান্তি। যে কাজ করে এসব পাওয়া যায়, তা পরিশ্রমেরও হয় না, কষ্টেরও হয় না।

. এবার সৌম্য ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, এই যে শেষ রাত্তিরে তুমি না ঘুমিয়ে আমার জন্য পরোটা করলে, তারজন্য কী তোমার কষ্ট হয়েছে?

—না, ভাই।

—তুমি প্রাণের টানে, মনের তাগিদে কাজ করেছ বলেই তো তোমার কষ্ট হয়নি।

ছায়া এক গাল হেসে বলেন, এই দিনের কথা আমি জীবনেও ভুলব না। তুমি যে কি আনন্দই দিলে, তা বলতে পারব না।

সৌম্য কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলে, বড় বৌদি, সামনের জন্মে আমি যেন তোমার পেটে হই।

—তোমার মত ছেলের মা হলে তো আমি ধন্য হবো।

সৌম্য মাথা নেড়ে বলে, ও কথা বলো না বড় বৌদি। ভাল মা না হলে ভাল সন্তান হয়? ভগবতী দেবীর জন্যই আমরা বিদ্যাসাগরকে পেয়েছি।

ঠিক সেই সময় ডাইনিং টেবিলের পাশে কাবেরী এসে হাজির। ও অবাক হয়ে বলে, ঠাকুরপো, তুমি এখন খাচ্ছো? দিদি, তুমি ঘুমোও নি?

ছায়া ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, তুই জানতেও পারলি না কি দারুণ একটা ঘটনা ঘটে গেল।

কাবেরী সঙ্গে সঙ্গে ওর পাশের চেয়ারে বসেই বলে, দিদি, কী হয়েছে?

—একটু আগেই ছোট ঠাকুরপো জীবনের প্রথম উপন্যাস শেষ করলো।

—তাই নাকি?

ও সঙ্গে সঙ্গেই সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলে, ঠাকুরপো তুমি সারা রাত লিখেছ?

সৌম্য শুধু হাসে, মুখে কিছু বলে না।

কিন্তু কাবেরী তো চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, দিদি, তুমিও সারা রাত ঘুমোও নি?

—আমি তো মৃত্তিকার জন্য তিথির খাটে শুয়েছিলাম। খানিকক্ষণ ঘুমুবার পর হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ঘড়িতে দেখলাম, দেড়টা বাজে। উঠে দেখি, ছোট ঠাকুরপো এক মনে লিখছে।

ছায়া একটু থেমে বলেন, কিছুতেই আর ঘুম এলো না। মাঝে মাঝেই উঠে গিয়ে দেখি, ও যথারীতি লিখছে।

এবার উনি একটু হেসে বলেন, প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ হঠাৎ ছোট ঠাকুরপো এক লাইন গান গেয়ে উঠতেই মনে হলো, নিশ্চয়ই লেখা শেষ।

কাবেরী চুপ করে ওর কথা শোনে।

—বিশ্বাস কর কাবেরী, আনন্দে খুশিতে গর্বে কয়েকটা মিনিট আমি যে কোথায় চলে গিয়েছিলাম, তা ঠিক বোঝাতে পারব না।

নতুন সৃষ্টির আনন্দে সৌম্যও যেন চাপল্য হারায়। তাইতো বলে, ছোট বৌদি, তুমিও আশীর্বাদ করো যেন আমার এই প্রথম উপন্যাস ব্যর্থ না হয়।

—না, না, ঠাকুরপো, তা কখনই হবে না। যে অত ভাল ভাল গল্প লিখতে পারে, তার উপন্যাস ব্যর্থ হবে কেন?

ডাইনিং টেবিল থেকে উঠতে উঠতে সৌম্য বলে, বড় বৌদি, মা-বাবা-দাদাদের তুলে দাও তো। ওদের প্রণাম করে একটু ঘুমোব।

সমস্ত রাত্রির জমাট বাঁধা অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিনমনি যখন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে এগিয়ে আসছেন, সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল সারা বাড়িতে।

নিজের ঘরে শুতে যাবার আগে সৌম্য দুই বৌদিকে বলে, এই খবরটা যেন বাইবের কেউ না জানে।

সৌম্যর ঘুম ভাঙল প্রায় বারোটা নাগাদ। ও নীচে নেমে আসতেই কাবেরী জিজ্ঞেস করে, চা দেব?

—হ্যাঁ, দাও।

সৌম্য এদিক-ওদিক ঘুরে দেখে, বাবা খেয়েদেয়ে স্টেটস্‌ম্যান পড়ছেন, মা পড়ছেন 'অপুর সংসার' ; দাদারা আর দুটো ছেলেমেয়ে স্কুলে গেছে। তারপর ডাইনিং হলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাবেরী ট্রেতে তিন কাপ চা এনে রাখে টেবিলের উপর। চাল, পেস্তা, বাদাম, নারকেল কোরা ইত্যাদি দেখে সৌম্য বলে, এসব কী ব্যাপার?

ছায়া আঁচলে হাত মুছতে মুছতে একটা চেয়ারে বসেই একটু হেসে বলেন, আজ আমরা দু'জনে ডিনার দিচ্ছি তোমার অনারে।

—তার মানে?

কাবেরী বলে, তার মানে তোমার দাদাদের টাকায় না, আমরা দু'জনে আমাদের নিজেদের টাকায় নিজেরাই বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করেছি বাড়ির সবাইকে

খাওয়াবো বলে।

—তোমরা বাজারে গিয়েছিলে?

ছায়া বলেন, হ্যাঁ, আমরা দু'জনে বাজারে গিয়েছিলাম।

—মাই গড!

সৌম্য একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, উদ্যোগ-আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে, বেশ রাজকীয় ভোজের আয়োজন হচ্ছে।

কাবেরী বলে, তুমি এত বড় একটা কাজ করলে আর আমরা কী তোমাকে পুঁটি মাছের ঝোল খাওয়াবো?

যাইহোক সৌম্য যখন দুই বৌদির সঙ্গে খেতে বসে। তখন প্রায় দুটো বাজে। খেতে বসেও অনেক কথা হয়। কাবেরী জিজ্ঞেস করে, ঠাকুরপো, উপন্যাসের কী নাম দিয়েছ?

—অনেক দিনের মনের মানুষ।

ও মুখ টিপে হেসে বলে, নিশ্চয়ই কোন প্রেমের কাহিনী?

—হ্যাঁ, প্রেমের কাহিনী কিন্তু আরো অনেক কিছু আছে।

—অনেক কিছু মানে?

—অনেক মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনী আছে।

দু'এক মিনিট পর ছায়া বলেন, তুমি কী আমাদের হরিপালের পটভূমিকাতেই উপন্যাসটা লিখেছ?

—একটা প্রধান চরিত্র হরিপালের। তাইতো এখানকার চণ্ডালী কালী, গাজনের মেলা, গোবিন্দজীর মন্দির, কৈলাস পাঠাগার থেকে শুরু করে বামনা শ্মশান, তেলীখানা শ্মশান, তাঁতপুকুর শ্মশান, সাঁওতালখাল শ্মশান ও আরো অনেক কিছুই উপন্যাসে আছে।

সৌম্য একটু থেমে বলে, তবে উপন্যাসের শুরু কালকা মেলের থ্রী-টায়ার স্লিপার কোচ আর শেষ নৈনিতালে।

—তার মানে বেশ বড় ক্যানভাসেই লিখেছ?

—হ্যাঁ।

ও না থেমেই বলে, ক্যানভাস বড় হলে নানা রকমের বৈচিত্র আনা যায়।

খেতে খেতেই আরো কত কথা হয়।

ওদের খাওয়া-দাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই প্রায় নাচতে নাচতে তিথি এসে হাজির। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও এক গাল হেসে বলে, দুটো দিন যে কি এনজয় করেছি, তা তোমাদের বোঝাতে পারব না।

ও সঙ্গে সঙ্গেই সৌম্যর দিকে তাকিয়ে বলে, জানো ভাল কাকু, এতদিন স্টেটসম্যানেই ক্যালকাটা ক্লাবের কথা পড়েছি। কাল নতুন দাদু আমাকে ক্যালকাটা ক্লাবে লাঞ্চ খাইয়েছেন।

—রিয়েলী?

—হ্যাঁ, ভাল কাকু।

তিথি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, কাল ব্রেক ফাস্ট খাবার সময় নতুন দাদু সুন্দরী কাকিমাকে বললেন, আজ আমি আমার প্রধানা বেগমকে ক্লাবে লাঞ্চ খাওয়াবো। ইউ প্লীজ জয়েন আস।

ও ঠোঁট উল্টে বলে, আদর-কায়দা চালচলন খাবার-দাবার বিধিব্যবস্থা দেখে সত্যি মাথা ঘুরে যায়।

সৌম্য বলে, ভারতবর্ষের অন্যতম বিখ্যাত ক্লাব দেখে তো আমাদের মত সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের মাথা ঘুরে যাবারই কথা।

—তবে ভাল কাকু, বেয়ারা-ওয়েটাররা পর্যন্ত কি অসম্ভব ভদ্র।

কাবেরী হঠাৎ প্রশ্ন করে, হ্যাঁরে তিথি, তুই কী হার পরে গিয়েছিলি?

তিথি কামিজের ভিতর থেকে সুন্দর লকেট সমেত সরু চেন বের করে বলে, আর বলো না। পরশু ফাংশানে যাবার সময় সুন্দরী কাকিমা এটা আমাকে পরিয়ে দিলেন। আজ উনি ওটা কিছুতেই আমাকে খুলতে দিলেন না। বললেন, এটা তোমাকে বেশ মানিয়েছে। এটা তুমি সব সময় ব্যবহার করবে।

—বলিস কীরে?

—আমি জোর করে ফেরত দেবার চেষ্টা করতেই উনি বললেন, আমি যদি কিছু তোমাকে দিয়ে আনন্দ পাই, তাহলে তুমি নেবে না কেন? তুমি ওটা রেখে গেলে আমি খুব দুঃখ পাবো।

ছায়া বলো, একথা শোনার পর তুই ফেরত না দিয়ে ভালই করেছিস।

সৌম্য খেয়েদেয়ে উপরে আসার একটু পরেই তিথি এসে একটা খাম ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, তোমার চিঠি।

সৌম্য অবাক হয়ে বলে, আমার চিঠি?

—হ্যাঁ, সুন্দরী কাকিমা দিয়েছেন।

খাম খোলাই ছিল। ও বিস্ময়ের সঙ্গে চিঠিটা পড়ে।

বন্ধুবরেষু,

আপনার তিথিয়া মাদারকে দু'দিন প্রাণ ভরে কাছে পেয়ে আমরা যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। এই দু'দিন ওকে কত কথা বলেছি,

কত কথা শুনেছি তার ঠিক নেই। এই দু'দিন ধরে ওর সঙ্গে মেলামেশা কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা করার পর আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করব, আপনার তিথিয়া মাদার সত্যি ভাল মেয়ে। যেমন স্বভাব-চরিত্র, সেইরকমই ভাল ছাত্রী। তিথিয়া যে এত বিষয়ে এত কিছু জানে, তা আমি ভাবতেই পারিনি। বাবা তো প্রায় হিপনোটাইজড় হয়ে গেছেন।

পরিবারের সামগ্রিক পরিবেশ ভাল না হলে ছেলেমেয়েরা ভাল হতে পারে না। তবে সর্বোপরি আপনার শিক্ষা-দীক্ষার গুণেই যে তিথিয়া এত ভাল হয়েছে, একথা স্বীকার করতে বাধ্য। আর তিথিয়া যে আপনাকে কি ভালবাসে, কি শ্রদ্ধা করে, তা জেনে মুগ্ধ হয়েছি। তিথিয়াদের এত সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই আপনার মা-বাবা দাদা-বৌদিদের।

আপনি দীর্ঘ ছুটির অবকাশকে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়োজিত করেছেন জেনে যে কি খুশি হয়েছি, তাও বলতে পারব না। যখন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, তখনও যে আপনার গল্প পড়ে আমি আর বাবা খুশি হয়েছি, তা আপনি জানেন। অনেক সাহিত্যিকেরই ভাষা প্রাঞ্জল, সুখপাঠ্য কিন্তু আপনার মত দরদ আবেগ মমত্ববোধ বিশেষ কোন লেখকের মধ্যেই দেখতে পাই না। প্রতিদিন সামান্য কিছু সময় কাগজ-কলম নিয়ে বসার অভ্যাস থাকলে ইতিমধ্যেই আমরা পাঠক-পাঠিকারা আপনার কাছ থেকে দু'চারখানা উপন্যাস নিশ্চয়ই পেতাম। যাইহোক বেটার লেট দ্যান নেভার। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

তিথিয়া আমাকে নিয়মিত ফোন করে বলে অনেক আগেই জেনেছি, আপনি দিনরাত্তির শুধু লিখছেন। এই খবর জানার পর থেকেই আপনার পাণ্ডুলিপি পড়ার জন্য মন ছটফট করছে। কোথায় যেন পড়েছিলাম পার্ল বাক 'গুড আর্থ' লেখার পর পাঁচ-ছ'জন বন্ধুকে পড়িয়ে তাদের মন্তব্য শুনে পাণ্ডুলিপি বার বার সংশোধন করার পরই প্রকাশককে ছাপতে দেন। আমাদের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো বন্ধু নীরোদ চৌধুরীকে না পড়িয়ে ও তার কথামত সংশোধন না করে লেখা ছাপতেই দিতেন না। আবার একদল কবি-সাহিত্যিক আছেন, যারা তাদের পাণ্ডুলিপি কখনই কাউকে দেখান না। আপনি কোন গোষ্ঠীর তা আমিও জানি না, আপনার তিথিয়া মাদারও জানে না। তবে ও আমার হয়ে ওকালতি করবে বলেছে। আমি জানি আপনি আমার মত তুচ্ছ পাঠিকাকে অগ্রাহ্য করতে পারলেও তিথিয়াদের তিন ভাইবোনের কোন অনুরোধই আপনি অগ্রাহ্য করেন না, করতে পারেন না, তা খুব ভাল করেই জানি। সুতরাং মাননীয় সাহিত্যিক যে তিথিয়ার অনুরোধ হাসি মুখে মেনে নেবেন,

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সমস্যা অন্যত্র। আপনি কী তিথিয়ার মারফত পাণ্ডুলিপি আমাকে পাঠাবেন? নাকি আমাকে ওখানে গিয়ে পড়তে হবে। এদিকে তিথিয়া এক অদ্ভুত আবদার করেছে। আপনি সামনের সোমবার অফিসে জয়েন করবেন। তাই ওর বিশ্বাস, ছুটির শেষের দু'একদিন আপনি লিখবেন না। তাইতো ও হাজার বার বলেছে, আমি যেন রবিবার আপনাদের বাড়ি যাই। তিথিয়াকে আমি বন্ধুর মত ভালবাসি, মেয়ের মতই স্নেহ করি। বন্ধুকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝানো যায়।কিন্তু প্রাণপ্রিয় মেয়ের এমন একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করার মত মানসিক দৃঢ়তা আমার নেই। তবু ওকে বলেছি, যদি তোমার ভাল কাকুর লেখার ব্যাঘাত হয়, তাহলে আমাকে যেতে বারণ করতে দ্বিধা করবে না। পরে সময় সুযোগ হলে আপনার পাণ্ডুলিপি পড়ব।

মা-বাবা বড়দা-মেজদাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবেন। 'কাবেরী'-তীরে 'ছায়া'বৃত যে আনন্দ নিকেতনে আপনি বাস করে ধন্য হয়েছেন, তাদের স্পেশ্যাল প্রণাম, স্পেশ্যাল ভালবাসা জানাবেন।

সাহিত্য সাধনায় আপনি সিদ্ধিলাভ করুন, এই কামনা করি।

—তিথি ব্যানার্জি

পুঃ আমি জানি, 'তিথিয়া' নাম ব্যবহার করার একমাত্র অধিকার আপনার। আপনার বিনা অনুমতিতে তিথিকে তিথিয়া বলি বলে মার্জনা করবেন।

এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ার পর সৌম্য মুখ তুলে দেখে, তিথিয়া সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। দু' এক মিনিট কেউই কোন কথা বলে না। তারপর সৌম্য বলে, তিথিয়া মাদার, তোর সুন্দরী কাকিমা তো খুব সুন্দর চিঠি লিখতে পারেন।

তিথিয়া একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, সুন্দরী কাকিমাকে প্রথম দিন দেখেই আমার ভাল লেগেছিল। তারপর যত দেখেছি, যত কথা বলেছি, তত বেশি ভাল লেগেছে কিন্তু এই দুটো দিন ওর সঙ্গে কাটিয়ে আমি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছি।

ও একটু থেমে মুখ নীচু করে বলে, ট্রেন ছাড়ার আগে দু'জনেই দু'জনকে জড়িয়ে কেঁদেছি।

ও বাষ্পরুদ্ধ গলায় মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, সী ইজ রিয়েলী ভেরি লোনলি।

সৌম্য তো ওর নিঃসঙ্গতার বেদনার কথা মনে মনে অনুভব করে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। তাইতো ওর একটা হাত ধরে বলে, কাঁদিস না। এবার থেকে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দু'একদিন কাটিয়ে আসিস।

তিথিয়া শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

সৌম্য চিঠিখানা ওর হাতে দিয়ে বলে, আজ ভোর সওয়া চারটের সময় আমি

আমার জীবনের প্রথম উপন্যাস লেখা শেষ করেছি।

—ও মাই গড!

ও হাসিখুশিতে ঝলমল করে ওঠে। ও দু'হাত দিয়ে সৌম্যর দুটো হাত ধরে বলে, আয়াম সো হ্যাপি...

—তিথিয়া মাদার, তুই যে খুব খুশি হবি, তা তো আমি জানি। এবার চিঠিটা মা-মেজমাকে পড়তে দে। ওরা যা বলবে, তাই হবে।

তিথিয়া চিঠিটা হাতে নিয়ে লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে যায়।

পনের কুড়ি মিনিট পরই দুই বৌদি সৌম্যর ঘরে এসে হাজির। ওদের পিছন পিছন আসে তিথিয়া।

ছায়া চিঠিখানা ওর টেবিলে রেখে বলেন, ছোট ঠাকুরপো, চিঠিটা পড়ে মন ভরে গেল। তাছাড়া মেয়ের কাছে ওর কথা শুনে এত ভাল লাগল যে কি বলব।

কাবেরী বলে, এক কথায় বলব চিঠিটা অপূর্ব হয়েছে। শুধু আন্তরিক পারিবারিক না, চিঠিখানা পত্রসাহিত্য হয়েছে।

সৌম্য শুধু বলে, চিঠিখানা যে খুবই সুন্দর হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তিথিয়া বলে, ভাল কাকু, সুন্দরী কাকিমাকে পাণ্ডুলিপি পড়তে দেবে তো?

—তিথিয়া মাদার, আমি উপন্যাস লিখেছি ঠিকই কিন্তু এই উপন্যাসের একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী হচ্ছেন শ্রীমতী ছায়া সরকার। তিনি যা বলবেন, তাই হবে।

তিথিয়া হাততালি দিয়ে বলে, মা, এই উপন্যাস হিট করলে তো তুমি বড়লোক হয়ে যাবে।

ছায়া হাসতে হাসতে বলেন, যত টাকাই পাই না কেন, তা আমি আর ছোট ঠাকুরপো ঠিক খরচ করতে পারব। তোদের তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

সৌম্য বলে, তিথিয়া মাদার, এই উপন্যাসের কথা বাইরের কাউকে বলিস না।

—না, না, বলব না।

পরের তিন দিন সৌম্য পুরো উপন্যাসটা খুব মন দিয়ে বার দুয়েক পড়ে। প্রত্যেকটি চরিত্র আর ঘটনা নিয়ে আপনমনে চিন্তা করে, বিচার করে। শুক্রবার সারাদিন ধরে টুকটাক কাটাকুটি, সংশোধন সংযোজন করে। শনিবার সকালে দোকান থেকে নতুন ফাইল কিনে এনে তার উপর বড় বড় হরফে লেখে :

অনেক দিনের মনের মানুষ

—সৌম্য সরকার—

ও তারপর নীচে গিয়ে ছায়ার হাতে ফাইল দিয়ে বলে, এই নাও বড় বৌদি। তোমরা দু'জনে পড়ার পর তিথিয়া মাদারের সুন্দরী কাকিমাকে পড়তে দিও। প্লীজ

দেখো, আর কেউ যেন না দেখে।

—না, না, দেখবে না।

—তোমাদের তিন জনের মতামত শোনার পরই ঠিক করব এটা কোন পত্রিকায় দেব কিনা।

—আমি আর কাবেরী আজ রাত্তিরের মধ্যেই এটা পড়ে ফেলব।

কাবেরী বলে, ডেফিনিটলি। দরকার হলে সারা রাত জাগব।

সৌম্য আবার বলে, তবে একটু মন দিয়ে পড়ো। যদি কোথাও খটকা লাগে বা কোন ভুল চোখে পড়ে, একটু নোট করে রেখো।

কাবেরী বলে, হ্যাঁ, রাখব।

পরের দিন ছায়া চায়ের কাপ হাতে দিয়ে ঘরে ঢুকতেই সৌম্য একটু অবাক হয়ে বলে, আজ তুমি চা নিয়ে এলে? মেজবৌদির কী হলো?

ছায়া চায়ের কাপ রেখেই ওর পাশে বসে এক গাল হাসি হেসে বলে, কাল রাত সাড়ে তিনটেয় বইটা শেষ করেছি। কাবেরী এখনও ওঠেনি।

উনি না থেমেই বলেন, সত্যি বলছি ছোট ঠাকুরপো, তোমার প্রথম উপন্যাস পড়ে আমরা যেমন অবাক হয়েছি, সেইরকমই মুগ্ধ হয়েছি।

—অবাক হয়েছ কেন?

—দশ-বিশ পাতার গল্প লেখা এক জিনিষ আর দু'শ আশি পাতার উপন্যাস লেখা একেবারেই অন্য ব্যাপার। যারা ভাল গল্প লেখে, তারাই যে ভাল উপন্যাস লিখবে, তার কোন মানে নেই। তাইতো সবাই ঔপন্যাসিক হতে পারেন না।

সৌম্য চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চুপ করে ওর কথা শোনে।

—সত্যি বলছি ভাই, খুব ভাল হয়েছে তোমার উপন্যাস।

—কেন ভাল লাগল?

—তোমার নায়িকা অনুরাধা বিয়ের পর পরই বিধবা হয়। তারপর সে এম এ আর বি এড. পাশ করে বেলতলা গার্লস্ স্কুলে টিচার হয়। পুরীতে আমাদের জি-ডি স্কুলের অঙ্কের টিচার ইন্দ্রনীলের সঙ্গে অনুরাধার আলাপ হয়।

ছায়া একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, ওদের দু'জনের ভালবাসার যে ব্যথা বেদনা আর সংযমের ছবি সৃষ্টির করেছ, তার তুলনা হয় না।

উনি একটু থেমে বলেন, আবার চরম নেশাখোর মুণ্ডেশ্বর সাঁওতাল ছেলেটার মৃতদেহ সাঁওতালখাল শ্মশানে দাহ করার সময়ের যে বর্ণনা তুমি দিয়েছ, তা পড়ে সবাইকেই চোখের জল ফেলতে হবে।

এবার ছায়া একটু হেসে বলেন, অবিনাশকাকার তিন নাতিনাতনী তিথিয়া-

মৃত্তিকা-হিন্দোলের ব্যাপারটা খুবই মজার হয়েছে।

উনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, এখন যাই, পরে আরো অনেক কথা বলব। তবে এই উপন্যাস যে সবার ভাল লাগবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ঘণ্টা খানেক পর কাবেরী এসে কোন ভূমিকা না করে সৌম্যর ডান হাতে চুমু খেয়ে বলে, দারুণ হয়েছে তোমার উপন্যাস।

রবিবার তিথি ব্যানার্জি আটটা পঁচিশের লোকাল ধরে দশটা নাগাদ হরিপাল পৌঁছবার পর তিথিয়ারা তিন ভাইবোন ওকে বাড়িতে আনে। ঘণ্টা খানেক গল্প করার পরই উনি কাবেরীর ঘরে পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসলেন। শেষ করলেন ছ'টা বেজে যাবার পর। মাঝখানে শুধু খাওয়া-দাওয়ার সময় একটু গল্প গুজব করেছেন।

তিথি ব্যানার্জি ফাইল নিয়ে ঘরে থেকে বেরুতেই কাবেরী জিজ্ঞেস করে, আমার বয়ফ্রেন্ডের প্রথম উপন্যাস কেমন লাগল?

উনি একটু হেসে জবাব দেন, সত্যি বলছি, এত ভাল লাগবে, তা ভাবতে পারিনি।

পরের দিন অফিসে গিয়ে সৌম্য আনন্দবাজারে ফোন করে গল্পের ব্যাপারে খোঁজ নেবার সময়ই জানতে পারে, দেশ পত্রিকায় নতুন সম্পাদক যোগ দিয়েছেন। ও মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, নতুন সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় করার সময়ই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ওর হাতে দেবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে, পুরো উপন্যাসটা আবার ভাল করে পড়বে। প্রয়োজনে একটু কাটাকুটি অদল-বদল করবে।

অফিসের ছুটির পর বাড়ি ফেরার সময় তারকেশ্বর লোকালে বসে সৌম্য আপনমনে উপন্যাসের কথাই ভাবে। বিচার করে নানা ঘটনা আর চরিত্র নিয়ে। দুই বৌদি আর তিথি ব্যানার্জির ভাল লাগলেও একটু খুঁত খুঁত করে মন। একজন সমালোচক ধরনের কাউকে পড়াতে পারলে ভাল হয়। উর্মির দীপালি বৌদিকে পড়তে দিলে ভালই হয় কিন্তু উনি আনন্দে খুশিতে এই উপন্যাসের কথা আর পাঁচজনকে না বলে শান্তি পাবেন না। তাইতো ওকে দেওয়া যাবে না। কৈলাস পাঠাগারের কয়েকজন ভাল ভাল পাঠক-পাঠিকার কথাও মনে পড়ল কিন্তু ঐ একই সমস্যা। উপন্যাসের কথা ও কাহিনী দশ কানে পৌঁছে যাবে। না, না তা হতে পারে না।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই ট্রেন সিঙ্গুর-কামারকুণ্ডু-নালিকুল-মালিয়া পার হয়ে হরিপাল পৌঁছে যায়। সৌম্য প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু এগুতেই বকুলের সঙ্গে দেখা।

ওকে দেখেই বকুল বলে, তুমি পাশের কামরাতেই ছিলে?

সৌম্য একটু হেসে বলে, আমি তো সব সময়ই তোর কাছাকাছি থাকি। তুইই বরং দূরে সরে যাচ্ছিস।

ও না থেমেই বলে, এতদিন ছুটি নিয়ে বাড়ি বসে রইলাম কিন্তু তার মধ্যে তুই ক'দিন এসেছিস?

—আমি তো প্রায় রোজই যেতাম কিন্তু তুমি এমন মন দিয়ে লিখতে যে আমি তোমাকে ডিসটার্ব করতাম না।

স্টেশন চত্বর ছেড়ে রাস্তায় পা দিয়েই বকুল ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে জিজ্ঞেস করে, এতদিন ধরে কী লিখলে সমুদা?

—হ্যাঁ, বলছি কিন্তু আগে বল আমার একটা কাজ করে দিবি কিনা।

—কেন করব না?

—তবে দুটো শর্ত আছে।

বকুল একটু হেসে বলে, শুনি, কী শর্ত আছে।

—সব চাইতে বড় কথা, যে কাজ করবি, তার কথা কাউকে জানাতে পারবি না। আই রিয়েলী মীন ইট।

—তুমি যখন বারণ করছ, তখন নিশ্চয়ই কাউকে জানাব না।

ও একটু থেমে বলে, দ্বিতীয় শর্তটা কী?

—ওটা পরে বলছি।

বকুল ওর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আবার একটু হেসে বলে, এবার শুনি কী কাজ করতে হবে।

সৌম্য ওর দিকে তাকিয়ে বলে, জীবনের প্রথম উপন্যাস লেখা শেষ করেছি কিন্তু...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বকুল এক গাল খুশির হাসি হেসে বলে, রিয়েলী সমুদা, আয়াম ভেরি হ্যাপি।

ও একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না আমার কী ভাল লাগছে।

—বকুল, খবরটা শুনে যে তুই খুশি হবি, তা আমি জানি ; আর জানি বলেই তোকে একটা কাজ করতে হবে।

—বল, কী করতে হবে।

—তোকে উপন্যাসটা পড়তে দেব।..

—একশ' বার পড়ব।

—কিন্তু বেশ মন দিয়ে সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়তে হবে।

বকুল মন দিয়ে ওর কথা শোনে।

—কপিটা পড়ার সময় হাতের কাছেই কাগজ-কলম রাখবি। যখনই মনে হবে,

লেখাটা ঠিক হয়নি বা কোন ভুল হয়েছে, তখনই লিখে রাখবি। আমার লেখা বলে ভাবাবেগে ভেসে যাবি না। রীতিমত সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়তে ও সমালোচনা করতে হবে।

সৌম্য সব শেষে বলে, তুই নবনীতা দেব সেনের ছাত্রী বলেই তোকে এই উপন্যাসটা পড়তে দেব।

ও একটু হেসে বলে, আশা করি তুই নিজের আর তোর নবনীতাদির সম্মান রাখবি।

এত কিছু শোনার পর বকুল একটু হেসে বলে, নবনীতাদির মত অসামান্যা মহিলার সম্মান রাখার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আমার নেই ; তবু বলছি, চেষ্টা বা নিষ্ঠার ত্রুটি রাখব না।

—তাহলেই আমি খুশি।

দু' পাঁচ মিনিট চুপচাপ হাঁটার পর সৌম্য বলে, বকুল, আর একটা কথা বলে দিই।

—কী কথা?

—এই উপন্যাসে আমার জানাশোনা অনেকেরই প্রতিফলন নিশ্চয়ই আছে।

ও বকুলের দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হেসে বলে, হয়ত দু'এক জায়গায় তোরও প্রতিফলন আছে কিন্তু তার জন্য কিছু মনে করিস না।

বকুল কোন কথা বলে না, শুধু একটু হাসে।

—তুই ঘণ্টা খানেক পর কিছু কাগজপত্র নিয়ে আমার ঘরে আসিস। তখন তোকে কপিটা দিয়ে দেব।

সৌম্য মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ঐ কাগজপত্রের মধ্যে লুকিয়ে কপিটা নিয়ে যাবি।

বকুল মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

শুক্রবার সকালে হরিপাল স্টেশনে সৌম্যকে দেখেই বকুল বলে, আমার কাজ প্রায় শেষ। কাল তোমাকে ফেরত দেব। তুমি বাড়িতে থাকবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, থাকব।

পরের দিন সাড়ে দশটা-এগারটা নাগাদ বকুল সৌম্যকে ওর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ফেরত দেবার পর একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলে, এতে লিখে দিয়েছি কোথায় কোথায় আবার তোমাকে একটু চোখ বুলিয়ে নিতে হবে।

—কোথাও বড় ভুল করেছি?

—বড় ভুল নেই কিন্তু দু'এক জায়গায় আগের বর্ণনা বা ডায়ালোগের পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

—এনিথিং এলস্?

—দু'তিন জায়গায় তন্ময়ীকে মৃন্ময়ী করেছ।

—মাই গড!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সৌম্য জিজ্ঞেস করে, আর কিছু?

—না, আর সব ঠিক আছে।

—এবার বল তোর কেমন লাগল।

প্রশান্ত হাসি হেসে বকুল বলে, সমুদা, সত্যি বলছি, খুব ভাল হয়েছে। প্রেমের উপন্যাস হলেও অনেকগুলো মানুষের সুখ-দুঃখের যেসব কথা লিখেছ, তা এক কথায় অসাধারণ হয়েছে।

ও একটু থেমে বলে, এত দরদ মমতা আর ভালবাসা দিয়ে আমাদের এই হরিপালের কথা তুমি লিখেছ যে সব পাঠক-পাঠিকাকেই আবার নতুন করে গ্রাম বাংলাকে ভালবাসতে শেখাবেই।

সৌম্য একটু হেসে বলে, ঠিক ধরেছিস। এই কথাটাই আমি সব সময় মনে রেখেছি।

—বাই দ্য ওয়ে পুরো উপন্যাসটা জেরক্স করে রাখার পরই কপিটা পত্রপত্রিকায় দিও।

—হ্যাঁ, রাখব।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত উপন্যাসের খুটিনাটি সংশোধন করার পরই সৌম্য ঘুমোয়। ভেবেছিল বেশ দেরি করেই উঠবে কিন্তু সাত সকালেই ওদের বাড়িতে যেন ডাকাত পড়ল। নীতা আর চণ্ডীর কাহিনী আনন্দবাজারে পড়েই সারা হরিপালে হৈ চৈ পড়ে গেছে। শুধু চণ্ডী নীতা না, ছুটে এসেছেন নীতার মা। আরো অনেকে।

নীতার মা সৌম্যকে বলেন, সমু, তুই ব্যাপারটা কাগজে না ছাপিয়ে আমাকে বললেই তো...

সৌম্য ওনাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে, কাকিমা, আমি তো খারাপ কিছু লিখিনি। চণ্ডী আমার ছোটবেলার বন্ধু আর নীতা তো আমার ছোট বোন।

—না, বাবা, খারাপ কিছু লেখনি তবে...

—তবে কাকিমা, এবার ওদের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

—সে তো করবই।

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, একে জানাশুনা পরিবার তার উপর চণ্ডীর মত লেখাপড়া জানা ভদ্র ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তো আমাদের আপত্তি নেই।

ঘর ভর্তি লোকের সামনেই তিথি ওকে বলে, নতুন ঠাকুমা, দেখলেন তো আমার

ভাল কাকুর কাণ্ড। এক গল্প লিখেই এত বড় একটা কাজ করে দিল।

নীতার মা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই চণ্ডী আবার সৌম্যর ঘরে এসে বলে, হতভাগা, তুই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলি।

কাবেরী বলে, ঠাকুরপো ঠিক করেছে। তুমি কেন এত কাল নীতাকে কষ্ট দিয়েছ?

—এবার সুখের বন্যায় ভাসিয়ে দেব।

চণ্ডীর কথা শুনে নীতা লজ্জায় মুখ নীচু করে

কেষ্টদার স্ত্রী বলে, সমু ঠাকুরপো, তুমি এবার একটা প্রজাপতির অফিস খোলো।

—আগে দেখি; এই বিয়ের ঘটকালী করার জন্য কত দক্ষিণা পাই। যদি উৎসাহজনক সিলভার টনিক আসে, তাহলে...

অন্য সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর নীতা বলে, সমুদা, তুমি সত্যি সত্যিই দাদার কাজ করলে।

—তোরা ভাল থাকলে বুঝব আমি ঠিক কাজই করেছি।

—তোমার পাগলা বন্ধু মানুষ হিসেবে খুবই ভাল। তাই মনে হয়, ভালই থাকব।

—তোর মত মেয়েই বা ক'টা আছে?

যাইহোক পরের দিন আনন্দবাজার অফিসে গিয়ে দেশ'এর নতুন সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার পর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ওনার হাতে তুলে দেয়।

সম্পাদক একটু হেসে বলেন, আমি এই দায়িত্ব নেবার পর এই প্রথম একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আমার হাতে এলো।

—সময় করে একটু পড়ে দেখবেন।

—নিশ্চয়ই পড়ব।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, কপি পড়ে দেখার পরই আমি তোমাকে আমার মতামত জানিয়ে দেব।

না, সৌম্যকে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় না। দিন কুড়ি পরই দেশ থেকে টেলিফোন এলো—আপনি আজ-কালের মধ্যেই সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করবেন।

পরদিন সৌম্য যেতেই সম্পাদক একটু হেসে বলেন, বসো।

সৌম্য সামনের চেয়ারে বসতেই উনি বলেন, শুধু আমি না, আরো দু'জন তোমার উপন্যাস পড়েছেন। আমাদের তিনজনেরই ভাল লেগেছে।

ও মনে মনে চণ্ডালী মাকে প্রণাম করে একটু হেসে বলে, আমি সত্যিই ভাগ্যবান।

—দু' সপ্তাহ পরই একটা ধারাবাহিক উপন্যাস শেষ হচ্ছে। তারপর কোন উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বেরুবে, তাও ঠিক হয়ে আছে কিন্তু আমি ঠিক করেছি,

তোমার উপন্যাসের পরই ঐ উপন্যাস বের করব।

—আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব, তা ভেবে পাচ্ছি না। আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন আপনাদের এই আস্থার মর্যাদা রাখতে পারি।

—আমরা নিশ্চয়ই চাই তুমি সাকসেস্‌ফুল রাইটার হও।

উনি বেয়ারাকে চায়ের অর্ডার দিয়েই সৌম্যর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এবার কী নিয়ে দ্বিতীয় উপন্যাস কিখবে?

একটু ভেবে নিয়ে সৌম্য বলে, এখনও কিছু ঠিক করিনি, তবে ডালহৌসী পাড়ার কেরানী আর অফিসারদের নিয়ে লেখার ইচ্ছে অনেক দিনের।

—শুরু করে দাও। দেরি করো না। হয়ত পূজা সংখ্যার জন্য তোমাকে উপন্যাস লিখতে হতে পারে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তবে মাস খানেক পরই আমরা ঠিক করব, এবার কার কার উপন্যাস বের করব।

চা খাবার পর সৌম্য বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই সম্পাদক বলেন, পূজা সংখ্যার ব্যাপারটা এখন প্রিলিমিনারী স্টেজে। আগে থেকে কাউকেই কিছু বলো না।

সৌম্য শুধু ঘাড় সম্মতি জানিয়ে বিদায় নেয়।

লিফট্'এ না, প্রায় লাফিয়ে লাফিয়েই ও সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামে। তারপর অনাস্বাদিত আনন্দ খুশির জোয়ারে ভাসতে ভাসতে কে. সি. দাশের দোকান থেকে দু'শ টাকার কালাকান্দ কিনেই ট্যাক্সি চড়ে হাওড়া যায়। তারকেশ্বর লোকালে বসে। ঐ চিরপুরাতন লোকালে কামরায় বসে বসেই যেন এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে পরমানন্দে অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দেবার সুখ আর আনন্দ উপভোগ করে।

না, না, হরিপাল স্টেশন থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরার জন্য সময় নষ্ট করতে পারে না। রিক্সায় উঠেই বলে, বিনোদদা, প্লীজ একটু জোরে চালাবে। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছবার দরকার।

বিনোদ মুখে কিছু বলে না। সাধ্য মত তাড়াতাড়ি চালায়।

দু'এক মিনিট পরই সৌম্য বলে, বিনোদদা, চণ্ডালী মায়ের মন্দিরের সামনে একটু দাঁড়াবে। মাকে প্রণাম করব।

সৌম্য চণ্ডালী মাকে প্রণাম করে। পার্সের সব টাকাকড়ি মন্দিরে দেবার পর মনে মনে বলে, মা, এই উপন্যাসের টাকা পেলে তোমাকে ভাল করে পুজো দেব।

বাড়ির সামনে রিক্সা থামতেই সৌম্য বলে, বিনোদদা, ভিতরে এসো।

বাড়ির দরজায় পা দিয়েই সৌম্য চিৎকার করে, মা! বড়বৌদি-মেজবৌদি-

তিথিয়া মাদার!

ঐ চিৎকার শুনে যে যার কাজকর্ম ফেলে ছুটে আসেন। সৌম্য সরলাবালাকে প্রণাম করেই বলে, মা, তোমার ছেলের উপন্যাস দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হবে।

তারপর ও বাবা আর দাদা-বৌদিদের প্রণাম করেই তিথি-মৃত্তিকা-হিল্লোলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, তোদের সবাইকে কাছে পেয়েছি বলেই আমি এই উপন্যাস লিখতে পেরেছি।

তারপর হঠাৎ বিনোদকে দেখেই সৌম্য ছায়াকে বলে, বড়বৌদি, বিনোদদাকে একটু মিষ্টি দেবার পর দশটা টাকা দাও। আমার পার্সে একটা পয়সাও নেই।

একতলার বারান্দায় সৌম্যকে ঘিরে বাড়ির সবাই বসে দাঁড়িয়ে। মনোরঞ্জনবাবু ছোট ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, আজ সত্যি একটা ভাল খবর শোনালি।

ওর বড় ছেলে শান্ত বলেন, ভাল খবর মানে? এতো রীতিমতো সৌভাগ্যের ব্যাপার।

মেজ ছেলে পবিত্র একটু বাঁকা চোখে কাবেরীব দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, দেখছ, আমাদের ফ্যামিলী কি রকম।

কাবেরী হেরে যাবার পাত্রী না। একটু হেসে বলে, আমার অনুপ্রেরণা পেয়েই তো তোমার ভাই রাইটার হলো।

সৌম্য ছায়ার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হেসে বলে, বড় বৌদি, তুমি পারমিশন দিলে মেজবৌদির সব কীর্তি সবার সামনেই ফাঁস করে দিতে পারি।

ছায়া হাসি চেপে বলেন, আমাদের প্রাইভটে ব্যাপার আমাদের মধ্যেই থাক।

চা-টা খেয়েই সৌম্য বকুলেব কাছে যায়।

বকুল অবাক হয়ে বলে, কী ব্যাপার সমুদা? তুমি?

—আমার উপন্যাস দেশ'এ ধারাবাহিকভাবে বেরুবে। তাই...

আনন্দে খুশিতে বকুল চিৎকার করে ওঠে, হোয়াট গ্রেট নিউজ! রিয়েলী দারুণ খবর!

বাড়িতে খবরটা দিয়েই তোর কাছে এসেছি।

ও বকুলের দিকে তাকিয়ে বলে, এখন যাচ্ছি। পরে সব কথা বলব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এখন যাও। খানিকটা পরে আমি আসছি।

পরের দিন অফিসে পৌঁছেই সৌম্য যোগেনবাবু থেকে শুরু করে প্রত্যেক বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের প্রণাম করে খবরটা জানাতেই অভিনন্দনের বন্যা বয়ে যায়। প্রবীণা রেখাদি বললেন, কেরানীগিরি করতে করতে আমাদের অনেকেরেই চুল

পেকে গেছে! ক' বছরের মধ্যেই আমরা অনেকে রিটায়ার করব। এই কেরানীগিরি করতে করতে আমরা মা-বাবা শ্বশুর-শাশুড়ি ছাড়াও সংসার প্রতিপালন করলেও সমাজ যে কেন আমাদের ঘেন্না করে ভেবে পাই না।

যোগেনবাবু বলেন, ঠিক বলেছেন।

বৃদ্ধ মন্মথবাবু বলেন, যারা চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য করে লাখ লাখ টাকা আয় করে, তাদের মধ্যে ক'জন আমাদের মত সামাজিক পারিবারিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেন?

ত্রিদিববাবু চাপা হাসি হেসে বলেন, যারা যত উন্নতি করে, তারা তত বেশি স্বার্থপর হয়, তাও জানেন না মন্মথদা?

রেখাদি এবার বলেন, মোটকথা সৌম্যর জন্য এই ঘরের আমরা ক'জন এবার থেকে মাথা উঁচু করে চলতে পারব।

সুখেনবাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, তবে বড়দা, একটা ব্যাপারে আমি খুবই চিন্তিত।

—কী ব্যাপারে চিন্তিত?

সবার দৃষ্টি সুখেনবাবুর দিকে। উনি বেশ গম্ভীর হয়েই বলেন, এই আনন্দে গুণময়দা বোধহয় বৌদিকে আবার লেবার রুমে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

হাসিতে সবাই ফেটে পড়েন। মেয়েরা হাসতে হাসতেই মুখ ঘুরিয়ে নেন। যোগেনবাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, স্পেশ্যাল টি ব্রেকের জন্য সভার অধিবেশন পনের মিনিটের স্থগিত রাখা হলো।

ঐ চায়ের আসরেই ছায়াদি যোগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমরা সবাই মিলে একদিন সৌম্যকে সম্বর্ধনা জানাব না?

সৌম্য একটু হেসে বলে, ছায়াদি, খ্যাতি আর অর্থ মানুষকে দূরে সরিয়েই দেয় না, অনেক সময় অমানুষও করে। প্লীজ আমাকে ঠিক এইরকম কেরানীর চাকরি করে, ট্রাম-বাস ঠেঙিয়ে, লোকাল ট্রেনে চড়ে হরিপালের সাধারণ মানুষ থাকতে দিন।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আপনারা আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন না।

অফিস ছুটির পরও সৌম্যকে ঘিরে কয়েকজন কথাবার্তা বলেন। তারপর হঠাৎ ও বলে, আমাকে একটু হাজরা ঘুরে বাড়ি ফিরতে হবে। আর দেরি করব না।

তিথি বলে, তাহলে চলুন টালিগঞ্জের ট্রামে যাই। আপনি হাজরায় নামবেন, আমি চলে যাবো টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো পর্যন্ত।

—চলুন।

সবাই মিলে ঘর থেকে বেরুতে বেরুতেই সৌম্য তিথিকে বলে, টেলিফোন

ভবনের ওপাশ থেকে উঠতে হবে ; তা না হলে সীট পাবো না।

—হ্যাঁ, চলুন।

অন্যদের পিছনে ফেলে ওরা দু'জনে খানিকটা এগিয়েই তিথি জিজ্ঞেস করে, হাজরার কোথায় নামবেন? মোড়ে নাকি...

সৌম্য একটু হেসে বলে, শুধু শুধু হাজরা যাব কেন?

তিথি অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

—সবার সামনে তো আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে পারি না, তাই একটু মিথ্যার আশ্রয় নিলাম।

তিথি একটু হেসে বলে, আপনি তো আচ্ছা ছেলে!

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, আমাকে ধন্যবাদ জানাবার কারণ?

—আপনি কত কষ্ট করে হরিপালে এসে আমার উপন্যাস পড়ে মতামত জানিয়েছেন, ধন্যবাদ জানাব না?

—না, না, ধন্যবাদ জানাবার মত কোন কাজ আমি করিনি। আমি গিয়েছিলাম আমার মনের টানে।

ও একটু থেমে বলে যায়, আমি বরাবরই চেয়েছি, আপনি লিখুন। আজ না হোক কাল আপনি নিশ্চয়ই বিখ্যাত হবেন। তখন বুক ফুলিয়ে সবাইকে বলতে পারব, আমি আপনার প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়েছি।

—ভবিষ্যতের কথা জানি না। তবে আজ এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই স্বীকার করব, আপনি ওভাবে না বললে আমি কবে যে উপন্যাস লিখতাম তা ভগবানই জানেন।

—বাই দ্য ওয়ে মৃন্ময়ী-চিন্ময়ীগুলো ঠিক করে দিয়েছেন?

সৌম্য থমকে দাঁড়িয়ে বলে, আপনি তা লক্ষ্য করেছিলেন?

—করব না কেন?

—খুব তাড়াহুড়ো করে পড়েছেন তো! তাই...

তিথি আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করে বলে, ফাঁকি দিয়ে তো পড়িনি। মন দিয়েই পড়েছি।

—এই ভুলের কথা আগে বলেন নি কেন?

—ভাবছিলাম, আপনার ভুল দেখিয়ে দেবার অধিকার আছে কিনা!

—আপনি যখন আমার শুভাকাঙ্ক্ষিনী ও লেখা পছন্দ করেন, তখন নিশ্চয়ই আমার ভুল দেখিয়ে দেবার অধিকার আপনার আছে।

—অশেষ ধন্যবাদ।

কথায় কথায় রাজভবনের ধারে পৌঁছেই তিথি বলে, আপনাকে একটা কথা

বলতে একদম ভুলে গেছি।

—কী কথা?

—আপনি যখন ছুটিতে ছিলেন তখন একদিন অমিতাভদার অফিসে গিয়েছিলাম।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, আপনি ছুটি নিয়েছেন শুনে বললেন, ও জয়েন করলে আবার একদিন তোমরা দু'জনে এসো।

সৌম্য একটু হেসে বলে, হ্যাঁ যাব, তবে এবার আর আপনার সঙ্গে গাড়িতে যাব না।

—কেন?

—নেশা হয়ে যাবে।

—কীসের নেশা?

—একে আপনার সহচর্য, তার উপর আপনার গাড়ি। দুটোর কোনটাই তো উপভোগ করার অধিকার আমার নেই।

—আচ্ছা সে নেশার কথা পরে চিন্তা করে দেখব কিন্তু কথায় কথায় আপনি তো অনেক দূর এসে গেলেন।

ও না থেমেই বলে, চলুন, আপনাকে হাওড়ার মিনিতে তুলে দিই।

—হ্যাঁ, এবার আমি রওনা হবো।

পরের দিন অফিসে কাজ করতে করতে তিথি হঠাৎ একটা ফাইল সৌম্যর সামনে খুলে ধরে বলে, দেখুন তো, নোটটা ঠিক লিখেছি কিনা।

সৌম্য দেখে একটা কাগজে লেখা—খবর শুনে বাবা অসম্ভব খুশি হয়েছেন। উনি বার বার আমাকে বলেছেন, আপনাকে আসছে শনিবার দুপুরে আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতে। আপনি না গেলে বাবা খুবই দুঃখ পাবেন। আপনি আসছেন তো?

চারপাশের টেবিলেই লোক। সৌম্য হাসতে পারে না। কোন মন্তব্যও করতে পারে না।

তিথি আবার প্রশ্ন করে, আমাদের এই প্রপোজাল অ্যাকসেপ্টেড হবে তো? নাকি...

সৌম্য কোনমতে হাসি চেপে বলে, নিশ্চয়ই হবে।

তিথি ফাইলটা ওর টেবিল থেকে তুলতে তুলতে বলে, খুব ভয়ে ভয়ে নোটটা লিখেছিলাম তো! তবে আপনি যখন বলেছেন ঠিক আছে, তখন...।

ও একটু থেমে বলে, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

সৌম্য নতুন উপন্যাস লেখার উদ্যোগ করতে না করতেই দেশ পত্রিকার আগামী সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়ে আনন্দবাজারে বিরাট বিজ্ঞাপন বেরুল। সব চাইতে বড় বড় হরফে সৌম্যর নাম ও উপন্যাসের কথা দেখে ও নিজেই যেন নিজের দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। নতুন করে আবার হৈ চৈ শুরু হয় বাড়িতে, হরিপালে আর অফিসে কিন্তু সৌম্য ভেসে যায় না। চণ্ডালী মাকে প্রণাম করে শুরু করে দ্বিতীয় উপন্যাস লেখা।

'অনেক দিনের মনের মানুষ' দুটো সংখ্যায় বেরুতে না বেরুতেই আবার দেশ পত্রিকার সম্পাদকের তলব। বলেন, বাইরের পাঠকদের রি-অ্যাকশান এখনও জানতে না পারলেও এই বাড়ির অনেকেই তোমার উপন্যাস পড়ে খুশি।

উনি একটু থেমেই বলেন, যাইহোক, পূজা সংখ্যায় তোমার উপন্যাস চাই। তবে নববর্ষের আগেই কপি চাই ; পাবো তো?

সকৃতজ্ঞ হাসি হেসে সৌম্য বলে, আমি ইতিমধ্যেই শুরু করেছি।

—খুব ভাল।

এখন হরিপালের লোকজনের মুখে মুখে সৌম্যর উপন্যাসের কথা। তারকেশ্বর লোকালের কামরায়, পথেঘাটে, ঘরে ঘরে ওর প্রশংসা। তবে সব চাইতে বেশি উত্তেজিত তিথিরা আর মৃত্তিকা। রোজই স্কুল-কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরেই ওরা বলে, ভাল কাকুর জন্য আমাদের কি প্রেস্টিজ বেড়ে গেছে, তা তোমরা ভাবতে পারবে না। প্রায় ওদেরই মত উত্তেজিত আনন্দিত ওদের মা আর মেজমা। বাড়ির লোকজনের মতই খুশি আর উত্তেজিত সৌম্যর সহকর্মীরা।

ত্রিদিববাবু অফিসে ঢুকেই বলেন, বুঝলে বড়দা, তোমার স্নেহের সৌম্যর জন্য আর একটু হলেই আমাদের সংসার ভাঙতো।

—কী বলছিস তুই?

—ঠিকই বলছি। আমার বউ সৌম্যর লেখা পড়ে দিন দিন এত গদ গদ হয়ে পড়ছে যে শ্রীমতীর বয়স কম থাকলে ঠিক সৌম্যর গলায় মালা দিত।

যোগেনবাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, ভালই হতো। তাহলে বৌমাকে আর তোর মত অপদার্থের জন্য প্রাণপাত করতে হতো না।

বেরসিক বৃদ্ধ মন্মথবাবু একটু হেসে বলেন, জানো যোগেন, আমার যে মেয়ে এম. এ. পড়ছে, সে তার মার কাছে কী বলেছে?

—কী বলেছে?

—আগে জিজ্ঞেস করেছে, সে সৌম্যকে দেখেছে কিনা। তারপর বলেছে, উনি নিশ্চয়ই দেখতে খুব সুন্দর, আর এখনও বিয়ে করেননি বলেই মনে হয়।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই যোগেনবাবু থেকে শুরু করে রেখাদি ছায়াদির মত চার-পাঁজন একসঙ্গে বলেন, শুধু আপনার মেয়ে নয়, আমাদের বাড়ির মেয়েরাও এখন সৌম্যর প্রেমে ভেসে যাচ্ছে।

ওরা থামতেই তিথি বলে, সৌম্যবাবু রোজ কটা ক'রে প্রেম-পত্র পাচ্ছেন?

—এই অফিসের দু'একজন ছাড়া আরো কারুর প্রেম পত্র এখনও পাইনি।

এইসব প্রতিক্রিয়ায় সৌম্য খুশি হলেও ভেসে যায় না। বার বার মনে মনে নিজেকে সাবধান করে, ভেসে যেও না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে লিখে যাও। অনেকেই দু'একটা উপন্যাস লিখে চিরদিনের মত হারিয়ে গেছেন। তুমি কী তাদের মত হারিয়ে যেতে চাও?

সৌম্য এখন সত্যি ব্যস্ত। শুধু শনি রবিবার সারাদিন ধরে লেখে না, অন্যান্য দিন অফিস থেকে ফিরে আসার পর স্নান করে চা-টা খেয়ে আবার লিখতে বসে। তবে আনন্দে উত্তেজনায় তাড়াহুড়ো করে লেখে না। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে লেখে। একে নিজের সুনাম, তার উপর সম্পাদকের আস্থা তো রাখতেই হবে।

উপন্যাসের মোটামুটি অর্ধেক লেখার পর সৌম্য দু'সপ্তাহের ছুটি নেয়। না, না, ছুটি পেতে কোন অসুবিধে হয় না। সেক্সন অফিসার যোগেনবাবু থেকে শুরু স্বয়ং চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার দ্যুতিশ সরকার পর্যন্ত সবাই ওর গুণগ্রাহী পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক। ছুটির মধ্যেই উপন্যাস শেষ হয়। তারপর ও নিজে বার বার পড়ে আর সংশোধন সংযোজন করে। এবার ও ছায়াকে বলে, বড়বৌদি, তুমি আর আমার প্রেয়সী পড়ে দেখো তো এবার কেমন লিখলাম।

দিন তিনেক পর ওরা দু'জনেই বলল, এই উপন্যাসটা একেবারেই অন্য ধরণের। ডালহৌসী পাড়ার কেরানী বা সাধারণ অফিসারদের এত লড়াই করে টাকা রোজগার করে সংসার চালাতে হয়, তা আমরা জানতামই না।

—আর কিছু বলবে?

কাবেরী বলল, এই এক দল মানুষের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে কত সুখ-দুঃখে জড়িয়ে আছে! সত্যি বলছি ঠাকুপো, তোমার এই চরিত্রগুলোকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

—দেখি বকুল কী বলে।

পুরো এক সপ্তাহ ধরে উপন্যাসটা বার বার পড়ার পর বকুল ফাইল হাতে নিয়ে রবিবার সকালে এসে হাজির। সৌম্যরা তিন ভাই আর তিনটে ছেলেমেয়ে তখন লুচি-আলুর দম খাচ্ছে। বৃদ্ধা সরলাবালা পাশেই একটা চেয়ারে বসে। দুই বউ

খাওয়া-দাওয়ার তদারকী করছে। ওকে দেখেই ছায়া বলেন, বকুল, বসে পড়।

—বড় বৌদি, এই মাত্র এক পেট খেয়ে এলাম।

কাবেরী বলে, তাহলে একটা মিষ্টি খাও। দাদা এনেছে, খুব ভাল মিষ্টি।

—হ্যাঁ, খাবো. ; তবে একটু পরে দিও!

ছায়া জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ রে বকুল, ছোট ঠাকুরপোর এই উপন্যাস কেমন লাগল?

বকুল একটু হেসে বলে, সবার সামনেই বলব?

—বলবি না কেন?

—বড় বৌদি, 'অনেক দিনের মনের মানুষ' সমুদাকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করলেও এই উপন্যাস ওকে ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা আর মর্যাদা দেবে।

সৌম্য খেতে খেতেই মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে হাসে।

—হাসছ কী! আজ আমি সবার সামনে বলছি, এই উপন্যাস বেরুবার পর বড় বড় রাইটাররাও তোমাকে খাতির করতে বাধ্য হবে। ইউ আর গোয়িং টু বী এ গ্রেট নভেলিষ্ট!

খেতে খেতেই তিথিরা দু'হাত দিয়ে তালি দিয়ে ওঠে। বলে, পিসী, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

পরের দিন সকালে সৌম্য যখন খেতে বসেছে, তখন ছায়া বলেন, ছোট ঠাকুরপো, সামনের রবিবার তিথিকে আসতে বোলো। তোমার উপন্যাসও পড়বে আর আমাদের সঙ্গে একটু গল্পগুজবও করবে।

কাবেরী বলে, হ্যাঁ, ঠাকুরপো, প্লীজ বোলো।

—তোমরা কাল চিঠি লিখে দিও। ওকে দিয়ে দেব।

ছায়া বলেন, হ্যাঁ, তাই করব।

শুক্রবার কলেজ থেকে ফিরে তিথিয়া কিছু না বললেও রাত্রে খেতে বসে সবার সামনেই বলে, কাল কলেজের পর আমি সুন্দরী কাকিমার কাছে যাব আর রবিবার সকালে ওকে নিয়ে আসব।

ও কোন মতে হাসি চেপে একটু গলা চড়িয়েই বলে, আশা করি কারুর কোন আপত্তি নেই।

—ওর কথায় সবাই হেসে ওঠেন।

ছায়া বলেন, হ্যাঁ, তাই করিস।

—আগে ভাল কাকুর মতামত জেনে নাও।

সৌম্য বলে, ভাল কাকু আর কী বলবে? মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে,

পার্লামেন্টের মেজরিটি মেম্বারই তোর প্রস্তাবের সমর্থক।

পবিত্র বলেন, তিথি, প্রাইম মিনিষ্টার ঠিকই বলেছেন। ইউ গো অ্যাহেড।

রবিবার ন'টা বাজতে না বাজতেই তিথিয়া তার সুন্দরী কাকিমাকে নিয়ে হাজির।

সবাই অবাক। ছায়া জিজ্ঞেস করেন, তোরা এত তাড়াতাড়ি এলি কী করে?

তিথিয়া জবাব দেবার আগেই সৌম্য বলে, বড়বৌদি, তোমাদের ভি-আই-পি অতিথি বোধহয় আমাদের মেয়েটাকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই রাত কাটিয়েছেন।

তিথিয়া বলে, সুন্দরী কাকিমার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে তো দূরের কথা, গাছের তলাতেও রাত কাটাতে আমার কষ্ট হবে না।

কাবেরী তিথি ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে বলে, শুনলে আমাদের মেয়েদের কথা?

ও কী বলবে? শুধু হাসে।

তিথিয়া বলে, ভাল দাদু আমাদের স্টেশনে ছেড়ে দিয়েছেন ; আবার রাত সাড়ে আটটার মধ্যেই গাড়ি নিয়ে হাওড়ায় অপেক্ষা করবেন।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমি আর ভাল কাকু সাতটা বিয়াল্লিশের ট্রেন ধরে সুন্দরী কাকিমাকে হাওড়ায় পৌঁছে দেব।

মৃত্তিকা আর হিন্দোল সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে, আমরাও যাব।

সৌম্য বলে, নিশ্চয়ই তোমরা যাবে।

কাবেরী বলে, আমিও যাব।

ছায়া বলেন, হ্যাঁ, যাবি।

সৌম্য বলে, বড় বৌদি, আমি কিন্তু এই যুবতীর কোন দায়িত্ব নিতে পারব না।

কাবেরী বলে, আমি কী তোমার কোলে চড়ে যাব যে তুমি আমার দায়িত্ব নিতে পারবে না?

—ঐ অত রাত্রের ট্রেনে তুমি আমার পাশে বসে কি করবে, তা তো তিনটে ছেলেমেয়ের সামনে বলতে পারছি না।

কাবেরী আলতো করে ওর একটা কান ধরে বলে, সবার সামনেই পিঠে দু'চার ঘা বসিয়ে দিই?

—যে মেয়ে দিনরাত্তির স্বামীকে পেটাচ্ছে, সে যে আমাকেও মারধর করবে, তাতে আর অবাক হবার কী আছে?

পরের দিন তিথি ব্যানার্জি এলেন, উপন্যাস পড়লেন কিন্তু তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ছায়া আর কাবেরীকে বলে, অনেক দিন পর এমন একটা উপন্যাস পড়লাম, যা বোধহয় কোনদিনই ভুলতে পারব না।

একবার নিঃশ্বাস ছেড়ে ও একটু হেসে বলে, এবার আপনাদের ছোট ঠাকুরপো সত্যি সত্যিই একজন পাকা ঔপন্যাসিক হলেন।

দু' তিন দিন পর পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে দেশ-এর সম্পাদক একটু নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, সৌম্য খুব অল্পদিনের মধ্যেই তুমি দুটো উপন্যাস লিখলে। বছর খানেকের আগে আর উপন্যাস লিখো না। বেশি লিখলে লেখার স্ট্যান্ডার্ড ঠিক রাখা খুবই কঠিন।

—হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি।

—তবে মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই গল্প লিখবে। তা না হলে লেখার অভ্যাস থাকবে না।

সৌম্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

সম্পাদক আবার বলেন, তবে উপন্যাস লেখার চিন্তা সব সময় মাথায় রাখবে।

—হ্যাঁ, রাখব।

'অনেক দিনের মনের মানুষ' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। উপন্যাস শেষ হবার আগেই বর্ষা পালাই পালাই করছে। মাঝে মাঝেই নীল আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। দীপালি বৌদির বাড়ির পিছন দিকে চণ্ডীনগরের মাঠের কোথাও কোথাও কাশ ফুল হেসে খেলে দুলতে শুরু করে। শুরু হয়ে গেল পূজা সংখ্যার বিজ্ঞাপন আনন্দবাজারের পাতায় পাতায় আর সারা কলকাতা শহরের বিশাল বিশাল হোর্ডিং-এ। সর্বত্রই প্রথমে রয়েছে সৌম্য সরকারের নাম। সৌম্য নিজেও মাঝে মাঝে বিস্ময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে হোর্ডিংগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এখন ভিড়ে ভর্তি তারকেশ্বর লোকালের প্রতিটি কামরায় নিত্য ওর আলোচনা। ওকে হাসি মুখে সীট ছেড়ে দেন দিয়াড়া-নসিবপুর-সিঙ্গুর-কামারকুণ্ডু-নালিকুল-মালিয়ার অপরিচিত যাত্রীরাও।

একদিন অফিস থেকে একসঙ্গে বেরুবার পর তিথি ওকে বলে, টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের সামনে বিশাল হোর্ডিং-এ আপনার নাম দেখে এতে ভাল লাগে যে কি বলব!

ও একটু থেমে বলে, আপনার কেমন লাগে?

—আমারও ভাল লাগে। আমিও তো মানুষ!

সৌম্য এক মুহূর্ত থেমে বলে, দুটো উপন্যাস লিখেছি বলে কী আর পাঁচজন মানুষের মত আমার সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না কামনা-বাসনা থাকবে না?

দু' চার পা এগুতে না এগুতেই তিথি একটু হেসে বলে, এবার বিয়ে করুন ;

আর দেরি করবেন না।

—একটা মেয়ে দেখে দিন। নিশ্চয়ই বিয়ে করব।

—কী রকম মেয়ে আপনার পছন্দ?

—নিশ্চয়ই সুন্দরী হবে আর সাহিত্যে আগ্রহ থাকতে হবে।

সৌম্য প্রায় না থেমেই বলে, তাছাড়া সে মেয়ে যেন আমার মা-বাবা-দাদা-বৌদি আর আমার তিনটে ছেলেমেয়ে ছাড়াও আমাকে ভালবাসে।

—ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি।

দিন দশেক পরেই তিথি একদিন অফিসে এলেন না কিন্তু পরের দিনও না আসায় অফিসের সবাই অবাক হলেন। চারদিনের দিন এক ভদ্রলোক এসে যোগেনবাবুর কাছে তিথির একটা ছুটির দরখাস্ত পৌঁছে দিলেন। লিখেছেন, অত্যন্ত জরুরী পারিবারিক কারণে আপাততঃ দু'সপ্তাহের ছুটি চাই।

অফিসের সবাই মনে করলেন, নিশ্চয়ই ওর স্বামী আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন। বোধহয় দু'জনে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন বলে ছুটি চেয়েছেন। অনেকেই বললেন, মনে হয়, তিথিকে নিয়েই ওর স্বামী আমেরিকা ফিরে যাবেন।

যোগেনবাবু আর ছায়াদিরা বললেন, ভগবান বোধহয় এবার সত্যি সত্যিই ওর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। বেচারী বিয়ে করেও তো কোনদিন স্বামীকে পায়নি। এবার যেন মেয়েটা সুখে থাকে।

সৌম্যও এইরকমই অনুমান করে কিন্তু মুখে কিছু বলে না, বলতে উৎসাহবোধ করে না। একটা অব্যক্ত ব্যথা আর শূন্যতার জ্বালা অনুভব করে মনে মনে। দিনরাত সব সময়।

হঠাৎ তিথির অফিস কামাই, ছুটি আর অফিসের লোকজনের আলাপ-আলোচনার খবর শুনে সৌম্যর বাড়িই সবাই খুশি হলেও সম্ভাব্য বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় দুঃখ পান।

তবু সময় এগিয়ে চলে। রোজ সূর্য ওঠে আর অস্ত যায় ; সন্ধ্যের পর থেকেই শরতের হিম পড়ে। পাড়ায় পাড়ায় দুর্গোৎসবের আয়োজন পুরো দাম শুরু হয়। সৌম্য গল্প লেখা শুরু করেছিল দিন পনের আগে কিন্তু দু'পাতা লেখার পর কিছুতেই আর লিখতে পারছে না।

সেদিন রবিবার। একটু বেলা করেই সবাই জলখাবার খেয়েছেন। মৃত্তিকা আর হিন্দোল তখনও ডাইনিং টেবিলে বসে হাত চাটলেও সৌম্যরা তিন ভাইই যে যার

ঘরে চলে গেছে। হঠাৎ গাড়ি নিয়ে জংলীকাকা এসে হাজির।

বাড়ির সবাই অবাক, সবারই এক প্রশ্ন, আপনি একলা কেন?

ছায়া জিজ্ঞেস করে, আপনাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন? আপনার কী শরীর খারাপ? তিথিকে নিয়ে এলেন না কেন?

জংলীকাকা পাঁজর কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সাংঘাতিক হার্ট অ্যাটাক হয়ে সাহেব আজ দশ দিন নার্সিংহোমে ; তবে এখন একটু ভাল। তবে কখন কি হয়, কিছুই বলা যাচ্ছে না।

উনি না থেমেই বলেন, সাহেব বললেন, এখুনি সৌম্য, দুই বৌমা আর তিনটে নাতি-নাতনীকে নিয়ে আয়। খুব দরকার।

উনি কোনমতে একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, বৌমা, তোমরা এখুনি চলো। নিতান্ত সাহেব হুকুম করলেন। তা না হলে আমাকে মেরে কেটে ফেললেও নার্সিং হোম ছেড়ে বেরুতাম না।

এ খবর শুনে কী ওরা স্থির থাকতে পারেন? বৃদ্ধা সরলাবালা বললেন, বড় বৌমা, তোমরা দেরি করো না। আমি রাধাকে দিয়ে কোনমতে দুটো ডাল-ভাত ফুটিয়ে সবাইকে খাইয়ে দেব।

না, না, ওরা কেউই দেরি করে না। সবাই চটপট তৈরি হয়ে গাড়িতে ওঠে। জংলীকাকাও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট করেন।

দশ-পনের মিনিট চুপ করে থাকার পর সৌম্য জিজ্ঞেস করে, জংলীকাকা, হার্ট অ্যাটাক হবার আগেই কী মেসোমশায়ের প্রেসার খুব বেড়েছিল?

—না, না, উনি ভালই ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে সাহেবের সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু অনেক বছর পর আমেরিকা থেকে এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সাহেব চেয়ার থেকে পড়ে যান।

—তারপর?

—বৌমা সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে খবরটা জানাবার পর পরই আমরা সাহেবকে উডল্যান্ডস্-এ নিয়ে যাই।

—তারপর?

—তারপর আর কী? দিনরাত্তির চব্বিশ ঘণ্টা ডাক্তার-নার্স সাহেবের পাশে রয়েছেন। আমি আর বৌমা ওখানেই পড়ে আছি। সাহেবের বন্ধু দিনের মধ্যে আঠার-উনিশ ঘণ্টাই সাহেবের কাছে থাকছেন আর পুলিশের ডি-জি আই-জি পুলিশ কমিশনার আর ডি-সি'রা কখনও সকালে, কখনও বিকেল-সন্ধেয় আসছেন।

—বিপদ কী কেটে গেছে? ডাক্তাররা কী কিছু বলেছেন?

—সাহেবের বন্ধু সব বলবেন। আমাকে আর কথা বলিও না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, বুঝতেই পারছো আমার মনের কি অবস্থা। বেশি কথা বলতে গেলে হয়ত অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলব।

না, না, সৌম্য আর কথা বলে না, বলতে সাহস করে না। জংলীকাকার দিকে তাকাতেও যেন ওর ভয় করে।

হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে ব্রেবোর্ন রোডে গাড়ি ঢুকতেই জংলীকাকা বলেন, সৌম্য, ক'টা বাজে?

—প্রায় দেড়টা।

—ও।

একটু পরে সৌম্য জিজ্ঞেস করে, এখন আমাদের ঢুকতে দেবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন চিন্তা নেই।

দেখতে দেখতে গাড়ি ডালহৌসি-রাজভবন-রেড-রোড পিছনে রেখে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-রেসকোর্স ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। তাজ বেঙ্গল-চিড়িয়াখানা দু' পাশে রেখে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পাশে এসেই গাড়ি ডান দিকের সরু রাস্তায় ঢোকে। এক মিনিটের মধ্যে ওরা পৌঁছে যায় উড্‌ল্যান্ডস্ নার্সিংহোমে। গাড়ি থেকে নেমেই ছায়া তিন ছেলেমেয়েকে বলেন, খুব সাবধান, কেউ কোন কথা বলবে না। কারুর মুখ দিয়ে যেন একটা শব্দও না বেরোয়।

জংলীকাকার পিছন পিছন ওরা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেন, সবাইকে নিয়ে এসেছিস তো?

জংলীকাকা বলেন, হ্যাঁ, স্যার।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বয়স ব্যানার্জি সাহেবের মত একাত্তর-বাহাত্তর হলেও দেহটি বেশ ঋজু ও বলিষ্ঠ, লম্বায় অন্তত ছ'ফুট, মাথায় ধবধবে সাদা চুল, প্রশান্ত ললাট ও চশমার ওপাশে উজ্জ্বল দুটো চোখ, রং শ্যামবর্ণ হলেও মুখখানা বেশ সুন্দর কিন্তু মন চঞ্চল বলে মুখে হাসি নেই। তবুও যেন উনি জোর করে একটু হেসে এগিয়ে এসে দু' হাত দিয়ে সৌম্যর দুটো হাত-ধরে বলেন, তুমিই তো সৌম্য?

—হ্যাঁ, কাকু।

এবার উনি ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমিই তো বড় বৌমা?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তুমি তো কাবেরী।

—হ্যাঁ।

এবার উনি তিথিয়ার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, তুমিই তো দিবাকরের

নাম্বার ওয়ান গার্ল ফ্রেন্ড?

ও একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

এবার অন্য দু'জনের কাঁধে হাত রেখে বলেন, এরা যে মৃত্তিকা আর হিন্দোল, তা জানি।

এবার সৌম্য জিজ্ঞেস করে, কাকু, এখন মেসোমশাই কেমন আছেন?

ওর প্রশ্ন শুনেই বৃদ্ধের মুখের চেহারা বদলে যায়। চোখে মুখে দুঃশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে। তারপর বলেন, এখানে ভর্তি হবার থার্ড ডে-তে দিবাকরের আবার একটা অ্যাটাক হয় কিন্তু ভাগ্যক্রমে তখন ডাঃ দিলীপ মজুমদার নিজেই ওর কাছে ছিলেন।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, একটা সপ্তাহ খুবই খারাপ কেটেছে। পরশু ওকে দেখে ডাঃ মজুমদার বললেন, মনে হয়, এবারকার মত বিপদ কেটে গেল।

—কথা বলছেন?

—পরশুই প্রথম দু'একটা কথা বলেছে।

উনি একটু থেমেই বলেন, গতকাল থেকে সকালে পাঁচ মিনিট আর বিকেলে পাঁচ মিনিট কথা বলার পারমিশন দিয়েছেন ডাঃ মজুমদার।

এবার উনি বলেন, দিবাকর তো তোমাদের কাছে পাবার জন্য ফটফট করছে।

এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথাবার্তা শোনার পর ছায়া বলেন, আমরা সবাই কী ওঁর কাছে যাব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের সবাইকেই ও কাছে চায়।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মনে হয়, দিবাকর তোমাদের কিছু বলতে চায়। তাইতো কাল বিকেল থেকেই ও জংলীকে বলছে, যা, যা, চট করে ওদের নিয়ে আয়।

মিনিট খানেক আপনমনে কি যেন ভেবে উনি বলেন, তবে আগে আমি তোমাদের কিছু বলব। তারপর তোমাদের সবাইকে নিয়ে ওর কেবিনে ঢুকব। চল, আমরা নীচে যাই।

নীচে আমার পর সবাই ওকে ঘিরে বসে।

এবার বৃদ্ধ শুরু করেন, আমার নাম জগদীশ চন্দ্র চৌধুরী। আমরা দু'জনেই অরিজিনালী সেন্ট্রাল ক্যালকাটার ঝামাপুকুর অঞ্চলের গোপাল বোস লেনের ছেলে। আমার বাবা লিভার ব্রাটার্সের অফিসার ছিলেন আর দিবাকরের বাবা ছিলেন রিপন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক। আমাদের দু'জনেরই ছিল জয়েন্ট ফ্যামিলী ; দুটো ফ্যামিলীই থাকতো নিজেদের বাড়িতে।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, আমি আর দিবাকর ক্লাস ওয়ান থেকে আই. এস. সি পর্যন্ত এক সঙ্গে পড়েছি, খেলেছি, খেয়েছি, ঝগড়া করেছি কিন্তু দশ-পনের মিনিটের বেশি একজন অন্যজনের সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারতাম না।

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বলেন, এক কথায় আমরা হচ্ছি হরিহর আত্মা। হি ইজ মাই ওনলি ফ্রেন্ড আর আমি হচ্ছি ওর বেস্ট ফ্রেন্ড।

সৌম্য বলে, তারপর?

—আই. এস-সি পাস করার পর আমি ভর্তি হলাম শিবপুর বি. ই. কলেজে আর ও বি.এস-সি পড়তে শুরু করেন। তবে প্রত্যেক সপ্তাহেই আমাদের দেখা হতো।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, আমার মা মারা গেলেন, বাবা বদলী হলেন আর আমিও পড়াশুনা নিয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে দিবাকর বি.এস-সি পাশ করেই আই. পি এস. হয়ে গেল।

—আপনি আমেরিকা গেলেন কবে?

—আম শিবপুর থেকে বেরিয়েই মাস্টার্স করার জন্য চলে গেলাম ম্যাঞ্চেস্টার। পাশ করার পর মাত্র দু'বছর ইংল্যান্ডে ছিলাম। তারপরই চলে যাই আমেরিকা।

উনি এক মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ইতিমধ্যে আমার বাবাও মারা যান। ফলে কলকাতার বাড়ির সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগই রইল না।

—আপনার অন্য ভাইবোন নেই?

—না।

উনি না থেমেই বলে যান, ওদিকে দিবাকরদের ফ্যামিলীতে নিত্য অশান্তি সহ্য করতে না পেরে ওর বাবা নিজের যথাসর্বস্ব আর ভাল মাসীমার সমস্ত গহনা বিক্রি করে এক ইংরেজের কাছ থেকে মুর এভিন্যুর বাড়ি কিনে ওখানে চলে যান। আমি কলকাতা এলে ভাল কাকু-ভাল মাসীমার সঙ্গে ঐ বাড়িতেই থাকতাম।

—আপনাদের দুই বন্ধুর সঙ্গে কী মাঝে মধ্যে দেখাশুনা হতো?

—খুব কম। তবে আমার ছোট মাসীমা যখন দিল্লীতে ওদেরই এক প্রতিবেশী পরিবারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন, তখন দিবাকর এসেছিল কিন্তু আমি ওর বিয়েতে আসতে পারিনি।

মিঃ চৌধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আনফরচুনেটলি দিবাকর ওর স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হতে পারেনি।

—কেন? জিভ ফসকে সৌম্য প্রশ্ন করে।

—দিবাকর যেমন সৎ, নির্লোভী, ভদ্র, বিনয়ী, ওর স্ত্রী ছিলেন ঠিক বিপরীত চরিত্রের। এমন কি উনি লুকিয়ে-চুরিয়ে টাকা বা দামী দামী প্রেজেনটেশন নিয়ে

দিবাকরকে ইনফ্লুয়েন্স করারও চেষ্টা করতেন।

—আপনি ওনাকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ কিন্তু আমারও ভদ্রমহিলাকে ভাল লাগতো না।

উনি আবার একটু থেমে বলেন, সে যাইহোক একদিকে আমি আমেরিকা-কানাডার নানা জায়গায় চাকরি করার পর ক্যালিফোর্নিয়াতে নিজের ব্যবসা নিয়ে মেতে উঠলাম, অন্যদিকে দিবাকর তো চড়ুই পাখির মত একবার এখানে, একবার ওখানে বদলী হয়েছে।

—আর আপনাদের দেখাশুনা হতো না?

—লাস্ট টাইম যখন দার্জিলিং-এ আমাদের দেখা হয়, তখন আমার ছেলে ন'বছরের, মেয়ে দু' বছরের আর ওর ছেলে ঠিক সাত বছরের।

—সে কত বছর আগেকার কথা?

—ঠিক সাতাশ বছর আগের কথা।

এবার উনি প্রায় না থেমেই বলো, টু কাট শর্ট এবার আসল কথা বলি। আমার ছেলের নিজের অডিটর ফার্ম আছে, বৌমা আর্কিটেক্ট, থাকে শিকাগোতে। আর মেয়ের বিয়ে হয়েছে নাগপুরে ; মেয়ে-জামাই দু'জনেই নাগপুর ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার।

সবাই চুপ করে ওর কথা শোনো।

—আমার স্ত্রী পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছেন। উনি বেঁচে থাকতে প্রায় প্রতি মাসেই ছেলের কাছে যেতাম কিন্তু নাগপুরে আসতাম না। মেয়ে-জামাইকে টিকিট পাঠিয়ে দিতাম। ওরাই প্রত্যেক বছর ওখানে আসতো।

মিঃ চৌধুরী একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার পর বলেন, আমি আর আমার স্ত্রী অনেকদিন ভেবেছি, দেশে ফিরে আসব। স্ত্রী মারা যাবার পর ছেলেকে বললাম, ওর ফার্মকে ক্যালিফোর্নিয়া নিয়ে আসতে আর আমার কারখানাও দেখাশুনা করতে কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই বলে ও আমার এঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম চালাতে অস্বীকার করল।

বৃদ্ধ একটু থামেন। তারপর বলেন, কারখানা বিক্রি করে এত বছরের সংসার গুটিয়ে এখানে আসতে আসতে ক'টা বছর কেটে গেল। তবে চলে আসার আগে ছেলে, পুত্রবধূ আর দুই নাতিনাতনীর সঙ্গে কিছুদিন কাটাবার জন্য চলে গেলাম শিকাগো।

সবাই এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে। শুধু হিন্দোল আর মৃত্তিকা একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

—আমি চলে আসার দু'দিন আগে ছেলে আর পুত্রবধূ একটা গ্রান্ড পার্টি দিল

ওখানকার বিখ্যাত অ্যাসকট ইন-এ। শিকাগো ছাড়াও আরো অনেক শহর থেকে শ' দুয়েক বাঙ্গালী এলেন ঐ পার্টিতে। সবার সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় আর নানা কথাবার্তা হলো।...

মনীষা শাড়ি পরিহিতা এক আমেরিকান মহিলা আর তার দু'টি ছেলেমেয়েকে মিঃ চৌধুরীর সামনে এনে বলল, বাবা, এ হচ্ছে আপনার ছেলের এক বন্ধুর স্ত্রী মার্লিন বোনার্জি।

বিদেশিনী হাত জোড় করে বললেন, নমস্খার।

—নমস্কার।

দশ-এগার বছরের ছেলেটিকে দেখিয়ে মনীষা বলে, এ হচ্ছে জো।

ছেলেটি শুধু বলল, হাই!

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে ওর সঙ্গে করমর্দন করেন।

মনীষা ছ'-সাত বছরের মেয়েটিকে দেখিয়ে বলে, আর এ হচ্ছে জেন।

জেন শুধু হাসে।

ঠিক সেই সময় ওয়েটার এসে মিসেস ব্যানার্জি দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে অত্যন্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করে, ম্যাডাম, হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ?

—হুইস্কী অন রকস্।

—ফাইন।

ওয়েটার সঙ্গে সঙ্গে হুইস্কীর গেলাসে কয়েক টুকরো আইস কিউব ফেলে এগিয়ে দিতেই মার্লিন গেলাস হাতে তুলে নিয়ে বলেন, থ্যাঙ্কস্।

উনি মিঃ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে গেলাস সামান্য তুলে বলেন, ফর ইওর গুড হেলথ্ অ্যান্ড লং লাইফ।

—অশেষ ধন্যবাদ।

হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়ে মার্লিন বলে, হোয়াই আর ইউ গোয়িং টু দ্যাট ডার্টি সিটি? ক্যালকাটা তো মাছি, মশা, ভিখিরি, বেকার আর ব্লাডি কমিউনিস্টদের শহর বলেই বিখ্যাত।

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বলেন, ওখানেই আমি জন্মেছি, লেখাপড়া শিখেছি, আমার মা-বাবাও ওখানেই জন্মেছেন ও মারা গিয়েছেন। তাইতো ওখানে ফিরে যাচ্ছি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে জিজ্ঞেস করো, আপনার স্বামী তো বাঙ্গালী, তাই না?

—ইয়া, ইয়া।

—আপনি কলকাতা গিয়েছেন?

চোখ মুখে আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে মার্লিন বলে, ও মাই গড! ঐ জঘন্য শহরে

আমি কেন যাব?

—গেলে বুঝতেন কলকাতা অত খারাপ না। গর্ব করার মত অনেক কিছুই ঐ শহরে আছে।

মিসেস বোনার্জি ঠোঁট উল্টে বলেন, আপনারা গর্ব করুন বাট আই হেট দ্যাট সিটি।

—আপনার স্বামী কী মাঝে মাঝে কলকাতা য'ন?

—নট অ্যাট অল।

উনি একটু থেমে বলেন, সাম ইয়ার্স ব্যাক আমরা হোল ফ্যামিলী কলম্বোতে যাবার পথে দু'দিন দিল্লী ছিলাম। ডেলহি ইজ নট এ ব্যাড প্লেস বাট উই লাইকড্ ট্যাজ। রিয়েলী বিউটিফুল।

--তখন মিঃ বোনার্জি কলকাতা যাননি?

—না, না ; ওখানে গেলেই তো অসুখে পড়বে।

—তার মানে আপনার স্বামী এ দেশে আসার পর আর কলকাতায় যাননি?

—সাম ইয়ার্স ব্যাক জরুরী কাজে হংকং যাবার সময় বোধহয় কয়েক দিনের জন্য ওখানে গিয়েছিল।

—আই সী!

মিঃ চৌধুরী একটু থেমে বলেন, মিঃ বোনার্জির মা-বাবা বেঁচে নেই?

—সরি আমি জানি না।

—আপনার স্বামী কী করেন?

—আমার বাবার কনস্ট্রাকশন ফার্মের জুনিয়ার পার্টনার।

—আই সী।

ওয়েটার এসে মিসেস বোনার্জির খালি গেলাস নিয়ে আবার একটা ড্রিঙ্ক দিয়ে যায়।

—মিঃ চাউধারী, আপনার হাত খালি কেন?

—সরি আমি ড্রিঙ্ক করি না।

মার্লিন হো হো করে হেসে উঠে বলে, ও মাই গড! এত বছর এ দেশে কাটিয়েও আপনি ড্রিঙ্ক করেন না, তা আমি ভাবতেই পারছি না।

—এটা আমার অক্ষমতা।

—আপনার ছেলে ইজ এ নাইস গাই বাট সেও ড্রিঙ্ক করে না। হোয়াট এ ট্রাজেডি!

—আপনার স্বামী এখানে আসবেন না?

—ও খুব জরুরী কাজে ব্যস্ত ; তবুও আসবে বলেই মনে হয়।

মনীষা এবার একজন বিবাহিতা বাঙ্গালী মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে আসতেই মার্লিন অন্য একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে যান।

মনীষা এক গাল হেসে বলে, বাবা, এ হচ্ছে শ্রাবন্তী। আপনার ছেলের প্রাণপ্রিয় বন্ধু শিবালিকের স্ত্রী। এরা দু'জনেই একসঙ্গে খড়গপুর আই-আই-টি'তে ন্যাভাল আর্কিটেক্চার নিয়ে পড়েছে কিন্তু দু'জনেই অসম্ভব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তর গান গাইতে পারে বলেই বিয়ে হয়েছে।

মিঃ চৌধুরী খুশির হাসি হেসে বলেন, বাঃ! খুব ভাল।

এবার উনি শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার নামটিও যেমন সুন্দর, তোমার মুখের হাসিও ভারী সুন্দর। তোমাদের মত মেয়েদের দেখলে সত্যি ভাল লাগে।

শ্রাবন্তী বলে, মেসোমশ'ই, পার্টি চলছে বলে আপনার পায় হাত দিয়ে প্রণাম করতে পারলাম না। আমার উপর রাগ করবেন না।

—না, মা, না।

উনি একটু থেমে বলেন, তুমি যে প্রণাম করতে চাইলে, তাতেই তো আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেছে।

মনীষা বলে, বাবা, শ্রাবন্তীর হাতের নিরামিষ রান্না আর শিবালিকের হাতের মাংস খেলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

—এদের সঙ্গে আগে কেন পরিচয় হয়নি?

—ওরা তো আগে অ্যাটল্যান্টায় থাকতো।

—ও!

হঠাৎ শ্রাবন্তী প্রায় ছুটে গিয়ে শাড়ি পরিহিতা এক বিদেশিনীকে ধরে এনে মিঃ চৌধুরীকে বলে, মেসোমশাই, এ হচ্ছে আমার আর মনীষার কমন ফ্রেন্ড গঙ্গা।

—গঙ্গা!

বিস্ময় প্রকাশ করেন মিঃ চৌধুরী।

গঙ্গা হেসে বিশুদ্ধ বাংলায় বলে, মেসোমশাই, আমি শান্তিনিকেতনে পাঁচ বছর পড়েছি।...

—বল কী?

—তারপর কলকাতায় গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনিস্টিটিউট অব কালচারে দু'বার ছ'মাস করে থেকেছি। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ আমাকে গঙ্গা নাম দেন।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ওখানেই তো আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় ও আস্তে

আস্তে বন্ধুত্ব হয় কিন্তু আমার শাশুড়ি মা-ই আমাদের বিয়ে দেন।

—বাঃ। চমৎকার।

—মেসোমশাই, যাকে বিয়ে করে সারাজীবন একসঙ্গে কাটাব, তার দেশকে যদি শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে না পারি, তাহলে কী বিবাহিত জীবন সুখের বা শান্তির হয়?

—ঠিক বলেছ মা।

মনীষা বলে, বাবা, লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের জন্য গঙ্গা দুটো বই আমার কাছে দিয়েছে। আপনি বই দুটো মহারাজকে দিয়ে দেবেন।

—নিশ্চয়ই দেব।

মিঃ চৌধুরী মুহূর্তের জন্য থেমে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কলকাতা যাও?

—আমার স্বামী প্রত্যেক বছর যায়। আমি এক বছর অন্তর যাই।

গঙ্গা একটু হেসে বলে, দু'জনে গেলে অনেক খরচ। তাছাড়া আমার ছেলেটা খুবই ছোট।

—যাইহোক এবার যখন কলকাতা যাবে, নিশ্চয়ই আমার কাছে তোমরা দু'একদিন থাকবে।

গঙ্গা বাঁকা চোখে মনীষাকে মুহূর্তের জন্য দেখে নিয়েই একটু হেসে বলে, আপনার পুত্রবধূ রাগ না করলে নিশ্চয়ই যাব।

মনীষা হাসতে হাসতে বলে, আমি রাগ করলেও তুই যাবি।

আলাপ-পরিচয় আরো কতজনের সঙ্গে।

পার্টি শেষ হবার প্রায় অন্তিম সময় মিঃ চৌধুরীর ছেলে একজন ভদ্রলোককে ওর সামনে এনে বলে, বাবা, আমার বন্ধু রঞ্জু। বিশাল কনস্ট্রাকশন ফার্মের পার্টনার। আমি ওদের ফার্মের অ্যাডভাইসার।

—ও আচ্ছা!

রঞ্জু বলে, নমস্কার আংকল!

—নমস্কার।

রঞ্জু পাশ ফিরে বলে, বিতান, আমি যাস্ট দু'পেগ গিলেই পালাব।

—এসো, এসো।

ওরা একটু দূরে যেতেই মিঃ চৌধুরীর নাতনী চন্দ্রিমা গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে ওর সামনে এসে বলে, জানো দাদু, আমি আর ভাইমণি প্রত্যেক গেস্টের ছবি তুলেছি।

—প্রত্যেকের?

—হ্যাঁ।

—খুব ভাল করেছ।

পরের দিন দুপুরের দিকে বিতান আর মনীষা ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আসে নিউ ইয়র্ক। হোটেলে পৌঁছে খাওয়া-দাওয়ার পর মনীষা শ্বশুরের হাতে একটা অ্যালবাম তুলে দিয়ে বলে, আপনার নাতি-নাতনীর তোলা কালকের পার্টির ছবি।

—গুড! ভেরি গুড।

হাতে তখনও কয়েক ঘণ্টা সময় আছে। বিতান ছবিগুলো দেখাতে দেখাতে নানা গেস্টের সম্পর্কে কিছু বলে।

—জানেন তো বাবা, শিবালিকের বাবাও শিবপুরের সিভিলের ছাত্র ছিলেন। বোধহয় আপনার সমসাময়িক।

—তা হতে পারে।

—এই প্রদীপের বাবা যাদবপুরে পড়াতেন , মা পড়াতেন বেথুনে।

—আর সুকৃত আর শিউলির বাবা ডাক্তার , একজন সার্জেন আর একজন গাইনি।

—আর এই রঞ্জুর বাবা ছিলেন হয় কলকাতার পুলিশ কমিশনার বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের আই. জি।

শুনেই কেমন খটকা লাগে মিঃ চৌধুরীর। জিজ্ঞেস করেন, রঞ্জুর পুরো নাম কী?

বিতান একটু হেসে বলে, আগে ছিল রঞ্জিত ব্যানার্জি ; মার্লিনের সঙ্গে ভাব হবার পর থেকে হয়েছে রঞ্জু বোনার্জি।

—কলকাতায় ওদের বাড়ি কোথায় বলতে পারিস?

—শুনেছি, এক কালে টালিগঞ্জের মুর অ্যাভিন্যুতে..

মিঃ চৌধুরী চিৎকার করে ওঠেন, তাহলে ও তো আমার বন্ধু দিবাকরের ছেলে।

—ও মাই গড! ও আমাদের সুন্দর কাকুর ছেলে?

—তাইতো দেখছি।

উনি একটু থেমে বলেন, রঞ্জু যখন খুব ছোট তখন ওকে আমি দেখেছি।

এবার উনি হেসে বলেন, ছেলে, পুত্রবধূ আর নাতিনাতনীর ছবি দেখিয়ে দিবাকরকে চমকে দেব।

মিঃ চৌধুরী কয়েক মিনিট চুপ করে থাকেন। তারপর মুখ নীচু করে বলেন, কলকাতায় পৌঁছবার পরদিন সকালেই আমি দিবাকরের কাছে গেলাম। বললাম, দ্যাখ, দ্যাখ, তোর নাতিনাতনী আর ছেলে পুত্রবধূর ছবি। আমাকে হাড়ি ভর্তি রসগোল্লা...

উনি কথাটা শেষ না করেই থামেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ঐ ছবিগুলো নাড়াচাড়া করতে করতেই দিবাকর ধপাস করে পড়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরেই জানতে পারলাম, তিথি ওর পুত্রবধূ।

উনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেন, আমি আমার বন্ধুর কি সর্বনাশ করলাম।

মিঃ চৌধুরীর পিছন পিছন ওরা একে একে কেবিনে ঢোকে। ই.সি.জি মনিটর চলছে, নাকের মধ্যে অক্সিজেনের নল। এ কি চেহারা হয়েছে দিবাকর ব্যানার্জির? সবাই চমকে ওঠে, সবারই চোখ ছল ছল করে ওঠে। দুপাশে বসে আছে তিথি আর জংলীকাকা।

ওদের দেখে মিঃ ব্যানার্জির রোগক্লিষ্ট চোখ মুখ যেন একটু উজ্জ্বল হয়। সামান্য ইশারা করে ওদের কাছে ডাকেন। প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন। তারপর অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে ছায়া আর কাবেরীকে কাছে ডেকে বলেন, মাগো, তোমাদের কাছে আমি ভিক্ষে চাই।

ছায়া প্রায় ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, মা-বাবা কী ছেলেমেয়ের কাছে ভিক্ষা চায়? আপনি বলুন, আপনি কী চান?

—মাগো, আমার ছেলেটা একটা পশু। ওর জন্য আমার মা জননী কি কষ্ট সহ্য করছে, তা ভেবে আমি পাগল হয়ে যাই।

উনি একটু থেমে একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, আমি আমার মায়ের কষ্ট আর দেখতে পারছি না।

উনি কোনমতে ছায়ার কয়েকটা আঙ্গুল ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, মাগো, তোমরা আমার মাকে নিয়ে নাও। সৌম্য ছাড়া আর কারুর হাতে আমি আমার মাকে দিয়ে মরার পরও শান্তি পাব না।

ছায়া আর কাবেরী একই সঙ্গে বলে, এতো খুবই আনন্দের কথা। ওকে পেলে তো আমরাই ধন্য হব।

মিঃ ব্যানার্জি দুটো চোখ বন্ধ করে বলেন, তোমরা যে আমাকে কি শান্তি দিলে, তা বলতে পারব না। ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের কল্যাণ করবেন?

এবার উনি ইশারা করে মিঃ চৌধুরী আর জংলীকাকাকে কাছে ডাকেন।

—জগদীশ, আমি না থাকলে তুই সবকিছু করবি। খুব ধুমধাম করে আমার মায়ের বিয়ে দিবি। তার আগে কোর্টের ব্যাপারটা সেরে ফেলিস।

—তোকে যেতে দিচ্ছে কে?

এবার উনি একটু হেসে বলেন, তোকে সামনে রেখে তিথির বিয়েতে আমিই

তো মাতব্বরী করব।

—আর শোন জংলী।

জংলীকাকা ঝুঁকে পড়তেই বলেন, সম্প্রদান তুই করবি।

চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিতে দিতে তিথি বলে, আপনি না থাকলে আমি সারাজীবন এইভাবে কাটাবো।

আরো দিন দশেক উডল্যাণ্ডস্-এ কাটাবার পর ব্যানার্জী সাহেব বাড়ি ফিরে গেলেন। ডাঃ মজুমদারের পরামর্শ মত বাড়ির লনে সকাল-বিকেল একটু হাঁটাহাঁটি করবেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আর সারাদিনে দশ-বারোটা ক্যাপসুল খেতে হলেও উনি এখন বেশ ভালই আছেন। তবে হ্যাঁ, রাত্রে জংলি এখন ওর ঘরেই থাকে। অনেক দিন পর আবার সবার মুখেই হাসি ফুটে উঠেছে।

তিথি একদিন ব্যানার্জী সাহেবের সামনেই মিঃ চৌধুরীকে বলে, কাকা, আমরা থাকতে আপনি একলা একলা সল্ট লেকের বাড়িতে থাকবেন কেন? আপনি আমাদের কাছেই থাকুন।

মিঃ ব্যানার্জী সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে বলেন, মা জননী ঠিকই বলেছে ; তুই আমাদের কাছেই থাক।

উনি একটু থেমে বলেন, মা জননীকে তো এবার অফিসে জয়েন করতে হবে। তুই থাকলে আমাকে সারাদিন বোবা হয়ে থাকতে হবে না।

তিথি জগদীশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার বাড়ির একতলায় তো মিঃ সরকাররা অনেক বছর ধরেই আছেন। ওরা তো খুবই ভাল লোক। সুতরাং বাড়ি নিয়ে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।

মিঃ চৌধুরী বলেন, না, তা নেই।

--দশ-পনের দিন অন্তর একবার সল্টলেক ঘুরে আসবেন, তাহলেই তো হল।

মিঃ ব্যানার্জী পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, আমার-তোমার কথা অগ্রাহ্য করে জগদীশ যাবে কোথায়?

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বন্ধুকে বলেন, দ্যাখ দিবাকর, তোর সঙ্গে আমি তর্ক-বিতর্ক করতে পারি কিন্তু মা জননীর কথা অগ্রাহ্য করব, এত খারাপ ছেলে আমি না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ঠিক আছে, আমি এখানেই থাকব। মাঝে-মধ্যে এক-আধ দিনের জন্য সল্ট লেক যাবো।

পরের সোমবার তিথি অফিস যাবার জন্য উপর থেকে নীচে নেমে আসতেই মিঃ ব্যানার্জী ওকে বললেন, মা জননী, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—বলুন বাবা, কি করতে হবে।

—তোমাদের বড়দাকে প্রাইভেটলি বলবে, সামনের শনিবার বা রবিবার উনি যদি আসতে পারেন, তাহলে খুব ভাল হয়।

—হ্যাঁ, বলব।

—বলবে, আমার কিছু জরুরী কথা আছে আর উনি দুপুরে এখানেই খাবেন।

—হ্যাঁ, বাবা, বলব।

রবিবার না, পরের শনিবারই যোগেনবাবু এসেছিলেন। ব্যানার্জী সাহেব বাল্যবন্ধুর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেবার পর বললেন, যোগেনবাবু, আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ। একটা খুবই জরুরী ব্যাপারে আপনার মতামত নেব বলেই আপনাকে কষ্ট দিলাম।

যোগেনবাবু বলেন, না, না, কষ্ট আবার কি! তবে আমাকে বিচক্ষণ বলে লজ্জা দেবেন না।

—একশ' বার আপনি বিচক্ষণ।

উনি একটু থেমে বলেন, আপনার সেক্সনের সবাই কী শুধু শুধু আপনাকে ঠিক বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করে?

যোগেনবাবু একটু হেসে বলেন, আমার সেক্সনের সবাই সত্যি আমাকে ঠিক বড় ভাইয়ের মতই মনে করে, তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য।

—তারা সবাই অকারণে তো আপনাকে শ্রদ্ধা করে না।

যাই হোক এই সব কথাবার্তার পর মিঃ ব্যানার্জী পুত্রবধূর ব্যাপারে সৌম্যর বৌদিদের কি অনুরোধ করেছেন ও তাদের প্রতিক্রিয়ার কথা জানাবার পর বলেন, ভাবতে পারেন যোগেনবাবু, আমার ছেলে শুধু একটি আমেরিকান মেয়েকে বিয়ের পর না, তাদের ছেলে যখন চার-পাঁচ বছরের, তখন সে সবকিছু গোপন করে আমার মা জননীকে বিয়ে করে?

যোগেনবাবু সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান।

—আমি আমার মা জননীর দুঃখ সত্যি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার মনে হল, সৌম্য ছাড়া অন্য কোন ছেলের হাতে মা জননীকে সমর্পণ করা ঠিক হবে না। সৌম্যকে আমার খুবই নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে।

উনি একটু থেমে বলেন, যোগেনবাবু, আমার জায়গায় আপনি যদি হতেন, তাহলে কী এই সিদ্ধান্ত নিতেন না? নাকি অন্য সিদ্ধান্ত......

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে যোগেনবাবু বলেন, আপনি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সৌম্য যে ভাল ছেলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিথির মত মেয়েই

বা ক' জন হয়!

মিঃ চৌধুরী যোগেনবাবুকে বলেন, আমার বন্ধু আপনার মতামত জানার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

টুকটাক আরো কিছু কথাবার্তা হবার পর যোগেনবাবু ব্যানার্জী সাহেবের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, তবে তিথিরও পরম সৌভাগ্য যে সে আপনার মত শ্বশুর পেয়েছে।

—না, না, যোগেনবাবু, ওকথা বলবেন না। সৌভাগ্য আমার।

মিঃ ব্যানার্জী একটু থেমে বলেন, যে মেয়ে এমন জঘন্য অন্যায়, দুঃখ, অতৃপ্তি, অভাব সহ্য করেও আমাকে সেবা-যত্ন-শ্রদ্ধা করে, তার মহত্ত্বের কাছে আমি অতি তুচ্ছ।

এবার উনি একটু হেসে বলেন, আমি কী শুধু শুধু ওকে মা জননী বলি?

খাওয়া-দাওয়ার পর যোগেনবাবু বিদায় নেবার আগে মিঃ ব্যানার্জী ওকে বললেন, আপনাকে যা বললাম, তা অফিসের কাউকে এখনই জানাবেন না। লিগ্যাল ব্যাপারটা মিটে যাবার পরই সবাইকে জানালে ভাল হয়।

—না, না. এখনই সবাইকে বলা ঠিক হবে না।

দু'তিন দিন পরে অফিস ছুটির পর সৌম্যকে একটু একলা পেয়েই তিথি বলে, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। শনিবার বা রবিবার কী কলকাতা আসতে পারবেন?

—অফিস ছুটির পর কোথাও বসে কথা বললে হবে না?

—না।

সৌম্য একটু ভেবে বলে, না, শনিবার হবে না ; রবিবার আসতে পারি।

ও সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, আমাকে কী আপনাদের বাড়ি আসতে হবে?

তিথি বলে, না, না, বাড়িতে কথা হবে না। আমরা বাইরে কোথাও বসব।

—ঠিক আছে, তাই হবে।

—আপনি কখন হাওড়া পৌঁছবেন?

—যদি খাওয়া-দাওয়া করে তিনটে নাগাদ আসি?

—খেয়েদেয়ে আসতে হবে না। আপনি দশটা নাগাদ আসুন। আমি গাড়ি নিয়ে হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষা করব।

সৌম্য একটু চুপ করে থাকার পর বলে, আপনি কী মেশোমশাইকে বলবেন, আমার সঙ্গে কথা আছে বলে বেরুচ্ছেন?

—হ্যাঁ, বলব ; তবে আপনি বাড়িতে অন্য কিছু বলবেন।

—তবে একটা কথা।

—হ্যাঁ, বলুন।

সৌম্য একটু হেসে বলে, রবিবার আমি আপনাকে খাওয়াবো।

তিথি একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, খাওয়াবেন ; তবে আমি আপনাকে খাওয়াবো।

ওরা দু' জনেই হেসে ওঠে।

হাসি থামলে তিথি বলে, আমি পৌনে দশটার মধ্যেই গাড়ি নিয়ে স্টেশনের ভিতরের ক্যাব রোডে পৌঁছে যাবো।

—গুড!

অমিতাভদার বাড়ি যাবার দিন অনেক দেরি করে পৌঁছেছিল বলে রবিবার সৌম্য আটটা ছয়ের ট্রেনেই রওনা হয়। ন'টা কুড়ির জায়গায় ট্রেন হাওড়া পৌঁছল কুড়ি মিনিট লেট করে। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ভীড় ঠেলে ক্যাব রোডে পৌঁছে দেখল, তিথি এসে গেছে।

সৌম্য জিজ্ঞেস করে, আমি কী পিছনে বসব?

সামনের বাঁ দিকের দরজা খুলে দেবার আগেই তিথি একটু হেসে বলে, পিছনে না, আপনি ডিকিতে বসবেন।

তিথি বাঁ দিকের দরজা খুলে দিতেই সৌম্য ওর পাশে বসেই জিজ্ঞেস করে, আপনি কী আমাকে নিয়ে এখনই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে যাবেন?

গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই তিথি চাপা হাসি হেসে বলে, তাইতো ভেবেছি কিন্তু পাত্রী কোথায়?

গাড়ি স্টেশন চত্বর ছেড়ে বেরুতেই সৌম্য বলে, পাত্রীর জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। যেতে যেতে যাকে ভাল লাগবে, তাকেই গাড়িতে তুলে নেব।

—ছ'জন সাক্ষীও তো চাই।

—সেটা কোন সমস্যাই না।

সৌম্য না থেমেই বলে, যে কোন রাস্তার মোড়েই ডজন খানেক বেকার আড্ডা দেয়। এক প্যাকেট করে সিগারেট দিলে ছ'জনের জায়গায় ষাট জন সাক্ষী দিতে হাজির হবে।

গাড়ি জি. টি. রোড ধরে শিবপুরের দিকে এগিয়ে চলে।

চাপা হাসি হাসতে হাসতে তিথি জিজ্ঞেস করে, আজকেই আপনি বিয়ে করবেন?

—আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। শুধু উপন্যাস লিখে কী মন ভরে?

গাড়ি এগিয়ে চলে। তারপর দ্বিতীয় হুগলী ব্রীজের দিকে গাড়ি ঘুরতেই সৌম্য জিজ্ঞেস করে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

তিথি মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখেই বলে, আগে শহরটা ছাড়িয়ে বাইরে তো যাই। তারপর কোথাও বসব।

ব্রীজ পার হয়ে রেস কোর্সের পাশ দিয়ে গাড়ি আলিপুরে ঢুকতেই সৌম্য বলে, একটা কথা বলব?

—বলুন।

—চলুন হর্টিকালচারাল গার্ডেনে যাই। ওখানে বসে কথাবার্তা বলার পর যেখানে হোক যাওয়া যাবে।

ও না থেমেই বলে, জায়গাটা খুবই সুন্দর। তাছাড়া আলতু-ফালতু লোকও থাকবে না। ওখানে আপনি মন খুলে কথা বলতে পারবেন।

—গুড আইডিয়া।

দু' মিনিটে গাড়ি হর্টিকালচারাল সোসাইটির গেটের সামনে পৌঁছে যায়। ঐ বিশাল ফুলের বাগানের মধ্যে পা দিয়েই তিথি বলে, জায়গাটা ভারী সুন্দর, তাই না?

সৌম্য চাপা হাসি হেসে বলে, আপনার মত সুন্দরীকে তো মেছুয়াবাজারে নিয়ে যেতে পারি না।

তিথি ওর দিকে তাকিয়ে শুধু হাসে।

আরো কিছুক্ষণ বাগানের মধ্যে ঘোরাঘুরির পর তিথি একটা জায়গা দেখিয়ে বলে, চলুন, ওখানে বসা যাক ; বেশ ছায়া আছে।

ওখানে দু'জনে মুখোমুখি বসতেই সৌম্য বলে, এবার বলুন কি বলবেন।

তিথি দু'চার মিনিট মুখ নীচু করে কি যেন ভাবে। তারপর মুখ তুলে বলে, বাবা অসুস্থ শরীরে নিতান্তই ভাবাবেগে যা বললেন, আপনি তার প্রতিবাদ করলেন না কেন? আপনি কোন দুঃখে আমার মত একজন বিবাহিতা মেয়েকে বিয়ে করবেন?

সৌম্য একটু হেসে বলে, আর কিছু বলবেন?

—না, নতুন কিছু বলব না কিন্তু আমার বার বার মনে হচ্ছে, নিতান্ত মানবিক কারণে বাবার অনুরোধ ফেলতে পারেন নি বলেই আপনি ও আপনার বৌদিরা প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছেন।

—আর কিছু বলবেন?

—না, আর কিছু বলব না কিন্তু আপনাকে খোলাখুলি জবাব দিতে হবে।

—হ্যাঁ, দিচ্ছি কিন্তু আপনাকে চোখ বন্ধ করতে হবে।

—চোখ বন্ধ করতে হবে কেন?

—আমার অনুরোধ।

—ঠিক আছে, চোখ বন্ধ করছি কিন্তু আপনি উত্তর না দিয়ে পালিয়ে যাবেন না।

সৌম্য হেসে বলে, না, না, পালিয়ে যাবো না।

তিথি চোখ বন্ধ করতেই সৌম্য পকেট থেকে আংটিটা বের করে ওর বাঁ হাতের অনামিকায় পরিয়ে দেয়।

তিথি সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে আংটিটা দেখেই অবাক।

ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সৌম্য এক গাল হেসে বলে, এই আমার জবাব।

তিথি মুগ্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই খুশির হাসি হেসে বলে, সত্যি, আপনার কাছে হেরে গেলাম।

—আপনার কাছে না, তোমার কাছে।

তিথি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। আনন্দে খুশিতে চোখের জল ফেলে।

সৌম্য ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়েই একটা হাত ধরে বলে, চল, উঠি।

খুশিতে ঝলমল করে ওঠে তিথির চোখ মুখ। কোনমতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বলে, চল।

কোর্টের ঝামেলা মিটতে মাস তিনেক সময় লাগল। তাছাড়া ব্যানার্জি সাহেবকে আরো একটু সুস্থ করে তুলতে আরো ক'মাস লেগে গেল। তাইতো বিয়ে হলো বছরের শেষ বিয়ের দিন সাতাশে ফাল্গুন। মিঃ ব্যানার্জি চেয়ারে বসে বসেই পুরো অনুষ্ঠান দেখলেন। সম্প্রদান করলেন জংলীকাকা। বিয়ে বাড়ির সবকিছু দেখাশুনা করলেন চৌধুরী সাহেব আর তিথির দাদা-বৌদি।

বৌভাতও হলো মহাসমারোহে। খাওয়া-দাওয়ার পালা মিটতে না মিটতেই ফুলশয্যার ব্যাপারে মেতে উঠল ছায়া আর কাবেরী ছাড়াও হরিপালের প্রায় শত খানেক মেয়ে-বউ। বকুল আগেই ফুলের মশারী টাঙিয়ে দেবার পর সারা বিছানায় ফুল দিয়ে অপূর্ব ডিজাইন তৈরি করেছে।

প্রায় মাঝ রাত্তিরে কাবেরী সৌম্যর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনতেই চণ্ডী ওর থুতনি ধরে বলে, যা সমু, রাগ আশাবরী গাইতে যা। একটু বেলার রাগ হলেও ভারি মিষ্টি।

কাবেরী ধাক্কা দিয়ে সৌম্যকে ঘরে ঢুকিয়ে দিতেই মেয়ে-বউদের সেকি উল্লাস!

কেউ জানতেও পারল না, বকুল নিজের ঘরে অন্ধকারের মধ্যে বসে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে।